তাবি'ঈদের
জীবনকথা
[তৃতীয় খণ্ড]
ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

তাবি'ঈদের জীবনকথা
[৩য় খণ্ড]

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
প্রধান কার্যালয় :
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

ISBN : 984-842-015-0 Set

প্রথম প্রকাশ
জুলাই : ২০০৮
রজব : ১৪২৯
শ্রাবণ : ১৪১৫

মুদ্রণ
আলফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : দুইশত টাকা

Tabieeder JibonKatha (Vol. III)

Written by Dr Muhammad Abdul Mabud and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Head Office 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition July 2008 Price Taka 200.00 only.

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল-হামদু লিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ রহমতে "তাবি'ঈদের জীবনকথা" বইটির ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এর ২য় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর আমি বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়ি, তাই এ কাজ যথারীতি চালিয়ে যেতে পারিনি। তবুও মাঝে মধ্যে সময় বের করে এ কাজও অব্যাহত রাখি। এর মধ্যে "সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শীর্ষক বইটির রচনার কাজও শেষ করি এবং তা বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এসব কারণে "তাবি'ঈদের জীবনকথা" ৩য় খণ্ড শেষ করতে বিলম্ব হয়। অবশেষে তা প্রকাশিত হচ্ছে, এজন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

৩য় খণ্ডে মোট একচল্লিশ (৪১) জন মহান তাবি'ঈর জীবনকথা এসেছে। তাঁরা সকলে উঁচু স্তরের সাহাবায়ে কিরামের (রা) বিশিষ্ট ছাত্র। তাঁরা তাঁদের মহান শিক্ষকদের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবন, কর্ম ও আদর্শ বিষয়ক অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্ম "তাবি' তাবি'ঈন"-এর নিকট পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তাই কুরআন ও সুন্নাহ বিষয়ে কোন কিছু পড়াশোনা ও আলোচনা করতে গেলে এ গ্রন্থে আলোচিত ব্যক্তিদের নাম বার বার ঘুরে-ফিরে আসে। আমরা যখন আসহাবে রাসূল (সা) ও তাবি'ঈদের জীবনকথা রচনার পরিকল্পনা করি তখন সিদ্ধান্ত ছিল অতি সংক্ষেপে তাঁদের পরিচয় মানুষের নিকট তুলে ধরবো। আমাদের সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩য় খণ্ডের কাজটিও সম্পন্ন করেছি।

আমার এ লেখালেখির পিছনে যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেন তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ। তাঁর তাকীদ না থাকলে আমি হয়তো এতদূর এগুতে পারতাম না। আল্লাহ তাঁকে এর প্রতিদান দিন।

এ বইটির পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন এর ভুল-ত্রুটি আমার দৃষ্টিগোচর করেন। পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট আমার একান্ত কামনা, তিনি যেন আমাদের সকলকে তার মর্জি মত কাজ করার তাওফীক দান করেন।

জুন ৩০, ২০০৮

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা (রহ)

মুহাম্মাদ (রহ)-এর ডাকনাম আবুল কাসিম। পিতা হযরত 'আলী ইবন আবী তালিব (রা)। হযরত হাসান ও হুসাইন (রা)-এর বৈমাত্রেয় ভাই। হযরত 'আলী (রা) নবী-দুহিতা হযরত ফাতিমার (রা) ইনতিকালের পর কয়েকটি বিয়ে করেন। সেই বেগমদের একজন ছিলেন খাওলা।[১] রাসূলে কারীমের (সা) জীবনের শেষ দিকে একদিন 'আলী (রা) তাঁর সাথে বসে আছেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ওফাতের পর যদি আমার কোন পুত্র সন্তান হয় তাহলে আমি কি আপনার নামে তার নাম এবং আপনার উপনামে তার উপনাম রাখতে পারবো? রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, পারবে।[২]

সময় গড়িয়ে চললো। একদিন রাসূল (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন এবং তার মাত্র ছয় মাস পর হাসান-হুসাইনের (রা) মা নবী-দুহিতা ফাতিমা (রা) পিতাকে অনুসরণ করে দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। অতঃপর 'আলী (রা) তাঁর জীবনের এক পর্যায়ে আরবের বানূ হানীফা গোত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি এ গোত্রের জা'ফার ইবন কায়স আল-হানাফিয়্যার কন্যা খাওলাকে বিয়ে করেন। এই খাওলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এক পুত্র সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) পূর্ব অনুমতির ভিত্তিতে পিতা 'আলী (রা) সন্তানের নাম মুহাম্মাদ ও ডাকনাম আবুল কাসিম রাখেন। তবে মানুষ ফাতিমাতুয যাহ্‌রার দুই ছেলে হাসান ও হুসাইন (রা) থেকে তাঁকে পার্থক্য করার জন্য ডাকতে থাকে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা অর্থাৎ হানীফা বংশীয় মহিলার গর্ভজাত সন্তান মুহাম্মাদ। অতঃপর ইতিহাসে তিনি এ নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৩]

নাম ও কুনিয়াত নিয়ে ঝগড়া

একবার 'আলী ও তালহার (রা) মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে তালহা 'আলীকে লক্ষ্য করে বলেন : না, আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) উপর দুঃসাহস দেখিয়েছেন। নিজের ছেলের নাম ও উপনাম রাসূলুল্লাহর (সা) নামে রেখেছেন। অথচ রাসূল (সা) তাঁর পরে উম্মাতের কেউ যেন এমনটি (এক সাথে নাম ও উপনাম) না করে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন। জবাবে 'আলী বলেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করাই হলো দুঃসাহস অথচ আমি তো তেমন কিছু করিনি। তারপর তিনি কুরাইশ গোত্রের কয়েক ব্যক্তিকে ডেকে বলেন : তোমরা কোন কথার সাক্ষ্য দিবে? তাঁরা

---

১. আল-আ'লাম-৬/২৭০

২. আত-তাবাকাত-৫/৯২

৩. আল-আ'লাম-৬/২৭০; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-২৬৬

বললেন : আমরা সাক্ষ্য দিব যে, তিনি (রাসূল সা.) বলেছেন : আমার পরে অতি শীঘ্র তোমার একটি ছেলের জন্ম হবে এবং তুমি আমার নামে ও উপনামে তার নাম ও উপনাম রাখবে। আমার পরে আমার উম্মাতের আর কারো জন্য এমনটি করা হালাল (সঙ্গত) হবে না।[৪]

তবে হযরত খাওলার (রহ) বংশের ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মতভেদ আছে। অনেকে তাঁকে ইয়ামাম'র যুদ্ধ বন্দীদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] আবার অনেকে বলেছেন, তিনি সিন্ধু বংশোদ্ভূত। কেউ কেউ তাঁকে বানূ হানীফার দাসী বলেছেন।[৬] সঠিক এটাই যে, তিনি বানূ হানীফার এক সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যার জন্মের সময় সম্পর্কেও কিছুটা মতপার্থক্য আছে। একটি মতে দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ফারুকের (রা) খিলাফতের শেষের দিকে মাত্র দুই বছর বাকী থাকতে তাঁর জন্ম হয়। এই হিসেবে হিজরী ২১ সনের শেষ অথবা ২২ সনের প্রথম দিক হবে।[৭] অন্য একটি মতে খলীফা হযরত আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালের একেবারে শেষ দিকে তাঁর জন্ম হয়।[৮]

মুহাম্মাদ তাঁর মহান পিতার তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। শিক্ষা-দীক্ষা, ইবাদাত-বন্দেগীর নিয়ম-কানুন ও পার্থিব ভোগ-বিলাস বিমুখ জীবন-যাপনের নিয়ম-পদ্ধতি তাঁর কাছ থেকেই লাভ করেন। সেই সাথে পৈত্রিক সূত্রে লাভ করেন শক্তি, সাহস, বীরত্ব এবং অতুলনীয় বাগ্মিতা ও ভাষা দক্ষতা। পিতার প্রত্যক্ষ নজরদারিতে শৈশবেই তিনি একদিকে হয়ে ওঠেন একজন দক্ষ অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং অন্যদিকে রাতের অন্ধকারে যখন পৃথিবীর মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন হয়ে যান দুনিয়া বিরাগী একজন সাধক ও তাপস।

তাঁর শৈশবকালীন জীবনের কথা তেমন কিছু জানা যায় না। উটের যুদ্ধ থেকে তাঁকে দৃশ্যপটে দেখা যায়। এ সময় তাঁর বয়স খুব টেনে-টুনেও পনের/ষোল বছরের বেশি হবে না। পিতার সাথে তিনি যুদ্ধে যান এবং পিতা তাঁর হাতে সামরিক পতাকা তুলে দেন। আদ-দায়নাওয়ারী বলেন :[৯] "'আলী (রা) আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁর ডান ভাগের দায়িত্বে ছিলেন আল-আশতার এবং বাম ভাগের দায়িত্বে ছিলেন 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)। আর 'আলীর (রা) বাহিনীর সবচেয়ে বড় ঝাণ্ডাটি ছিল মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার হাতে।" এরপর থেকে তিনি পিতার সাথে সকল অভিযানে অংশ নেন। যুদ্ধের ময়দানে পিতা তাঁর কাঁধে এত কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেন যা তাঁর অন্য দুই

---

৪. আত-তাবাকাত-৫/৯২
৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩৯৫
৬. আত-তাবাকাত-৫/৯১; তাবি'ঈন-৪০৫
৭. ওয়াফাইয়াতুল আ'য়ান-১/৪৫০
৮. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-২৬৭
৯. আল-আখবার আত-তিওয়াল-১৪৮

সৎ ভাই হাসান-হুসাইনের (রা) উপর করেননি। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা, শক্তি ও সাহসের সাথে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : আপনার পিতা আপনাকে যেরূপ কঠিন বিপদ-আপদের মুখে ঠেলে দেন তেমন তো আপনার অন্য দুই ভাই হাসান-হুসাইনকে দেন না– এর কারণ কি? বললেন : আমার অন্য দুই ভাই হলেন আমার পিতার দুই চোখের মত, আর আমি হলাম তাঁর দুই হাতের মত। তিনি তাঁর দুই হাত দ্বারা দুই চোখের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।[১০]

উটের যুদ্ধ

এ যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার পর 'আলী (রা) মুহাম্মাদকে সামনে এগোনোর নির্দেশ দেন। তিনি পতাকা হাতে নিয়ে নির্ভীকচিত্তে নির্দেশ পালন করে সামনে এগিয়ে যান। বসরাবাসীরা তাঁর প্রতি বর্শা ও তরবারি তাক করে ধরে। তখন তিনি একজন তরুণ। সামনে এগোবার সাহস হারিয়ে ফেলেন। 'আলী (রা) তাঁর হাত থেকে পতাকা নিয়ে নিজেই শত্রু বাহিনীকে আক্রমণ করেন। সহযোগী যোদ্ধারাও তাঁকে সহযোগিতা করেন। এরপর উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এরপর 'আলী (রা) আবার মুহাম্মাদের হাতে পতাকা তুলে দেন।[১১]

উটের যুদ্ধের এ ঘটনা মুহাম্মাদ আল-হানাফিয়্যা নিজেই বর্ণনা করেছেন এভাবে : যখন আমাদের সৈনিকরা কাতারবন্দী হলো তখন আমার আব্বা পতাকা আমার হাতে তুলে দিলেন। তারপর দু'বাহিনী মুখোমুখী হয়ে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হলো। আব্বা যখন আমার মধ্যে কিছুটা ভীতির ভাব লক্ষ্য করলেন তখন তিনি আমার হাত থেকে পতাকা নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। আমিও এগিয়ে গিয়ে এক বসরী সৈনিকের উপর আক্রমণ চালাই। সে আহত অবস্থায় চিৎকার করে বলতে থাকে আমি আবূ তালিবের ধর্মমতের উপর আছি। আমি তার কথা শুনে পরবর্তী আঘাত থেকে বিরত থাকি। তারা পরাজিত হওয়ার পর আব্বা ঘোষণা দিলেন, কেউ আহতদের হত্যা করবে না এবং রণক্ষেত্র থেকে পলায়নপর কারো পিছু ধাওয়া করবে না। যুদ্ধ শেষে প্রতিপক্ষ যে সকল ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করেছিল তা আমার আব্বা গনীমাতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হিসেবে সৈনিকদের মধ্যে যথারীতি বণ্টন করে দেন।[১২]

সিফ্ফীন যুদ্ধ

এ যুদ্ধ হয় 'আলী (রা) ও মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে। উটের যুদ্ধের পর পরই সিফ্ফীন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা এ যুদ্ধে তাঁর পিতার সাথে ছিলেন। সিফ্ফীন যুদ্ধের সূচনা পর্ব তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন : আমার আব্বা মু'আবিয়া (রা) ও শামবাসীদের সাথে যুদ্ধের কথা ভাবতেন

---

১০. ওয়াফাইয়াত আল-আ'য়ান-১/৪৪৯; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-২৬৮

১১. আল-আখবার আত-তিওয়াল-১৪৮-১৪৯; তাবি'ঈন-৪০৬

১২. আত-তাবাকাত-৫/৯৩

এবং ঝাণ্ডা তৈরি করে এই বলে কসম খেতেন যে, যুদ্ধের ময়দান ছাড়া এ ঝাণ্ডা খুলবো না। কিন্তু তাঁর সহচরগণ তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে যুদ্ধের ব্যাপারে টালবাহানা করতেন। তাদের বিরোধিতা দেখে তিনি শেষ পর্যন্ত ঝাণ্ডা খুলে ফেলে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতেন। এভাবে তিনি চারবার ঝাণ্ডা বেঁধে আবার তা খুলে কাফ্ফারা আদায় করেন। ব্যাপারটি আমার মনোপুতঃ হলো না। আমি মিসওয়ার ইবন মাখরামাকে বললাম, আপনি আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন, এ অবস্থায় তিনি কোথায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? আল্লাহর কসম! আমি এই লোকদের দ্বারা উপকার লাভের কোন আশা দেখছি না। মিসওয়ার বললেন, তিনি যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা করেই ছাড়বেন। আমি তাঁর সাথে কথা বলেছি। তিনি যাত্রার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।[১৩]

যুদ্ধ যখন কোনভাবে এড়ানো গেল না এবং 'আলী (রা) সিফ্ফীনের পথে যাত্রা করলেন তখন মুহাম্মাদও তাঁর সঙ্গী হলেন। 'আলী উটের যুদ্ধের মত সিফ্ফীন যুদ্ধের ঝাণ্ডাও তাঁর হাতে তুলে দেন।[১৪] এ যুদ্ধের ধারাবাহিকতা অনেক দিন যাবত বিদ্যমান ছিল। প্রথম দিকে বেশ কিছু দিন ধরে সম্মিলিতভাবে চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিবর্তে উভয় পক্ষের একজন অথবা দু'জন করে ময়দানে এসে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হতো। একদিন মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা একজনকে সংগে নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হন। শামী সৈনিকদের মধ্য থেকে 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'উমার মুকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসে এবং হুংকার ছেড়ে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার আহ্বান জানায়। দু'জনই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ে। 'আলী (রা) এ দৃশ্য দেখে সামনে এগিয়ে গিয়ে মুহাম্মাদের পাশে দাঁড়ান। তিনি নিজের ঘোড়ার লাগামটি তার হাতে দিয়ে বলেন : এটি ধর। তারপর তিনি নিজে 'উবাইদুল্লাহর মুকাবিলার জন্য সামনে এগিয়ে যান। 'আলীকে (রা) দেখে 'উবাইদুল্লাহ একথা বলতে বলতে দূরে সরে যায় :[১৫]

مالى في مبارزتك من حاجة، إنما أردت ابنك.

"আমি আপনার সঙ্গে নয়, বরং আপনার ছেলের সঙ্গে লড়তে চাই!" 'উবাইদুল্লাহর চলে যাওয়ার পর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা পিতাকে বলেন, যদি আপনি আমাকে তার সাথে লড়ার সুযোগ দিতেন তাহলে আমার বিশ্বাস আমি তাকে হত্যা করতে পারতাম। 'আলী (রা) বলেন, আমারও তো সেই রকম বিশ্বাসই ছিল। তবে বিপদ থেকে মুক্ত ছিলে না। আমার ভয় হচ্ছিল, তোমার জীবন বিপণ্ন হয়ে না পড়ে। এরপর উভয় পক্ষের অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ দুপুর পর্যন্ত লড়তে থাকে; কিন্তু কোন পক্ষ অপর পক্ষকে পরাভূত করতে পারলো না।

এক পর্যায়ে 'আলী (রা) একটি শামী দলের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁকে নির্দেশ

---

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. আল-আখবার আত-তিওয়াল-১৭৫-১৭৬

দেন। তাঁকে একথাও বলেন যে, তাদের বক্ষে বর্শাঘাত করার পর হাত চালানো থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ তরবারি দ্বারা তাদেরকে হত্যা করবে না। আমার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করবে। তিনি পিতার এ আদেশ মেনে চলেন। 'আলী (রা) আরেকটি দলকে তাঁর সাহায্যের জন্য পাঠান। তারা মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নেতৃত্বে শামী সৈন্যদেরকে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেন।[১৬]

সিফ্ফীন যুদ্ধের অনেক সঙ্কটময় পর্যায়ে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা তাঁর অন্য দুই সৎ ভাই হাসান ও হুসাইনের (রা) সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁদের মহান পিতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। 'আলীর (রা) প্রতি যখন চারিদিক থেকে বৃষ্টির মত তীর-বর্শা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল তখন মুহাম্মাদ তাঁর দুই ভাইয়ের সাথে নিজেদের দেহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাঁকে অক্ষত রাখেন। যায়দ ইবন ওয়াহাব বলেন :[১৭]

فإني لأنظر إلى علي،وهو يمر نحو ربيعة ومعه بنوه : الحسن والحسين ومحمد، وإن النبل ليمر بين أذنيه وعاتقه وبنوه يقونه بأنفسهم.

"আমি 'আলীর প্রতি তাকিয়ে দেখছি, তিনি রাবী'আর দিকে যাচ্ছেন, আর তাঁর সাথে চলছেন তিন ছেলে হাসান, হুসাইন ও মুহাম্মাদ, তীর-বর্শা তাঁর দু'কান ও কাঁধের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, আর তাঁর ছেলেরা নিজেদের দেহ দিয়ে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন তিনি সিফ্ফীন যুদ্ধে যোগদান করেন তখন সদ্য কৈশর অতিক্রম করে যৌবনে পা রেখেছেন। তাই এ যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর অন্তরে ভীষণ প্রভাব ফেলে। তিনি পরবর্তীতে সারা জীবন যুদ্ধ ও রক্তপাত এড়িয়ে চলেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের একটি বর্ণনা নিম্নরূপ :

আমরা সিফ্ফীনে গেলাম এবং মু'আবিয়ার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে আমার ধারণা হলো, আমাদের এবং তাদের কেউ আর বেঁচে থাকবে না। বিষয়টি আমি খুব বড় মনে করলাম এবং আমার কাছে খুব দুঃখজনক মনে হলো। এসব যখন আমি ভাবছি, তখন শুনতে পেলাম কেউ যেন আমার পিছন থেকে চিৎকার করে বলছে :

"ওহে মুসলিম জনমণ্ডলী! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। ওহে জনমণ্ডলী! নারী ও শিশুদের রক্ষা করবে কে? কে রক্ষা করবে দীন-ধর্ম ও ইজ্জত-আবরু? কে লড়বে রোমান ও দায়লাম বাহিনীর বিরুদ্ধে? ওহে মুসলিম জনমণ্ডলী! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর!"

এরপর আমি প্রতিজ্ঞা করি, আজকের দিনের পর আর কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে তরবারি উঠাবো না।

---

১৬. আল-কামিল ফী আত-তারীখ-৩/২৬২

১৭. আল-আখবার আত-তিওয়াল-১৮২

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা সম্পর্কে হযরত 'আলীর (রা) অন্তিম উপদেশ

সিফ্ফীন যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পর হযরত 'আলী (রা) গুপ্ত ঘাতকের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি হাসান, হুসাইন ও মুহাম্মাদকে উপদেশ দান করেন।

আল-মাস'উদী হযরত 'আলীর (রা) সেই অন্তিম উপদেশ বর্ণনা করেছেন এভাবে :[১৮]

ثم دعا الحسن والحسين، فقال لهما : أوصيكما بتقوى الله وحده ولاتبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيئ منها، قولا الحق وارحما اليتيم، وأعينا الضعيف، وكونا للظالم خصماء وللمظلوم عَوْنًا، ولا تأخذكما فى الله لومة لائم.

"অতঃপর তিনি হাসান ও হুসাইনকে (রা) ডেকে বলেন : আমি তোমাদের দু'জনকে এক আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। দুনিয়া তোমাদের প্রত্যাশী হলেও তোমরা তার প্রত্যাশী হবে না, দুনিয়ার কোন কিছু না পেলে তার জন্য আফসোস করবে না, সর্বদা সত্য বলবে, ইয়াতীমের প্রতি দয়া করবে, দুর্বলকে সাহায্য করবে, যালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, মাযলূমের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না।"

তারপর তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার দিকে তাকিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন :

هل سمعت ما أوصيت به أخويك.

"আমি তোমার দুই ভাইকে যে উপদেশ দিয়েছি তা কি শুনেছো?" তিনি হাঁ সূচক জবাব দিলে 'আলী (রা) বলেন :

أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقر أخويك وتزيين أمرهما، ولاتَقْطَعْنَ أمرًا دونهما.

"আমি তোমাকেও অনুরূপ উপদেশ দিচ্ছি। আরো উপদেশ দিচ্ছি, তোমার দুই ভাইকে সম্মান করবে, তাদের কাজে সমর্থন দেবে এবং তাদের সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করবে না।"

তিনি আবার হাসান-হুসাইনের (রা) দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন :

أوصيكما به، فإنه سيفكما وابن أبيكما، فأكرماه وأعرفا حقه.

"তোমাদের দু'জনকে আমি তার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। সে তোমাদের দু'জনের অসি এবং তোমাদের পিতার সন্তান। তাঁকে ভালোবাসবে এবং তার অধিকারের প্রতি সচেতন থাকবে।"

হযরত হাসান ও হুসাইন (রা) দু'জনই তাঁদের ছোট ভাইয়ের প্রতি পিতার উপদেশের কথা স্মরণ রাখেন এবং কোন অবস্থাতেই তার প্রতি তাঁদের দায়িত্বের কথা বিস্মৃত

---

১৮. মুরূজ আয-যাহাব-১/৩৪১

হননি। হযরত হাসান (রা) মদীনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা তখন মদীনার বাইরে তাঁর খামারে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে ডেকে পাঠানো হলো। তিনি এসে হযরত হাসানের (রা) ডান পাশে বসেন এবং হযরত হুসাইন (রা) বসেন বাম পাশে। হযরত হাসান (রা) চোখ মেলে তাঁদের দিকে তাকান। তারপর সহোদর ভাই হুসাইনকে (রা) লক্ষ্য করে বলেন : [১৯]

يا أخي أوصيك بمحمد أخيك خيرًا، فإنه جلده ما بين العينين.

"আমি তোমাকে তোমার ছোট ভাই মুহাম্মাদের সাথে সদাচরণের উপদেশ দিচ্ছি। সে আমাদের দু চোখের মধ্যবর্তী স্থানের ত্বকের মত অতি প্রিয়। অনুরূপভাবে তিনি মুহাম্মাদকে বলেন, "আমি তোমাকেও বলছি, প্রয়োজনের সময় হুসাইনের (রা) পাশে থেকে তাঁকে সাহায্য করবে।"

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে গভীর মিল-মুহাব্বাত ছিল। একবার কী যেন একটা কারণে মুহাম্মাদ ও হাসানের (রা) মধ্যে একটু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং বড় ভাই হাসান একটু বিরক্ত হন। ছোট ভাই একটু ভেবে-চিন্তে ছোট্ট একটা চিঠিতে বড় ভাইকে লিখলেন : আল্লাহ আপনাকে আমার চাইতে বেশি মর্যাদাবান করেছেন। আপনার মা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহর (সা) কন্যা ফাতিমা (রা)। আর আমার মা বানূ হানীফার একজন মহিলা। আপনার নানা রাসূলুল্লাহ (সা)। আর আমার নানা জা'ফার ইবন কায়স।

অতএব, আমার এ পত্র আপনার হাতে পৌঁছানোর সাথে সাথে আমার নিকট এসে আমার সাথে একটা মীমাংসা করুন, যাতে সর্বক্ষেত্রে আমার উপর আপনার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

পত্রটি হযরত হাসানের (রা) হাতে পৌঁছা মাত্র তিনি ছোট্ট ভাই মুহাম্মাদের বাড়ীতে ছুটে যান এবং তার সাথে আপোষ করে নেন।[২০]

আমীর মু'আবিয়ার (রা) হাতে বাই'আত

হযরত 'আলীর (রা) শাহাদাতের পর গোটা খিলাফতের কর্তৃত্ব হযরত মু'আবিয়ার (রা) হাতে চলে আসে। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর মান-মর্যাদা ও ঐক্য-সংহতির কথা চিন্তা করে হযরত 'মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকে মেনে নিয়ে তাঁর হাতে বাই'আত করেন। তিনি যে সততা ও আন্তরিকতার সাথে বাই'আত করেছেন হযরত মু'আবিয়া (রা) তা বুঝতে পারেন। তাঁর পক্ষ থেকে যে কোন রকম বিরোধিতা হবে না সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। আর তাই তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে মুহাম্মাদকে তাঁর সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি বিভিন্ন কারণে একাধিকবার দিমাশকে গিয়ে মু'আবিয়ার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করেন।[২১]

---

১৯. আল-আখবার আত-তিওয়াল-২২১

২০. সুওয়ারুন মিন হায়াত-আত-তাবি'ঈন-২৬৫

২১. প্রাগুক্ত

ইয়াযীদকে খলীফা মেনে নেওয়ার ব্যাপারে হযরত হুসাইন (রা)-কে পরামর্শ

হযরত হাসান (রা)-এর পরে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা হযরত হুসাইনকে (রা) নিজের বড় ভাই বলে মানতেন। একজন বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান ভাই হিসেবে তাঁর সকল বিপদ-আপদ ও সমস্যার ক্ষেত্রে সব সময় তাঁর পাশে অবস্থান করেন। হযরত মু'আবিয়ার (রা) ওফাতের পরে ইয়াযীদের নির্দেশে মদীনার গভর্ণর ওয়ালীদ হযরত হুসাইনকে (রা) ইয়াযীদের প্রতি বাই'আতের আহ্বান জানায়। তিনি সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে যান এবং এক পর্যায়ে মদীনা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তখন মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যা বিনীতভাবে তাঁকে বলেন : ভাই! আপনি আমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্ব। এ পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই, আপনার চেয়ে আমি যার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার পরামর্শ হলো যতটুকু সম্ভব এ মুহূর্তে আপনি ইয়াযীদের প্রতি বাই'আত থেকে দূরে থাকুন এবং মদীনা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করুন। এখানে অবস্থান করেই বিভিন্ন অঞ্চলে গোপনে দূত পাঠিয়ে মানুষকে আপনার খিলাফতের প্রতি সমর্থনের আহ্বান জানান। যদি তারা আপনার প্রতি বাই'আত করে তাহলে তা হবে আমাদের জন্য বিজয়, আর যদি তারা আপনাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন মুসলিমের ব্যাপারে একমত হয়ে যায় তাহলে তাতে আপনার ধর্ম ও বুদ্ধিমত্তায় কোন ঘাটতি হবে না। আপনার সম্মান ও মর্যাদার উপরও তার কোন প্রভাব পড়বে না। অন্যদিকে যদি আপনি কোন নির্দিষ্ট শহর অথবা নির্দিষ্ট কোন স্থানে যান তাহলে আমার আশংকা হয়, সেখানকার মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল আপনার পক্ষ নেবে, কিন্তু অন্য দল হবে আপনার প্রতিপক্ষ। তারপর তাদের মধ্যে হবে ঝগড়া ও মারামারি। মাঝখানে পড়ে আপনি হবেন তাদের তীর-বর্শার লক্ষ্যবস্তু। অবস্থা যদি এমন পর্যায়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে বংশ মর্যাদা ও ব্যক্তিগত গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই উম্মাতের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিটি সবচেয়ে বেশি হেয় ও অপমানিত হবেন এবং তখন তাঁর রক্ত হবে সবচেয়ে সস্তা বস্তু।

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার এ পরামর্শ শুনে ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, তাহলে আমি কোথায় যাব? মুহাম্মাদ বললেন : মক্কায় চলে যান। সেখানে যদি আপনি নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে থাকতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই কোন একটি পথ বেরিয়ে আসবে। আর যদি অবস্থা খারাপ হয় তাহলে মরুভূমি ও পাহাড়ী অঞ্চলে চলে যাবেন। যতদিন খিলাফতের ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত না নেবেন ততদিন এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরতে থাকবেন। এই ঘোরাঘুরির মধ্যে আপনি কোন একটি মত ও সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। কারণ, আপনি যখন কোন অবস্থার মুখোমুখী হন তখন আপনার সিদ্ধান্তই হয় সঠিক এবং কাজেও হয়ে ওঠেন সতর্ক। একথা শুনে হযরত হুসাইন (রা) বলেন, তুমি খুব আবেগধর্মী উপদেশ দিয়েছো। আমি আশা করি তোমার মত সঠিক হবে।[২২]

---

২২. আল-কামিল ফী আত-তারীখ-২/১৫২

হযরত হুসাইন (রা) একটি সীমা পর্যন্ত তাঁর পরমার্শ মত কাজও করেন। তিনি মদীনা থেকে মক্কা চলে যান। পরে কূফাবাসীদের আমন্ত্রণে সেখান থেকে কূফার দিকে রওয়ানা হন। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তাই পথিমধ্যে কারবালায় হৃদয়বিদারক শাহাদাতের ঘটনাটি ঘটে। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা এই ঘটনায় তাঁর সাথে ছিলেন না।[২৩]

মুখতার ইবন আবী 'উবায়দ আছ-ছাকাফীর বিদ্রোহ এবং মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার সমর্থন

হযরত ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাতের পর বানূ উমাইয়্যাদের বিপরীতে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) খিলাফতের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ান। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে অনেকগুলো বছর দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলতে থাকে। এ সময় বানূ ছাকীফের মুখতার ইবন 'উবায়দ আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের পক্ষ অবলম্বন করেন। আসলে মুখতার ছিলেন একজন অখ্যাত-অজ্ঞাত ব্যক্তি। কোন এক অপরাধের কারণে এক সময় সে বানূ উমাইয়্যাদের হাতে শাস্তিও ভোগ করেছিলেন। পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও কর্তৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যেই মূলত তাঁর পক্ষে এসে দাঁড়ান এবং কিছু দিন তাঁর পাশে ছিলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন এখানে তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ হবার নয় তখন তিনি নিজেই ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তার মত একজন অতি সাধারণ মানুষের পক্ষে কারো সাহায্য ছাড়া সফল হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল, এজন্য সে হযরত হুসাইনের (রা) রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীর আশ্রয় নেন। যেহেতু ঘটনাটি ছিল অতি সাম্প্রতিক সময়ের এবং বহু মুসলিম বেদনাহতও ছিলেন। এজন্য বহু সরল মুসলিম তার প্রতারণার জালে আবদ্ধ হন। ইমাম হুসাইনের (রা) রক্তের বদলার শ্লোগানের সাথে সাথে তিনি ইমাম হুসাইনের (রা) স্থলাভিষিক্ত হযরত ইমাম যাইনুল 'আবিদীনের (রহ) নিকট বহু হাদিয়া-তোহফা পাঠিয়ে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করে এই বলে যে, আপনি আমাদের ইমাম। আমাদের থেকে বাই'আত গ্রহণ করে আপনি আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। কিন্তু হযরত যাইনুল 'আবিদীন (রহ) তার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ কারণে তিনি তার প্রতারণার ফাঁদে ধরা দেননি। অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তাই নয় বরং মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে জনগণের সামনে তার মিথ্যা, প্রতারণা ও পাপাচারের বর্ণনা দিয়ে বলেন, এ ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য আহলে বায়ত (নবী পরিবার)-কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। তার কথা ও বাস্তবতার কোন মিল নেই।

এটা ছিল সেই সময়ের ঘটনা যখন বাই'আতের বিষয়টি নিয়ে 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) ও মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার (রহ) মধ্যে সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটেছিল। মুখতার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি ইমাম যাইনুল 'আবিদীনের

---

২৩. তাবি'ঈন-৪১০

নিকট থেকে হতাশ হয়ে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট যান। একথা ইমাম যাইনুল 'আবিদীন জানতে পেরে তাঁকে এই বলে সতর্ক করেন যে, আহলি বায়তের প্রতি মুখতারের ভালোবাসার দাবী শুধুমাত্র মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। আসলে তার মুখের কথা, বাস্তবে তা ঠিক নয়। বরং সে আহলি বায়তের একজন দুশমন। আমার মত আপনারও উচিত হবে তার গোপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেওয়া। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা বিষয়টি নিয়ে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) সাথে আলোচনা করেন। তিনি সে সময় 'আবদুল্লাহ্ ইবন আয-যুবাইরের (রা) দিক থেকে ভীষণ চাপ ও ভয়-ভীতির মধ্যে ছিলেন। এজন্য তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে বলেন, এ ব্যাপারে তুমি যাইনুল 'আবিদীনের পরামর্শে কান দেবে না।[২৪]

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাও মুখতারকে একজন ভালো মানুষ মনে করতেন না এবং মুখতারের উপর তাঁর মোটেও আস্থা ছিল না। কিন্তু যেহেতু 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) মুহাম্মাদকে বাই'আতের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করছিলেন, এ কারণে তিনি বাধ্য হয়ে তাঁর হাত থেকে বাঁচার জন্য মুখতারকে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা এবং তার অভিভাবকত্ব গ্রহণের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হন।[২৫]

আহলি বায়তের (নবী বংশ) সমর্থকদের মূল কেন্দ্র ছিল ইরাক। এ কারণে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে অভিভাবক হিসেবে পাওয়ার পর মুখতার তাঁর অনুমতি নিয়ে ইরাক যাত্রা করে। যেহেতু তার উপর মুহাম্মাদের মোটেও আস্থা ছিল না এবং তাকে একজন ভালো মানুষ বলেও মনে করতেন না, এ কারণে তিনি নিজের একান্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবন কামিল আল-হামাদানীকে তার সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দেন। যাত্রার আগে তিনি গোপনে তাকে বলে দেন, মুখতার তেমন আস্থাভাজন ব্যক্তি নয়। এ কারণে তার সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। ইবন যুবাইর (রা) এ সকল কর্মকাণ্ডের কথা অবহিত ছিলেন না। তিনি তখনও মুখতারকে নিজের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করছিলেন।

এই সুযোগ গ্রহণ করে মুখতার তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, মক্কায় আমার অবস্থান করার চেয়ে ইরাকে থাকা আপনার জন্য বেশি কল্যাণকর হবে। এ কারণে আমি সেখানে যাচ্ছি। ইবন যুবাইর (রা) সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে অনুমতি দিলেন। মুখতার 'আবদুল্লাহ ইবন কামিলকে সঙ্গে নিয়ে ইরাক যাত্রা করলেন। 'উয়াইব নামক স্থানে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। মুখতার তাকে জিজ্ঞেস করেন, ইরাকে মানুষের মনোভাব কি? সে বলে, তাদের অবস্থা কাণ্ডারীবিহীন জাহাজের মত দোদুল্যমান। মুখতার বললো, আমি হবো তাদের কাণ্ডারী, তাদেরকে সঠিকভাবে চালাবো।[২৬]

আহলি বায়ত তথা নবী বংশ-প্রেমিক লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল কূফায়। এ কারণে মুখতার সোজা কূফায় যান এবং নিজেকে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার

---

২৪. মুরূজ আয-যাহাব-১/৩৬৬

২৫. আত-তাবাকাত-৫/৯৮

২৬. প্রাগুক্ত

প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারীর প্রচার এবং সেই সাথে ইবন যুবাইরের (রা) নিন্দা ও সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন। তিনি বলতে থাকেন, ইবন যুবাইর (রা) ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার একজন কর্মী। প্রথম দিকে তিনি তাঁর জন্য কাজ করেন, কিন্তু পরে নিজেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হাতিয়ে নেন। এজন্য মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর নিজ হাতে ও কলমে লেখা প্রত্যয়ন পত্রও আমার সঙ্গে আছে। যাদের উপর তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস হতো তিনি তাদেরকে প্রত্যয়ন পত্রটি পাঠ করে শুনিয়ে দিতেন। মোটকথা, তাঁর এই চালাকির কারণে বহু নবী বংশ-প্রেমিক মানুষ তাঁর প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অচিরেই বিরাট একটি দল গোপনে তাঁর হাতে বাই'আত করে। তবে কিছু লোকের সন্দেহ হয়। তারা মক্কায় মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট যায় এবং তাঁর নিকট মুখতারের কথা কতটুকু সত্য তা জানতে চায়। তিনি মুখতারের দাবী সরাসরি স্বীকার বা অস্বীকার করতে পারছিলেন না। স্বীকার এজন্য করতে পারেননি যে, মুখতারের কথায় অনেক অতিরঞ্জন তথা মিথ্যাও ছিল। অন্যদিকে অস্বীকার করতে পারেননি এজন্য যে, তিনি তো মুখতারের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তবে তার সততা ও সত্যবাদিতায় তাঁর মোটেও আস্থা ছিল না। এ কারণে তিনি তাদেরকে এভাবে জবাব দেন : [২৭]

نحن حيث ترون محتسبون وما أحب أن لى سلطان الدنيا بقتل مؤمن بغير حق ولوددت أن الله انتصرلنا بمن شاء من خلقه، فاحذروا الكذابين وانظروا لأنفسكم ودينكم.

"আপনারা তো দেখছেন আমরা আহলি বায়ত ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ মানুষ হিসেবে বসে আছি। আমি অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের রক্ত ঝরিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হতে চাই না। তবে আমরা এ পসন্দ করি যে, আল্লাহ তাঁর যে বান্দা দ্বারা আমাদের সাহায্য করতে চান, করুন। অবশ্য তোমরা মিথ্যাবাদীদের থেকে সতর্ক থাকবে, তাদের প্রতারণা থেকে নিজেদের জীবন ও ধর্ম রক্ষা করবে।" একথা শুনে সেই লোকগুলো ইরাকে ফিরে যায়। কূফায় তখন ইবরাহীম ইবন আশতার নাখা'ঈ ছিলেন একজন প্রভাবশালী আহলি বায়ত প্রেমিক ব্যক্তি। মুখতার তাঁকে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার একটি জাল চিঠি দেখিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন। মুখতার সেই কাজটি সম্পন্ন করেন এভাবে : তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নামে ও ভাষায় ইবরাহীম আল-আশতারকে একটি চিঠি লেখেন। তারপর সেই চিঠিটি নিয়ে কূফায় ইবরাহীমের সাথে পূর্ব অনুমতি নিয়ে সাক্ষাৎ করেন। সংগে তাঁর অনুসারীদের আরো অনেকে ছিল। তারা ইবরাহীমের নিকট মুখতারের পরিচয় দিতে গিলে বলে; তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবার-পরিজনের বিশ্বাসভাজন

---

২৭. প্রাগুক্ত-৫/৯৯

ব্যক্তি। মুখতার ছিলেন একজন তুখোড় বক্তা। তিনি উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বলেন :[২৮]

إنكم أهل بيت قد اكرمكم الله بنصره آل محمد، وقد ركب منهم ما قد علمت، وحرموا ومنعوا حقهم وصاروا إلى ما رأيت، وقد كتب إليك المدى كتابا وهؤلاء الشهود عليه.

"আপনারা আহলি বায়তের লোক। মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের সাহায্যের দ্বারা আল্লাহ্ আপনাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আপনারা জানেন, তাদের প্রতি কেমন আচরণ করা হয়েছে। তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের যে অবস্থা হয়েছে তা আপনি দেখছেন। মাহ্দী আপনাকে একটি চিঠি লিখেছেন এবং এরা হলো তার সাক্ষী।"

অতঃপর সেখানে উপস্থিত ইয়াযীদ ইবন আনাস আল-আসাদী, আল-আহ্মার ইবন শুমাইত আল-বাজালী, 'আবদুল্লাহ ইবন কামিল আশ শাকিরী ও আবূ 'উমারা কায়সান সমবেত কণ্ঠে বলে ঃ

نشهد أن هذا كتابه قد شهدناه حين دفعه إليه.

"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এটা তাঁর (মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার) চিঠি। এ চিঠি তাঁর (মুখতারের) হাতে অর্পণ করার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম।"

ইবরাহীম চিঠি নিয়ে পাঠ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এভাবে :[২৯]

أنا اول من يجيب وقد أمرنا بطاعتك وموازرتك.

"আমি হবো প্রথম সাড়াদানকারী ব্যক্তি। আমাদেরকে আপনার সাহায্য ও সহযোগিতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কূফা দখল ও ইমাম হুসাইনের (রা) হত্যাকারীদের হত্যা

ইবরাহীম নাখা'ঈর সমর্থন ও সহযোগিতায় মুখতারের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি এবার প্রকাশ্যে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। ইবন যুবাইরের (রা) পুলিশ অফিসার ইয়াস ইবন নাদার কিছুটা বিধি-নিষেধ ও কঠোরতা আরোপ করলে ইবরাহীম ইবন আশতার তাঁকে হত্যা করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন মুতী', যিনি ইবন যুবাইরের (রা) পক্ষ থেকে কূফার ওয়ালী ছিলেন, মুখতারের বিদ্রোহমূলক আচরণ দমনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মুখতার ও ইবরাহীম সম্মিলিতভাবে ইবন মুতী'কে পরাজিত করেন। ইবন মুতী' তাঁদের হাত থেকে নিজের প্রাণ ভিক্ষা নিয়ে কূফা ত্যাগ করেন। অতঃপর সেখানে মুখতারের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩০]

---

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. আল-আখবার আত-তিওয়াল-২৫৭-৩০০; তাবি'ঈন-৪১৩

কূফায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর মুখতারের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। এখন তার ক্ষমতার দাপট দেখানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং তিনি হযরত হুসাইনের (রা) হত্যাকারীদের এবং তাদের সহযোগীদেরকে নির্মূল করা আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাদের হত্যা অভিযান শেষ করেন।

'উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের মাথা কেটে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা ও ইমাম যাইনুল 'আবিদীনের (রহ) নিকট পাঠান। মুখতারের ধোঁকা ও প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও কাজটি এমন ছিল যে, তাঁরা আবেগাপ্লুত না হয়ে পারেননি। অবলীলাক্রমে তাঁদের অনেকের মুখ থেকে এ কাজের জন্য প্রশংসামূলক বাক্য উচ্চারিত হয়। তবে একথা সত্য যে, মুখতারের এ প্রতিশোধমূলক হত্যাযজ্ঞকে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মোটেও সমর্থন করেননি। ইবন সা'দ বলেন :[৩১]

وكان ابن الحنفية يكره أمر المختار وما يبلغه عنه ولايحب كثيرا مما يأتي به.

"ইবনুল হানাফিয়্যা মুখতারের কর্মকাণ্ড এবং তাঁর সম্পর্কে যে সকল খবর আসতো তা মোটেও পছন্দ করতেন না।"

যাই হোক, হুসাইন (রা) হত্যাকারীদের নির্মূল করার পর মুখতার মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে এ চিঠিটি পাঠান :[৩২]

من المختار بن أبي عبيد الطالب بثأر محمد، أما بعد فإن الله تبارك وتعالى لم ينتقم من قوم حتى يعذر إليهم، وإن الله قد أهلك الفسقة وأشياع الفسقة وقد بقيت بقايا أرجو أن يلحق الله أخرهم بأولهم.

"মুহাম্মাদের (সা) পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীদার মুখতার ইবন আবী 'উবায়দ। আল্লাহ কোন জাতি বা সম্প্রদায় থেকে বদলা নেন না যতক্ষণ না তাদের কৈফিয়াত শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ সকল পাপাচারী, পাপাচারীদের অনুসারীদের ধ্বংস করেছেন, আর যা অবশিষ্ট আছে আশা করি আল্লাহ তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম ব্যক্তির সাথে মিলিত করবেন।"

ইবন আল-হানাফিয়্যাকে আটক ও মুক্তি

'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) প্রথম দিকে নিজের বাই'আতের জন্য ইবন আল-হানাফিয়্যার উপর তেমন চাপ প্রয়োগ করেননি। কিন্তু যখন কূফাসহ অন্য কিছু স্থানে মুখতারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে ইরাকে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার বাই'আত গ্রহণকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন ইবন আয-যুবাইর (রা) তাঁর দিক থেকে হুমকি অনুভব করতে থাকেন। আর তখন থেকেই

---

৩১. আত-তাবাকাত-৫/১০০

৩২. প্রাগুক্ত

তিনি ইবন আল-হানাফিয়্যা ও 'আবদুল্লাহ ইবন আল-'আব্বাসের (রা) উপর নিজের বাই'আতের জন্য প্রবল চাপ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁরা বাই'আত করতে রাজী হননি। অবশেষে তাঁদেরকে তাদের পরিবার-পরিজনসহ একটি উপত্যকায় নজরবন্দী করা হয়। একটি বর্ণনা মতে ইবন আল-হানাফিয়্যাকে যমযম কূপের নিকটে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে তার পাশে জ্বালানী কাঠের স্তূপ করা হয়। তারপর ইবন সা'দের বর্ণনা মতে ইবন আয-যুবাইর (রা) তাদেরকে ধমক দেন এ ভাষায় : [৩৩]

والله لتبايعن أو لأحرقنكم بالنار فخافوا على أنفسهم.

"আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই বাই'আত করবে অথবা আমি অবশ্যই তোমাদের পুড়িয়ে মারব। ফলে তাঁরা প্রাণের আশংকা করেন।"

হুমকি দেওয়া হয় যে, যদি তিনি বাই'আত না করেন তাহলে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। এমন এক নাজুক অবস্থায় তিনি সুলাইম আবূ 'আমির মারফত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট তাঁর করণীয় কী সে সম্পর্কে জানতে চান। তিনি বলে পাঠান যে, কক্ষনো আনুগত্য স্বীকার করবে না, নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকবে। কিন্তু মক্কায় অবস্থান করে বাই'আতের অস্বীকৃতির উপর অটল থাকা অসম্ভব ছিল। এ কারণে তিনি মক্কা ছেড়ে কূফা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। মুখতার এ সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে মোটেই খুশী হতে পারলেন না। কারণ, ইবন আল-হানাফিয়্যা ইরাক পৌঁছালে তাঁর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। মূলতঃ মুখতার তো ইবন আল-হানাফিয়্যার নামটিই কেবল ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তাই তিনি তাঁর কূফা আগমন ঠেকানোর জন্য কূফাবাসীদেরকে বলতে শুরু করেন যে, 'মেহেদীর আলামত হলো, যখন তিনি তোমাদের এখানে আসবেন তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বাজারের মধ্যে তরবারি দিয়ে আঘাত করবে, কিন্তু তাতে মেহেদী মোটেই আহত বা ব্যথা পাবেন না। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা নিজের সম্পর্কে প্রচারিত এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতে পেরে কূফা যাওয়ার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন। তিনি আবূ তুফাইল 'আমির ইবন ওয়াছিলার মাধ্যমে স্বীয় ইরাকী অনুসারীদের নিকট নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে দেন। 'আমির ইরাক পৌঁছে তথাকার অধিবাসীদের নিকট ইবন আল-হানাফিয়্যার বিস্তারিত অবস্থা তুলে ধরেন। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে মুক্ত করার জন্য মুখতার 'আবূ 'আবদিল্লাহ আল-জাদালীর নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠান। যাত্রাকালে তিনি আবূ 'আবদিল্লাহকে বলেন, যদি বানূ হাশিম জীবিত থাকে তাহলে তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করবে। আর যদি তাদেরকে হত্যা করা হয়ে থাকে তাহলে যেভাবে সম্ভব আলে যুবাইর তথা যুবাইর বংশের লোকদেরকে খতম করে ফেলবে।

'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) মধ্যে মুখতারের এই চৌকষ বাহিনীর প্রতিরোধ

---

৩৩. প্রাগুক্ত-৫/১০১

করার শক্তি ছিল না। এ কারণে একটি বর্ণনা মতে, তিনি মুখতারের বাহিনী মক্কা পৌঁছার পূর্বে দারুন নাদওয়া-তে গিয়ে অবস্থান নেন। তবে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি কা'বার গিলাফের তলে আশ্রয় নেন। এদিকে ইরাকী বাহিনী মক্কা পৌঁছে জ্বালানী কাঠের স্তূপের মধ্য থেকে ইবন আল-হানাফিয়্যা ও ইবন 'আব্বাসকে উদ্ধার করে। এর মধ্যে ইবন আয-যুবাইরের লোকজন মক্কায় এসে যায়। তবে কোন সংঘাত-সংঘর্ষ হয়নি। ইরাকীদের পক্ষ থেকে আবূ 'আবদিল্লাহ আল-জাদালী ইবনুল হানাফিয়্যা ও ইবন 'আব্বাসকে (রা) বলেন, আপনারা অনুমতি দিলে আমরা ইবন আয-যুবাইরকে হত্যা করে মানুষকে এই আপদ থেকে মুক্তি দিতে পারি। কিন্তু ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, না, তাঁকে হত্যা করা যাবে না। কারণ আল্লাহ এই শহরে প্রাণী হত্যা হারাম ঘোষণা করেছেন। কেবল নবী কারীমের (সা) সম্মানে কয়েক ঘণ্টার জন্য এ নিষেধাজ্ঞা রহিত করা হয়। অন্যথায় না তাঁর পূর্বে অন্য কারো জন্য, আর না তাঁর পরে কখনো রহিত হয়েছে। যতটুকু হয়েছে, তাই যথেষ্ট। তোমরা আমাদেরকে মুক্ত করে নিয়ে যাও। অতঃপর ইরাকী সৈনিকরা তাঁদেরকে মুক্ত করে মিনায় নিয়ে যায়। কয়েক দিন তাঁরা সেখানে অবস্থান করে ইবন আয-যুবাইরের হাত থেকে বাঁচার জন্য তায়িফ চলে যান। সেখানে হজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করেন।[৩৪]

হিজরী ৬৮ সনে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) তায়িফে ইনতিকাল করেন। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

আমীরুল হজ্জ

তখন সময়টি ছিল আন্তঃকলহ ও গৃহ বিবাদের। কমপক্ষে চার ব্যক্তি খিলাফাতের দাবীদার ছিলেন। সুতরাং সেই বছর চারজন আমীরের নেতৃত্বে হজ্জ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা তায়িফবাসীদের সংগে, 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) তাঁর অনুসারীদের সংগে, নাজদা ইবন 'আমির হারূরী খারিজীদের সংগে এবং বানূ উমাইয়্যারা শামবাসীদের সংগে হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কায় আসে। চারটি চরম প্রতিদ্বন্দ্বী দলের একত্র সমাবেশ মোটেই বিপদমুক্ত ছিল না। মক্কার পবিত্র হারামে যে কোন সময় সংঘাত-সংঘর্ষের প্রবল সম্ভাবনা ছিল। বিষয়টি উপলব্ধি করে মুহাম্মাদ ইবন যুবাইর ইবন মুত'ইম (আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের ভাই নন, বরং ভিন্ন ব্যক্তি) স্বউদ্যোগে চারটি দলের প্রত্যেক নেতার নিকট যান এবং তাঁদেরকে সংযম ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। প্রথমে তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট যান এবং তাঁকে বলেন : 'আবুল কাসিম! আল্লাহকে ভয় করুন। আমরা এখন পবিত্র শহরে পবিত্র স্থানে অবস্থান করছি। হাজীগণ কা'বা ঘরে আল্লাহর প্রতিনিধি ও মেহমানস্বরূপ। এজন্য তাঁদের হজ্জ বিনষ্ট করবেন না।' জবাবে ইবন আল-হানাফিয়্যা বলেন : আল্লাহর কসম! আমিও এটা চাই না। আমি কোন মুসলিমকে বাইতুল্লাহ-তে আসতে বাধা দিব না এবং আমার দলের

---

৩৪. প্রাগুক্ত-৫/১০১-১০২

কোন হাজীও তা করবে না। তবে আমি আত্মরক্ষার জন্য যা করার তা করবো। আর কেবল তখনই আমি খিলাফাতের দাবী করবো যখন দু'জন মানুষও আমার দাবীর বিরোধিতা করবে না। আমার দিক থেকে নিশ্চিন্তে থাকুন। আমাকে বাদ দিয়ে আপনি বরং 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) ও নাজদা হারূরীর নিকট যান এবং তাঁদের সাথে কথা বলুন। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবন যুবাইর যান 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) নিকট এবং ইবন আল-হানাফিয়্যাকে যে কথা বলেছিলেন তাঁকেও একই কথা বলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) জবাব দেন : 'আমার খিলাফাতের ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা' (ঐকমত্য) হয়ে গেছে। সকলে আমার বাই'আত করেছে। কেবল এই লোকগুলো (বানূ হাশিম) আমার বিরোধিতা করছে।' মুহাম্মাদ ইবন যুবাইর বললেন, যা কিছুই হোক, এ সময় আপনার হাত নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিৎ হবে। তিনি বলেন, ঠিক আছে, আমি আপনার কথা মত কাজ করবো। এরপর মুহাম্মাদ ইবন যুবাইর গেলেন নাজদা হারূরীর নিকট। নাজদা বললেন, আমরা সংঘাতের সূচনা করবো না। তবে যারা আমাদের সংগে লড়বে আমরা তার মুকাবিলা করবো। সবশেষে তিনি গেলেন বানূ উমাইয়্যাদের নিকট। তারা বললো, আমরা তো আমাদের পতাকার নিকট অবস্থান করছি। কেউ আগ বাড়িয়ে আমাদের সাথে সংঘর্ষে না জড়ালে আমরা আগে কাউকে আক্রমণ করবো না। মুহাম্মাদ ইবন যুবাইর বলেন, এই চারটি দলের পতাকার মধ্যে ইবন আল-হানাফিয়্যার পতাকাটি ছিল সবচেয়ে বেশি নিরাপদ ও প্রশান্ত। এভাবে মুহাম্মাদ ইবন যুবাইরের চেষ্টায় সে যাত্রায় একটা রক্তক্ষয়ী সংঘাত থেকে মুসলিম উম্মাহ রক্ষা পায়। এ বছর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা তাঁর চার হাজার সঙ্গী-সাথীসহ হজ্জ আদায় করেন।[৩৫]

মুখতারের সমাপ্তি এবং মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) প্রস্তাব

হিজরী ৬৮ সনে 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) ভাই মুস'আব ইবন আয-যুবাইর (রা) বড় বড় কয়েকটি যুদ্ধের মাধ্যমে মুখতারের হত্যা ও তাঁর শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। এ সকল যুদ্ধের সাথে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার কোন সম্পর্ক অথবা এর পিছনে কোন প্রকার ভূমিকা ছিল না।

মুখতারের পরিসমাপ্তির পর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে এমন আর কেউ ছিল না। এ কারণে 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) আবার তাঁর নিকট বাই'আতের তাকীদ দিতে আরম্ভ করেন এবং নিজের ভাই 'উরওয়াকে তাঁর নিকট পাঠান। তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে এই বার্তা পৌঁছে দেন যে, "আমার বাই'আত না করা পর্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়ছি না। যদি বাই'আত না করেন তাহলে আবার নজরবন্দী করবো। যে ভয়ংকর মিথ্যাবাদীর সাহায্য ও সহযোগিতার উপর আপনার আশা-ভরসা ছিল আল্লাহ

---

৩৫. প্রাগুক্ত-৫/১০৩-১০৪

তাঁকে ধ্বংস করেছেন। এখন ইরাকসহ গোটা আরব আমার খিলাফাতের ব্যাপারে একমত হয়েছে। এ কারণে আপনিও আমার বাই'আত করুন। অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।"

ইবন আল-হানাফিয়্যা এই হুমকিমূলক বার্তা ধৈর্যসহকারে শোনেন। তারপর বলেন, 'আপনার ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) সম্পর্ক ছিন্ন এবং সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ব্যাপারে খুবই তাড়াহুড়োকারী, আর সেই সাথে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারেও দারুণ উদাসীন। তিনি মনে করেন, দুনিয়াতে চিরকাল থাকবেন, এই কিছুদিন পূর্বেও যখন মুখতার তাঁর সহযোগী ছিল, তিনি আমার চেয়েও মুখতার ও তার কর্মকাণ্ডের বেশি স্বীকৃতি দানকারী ছিলেন। আল্লাহর কসম! আমি মুখতারকে না আমার আহ্বানকারী নিয়োগ করেছি, আর না তাকে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করেছি। এই তো কিছুদিন আগের কথা, সে তো আমার চেয়েও 'আবদুল্লাহর (রা) বেশি অনুগত এবং অনুসারী ছিল। সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে বহু দিন যাবত তো তিনি এই ভয়ংকর মিথ্যাবাদীকে নিজের সংগে রেখেছিলেন। আর যদি সে মিথ্যাবাদী না হয় তাহলে আমার চেয়েও 'আবদুল্লাহর (রা) তা বেশি জানা থাকার কথা। আমি 'আবদুল্লাহর (রা) প্রতিপক্ষ নই। যদি তাই হতাম তাহলে তাঁর কাছাকাছি থাকতাম না, যারা আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাদের কাছে চলে যেতাম। কিন্তু আমি কারো আমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি। আপনার ভাইয়ের আরেকজন প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান। তিনিও আপনার ভাইয়ের মত দুনিয়ার প্রত্যাশী। তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতাবলে আপনার ভাইয়ের ঘাড় চেপে ধরেছে। আমার মনে হচ্ছে আপনার ভাইয়ের নৈকট্যের চেয়ে 'আবদুল মালিকের নৈকট্য আমার জন্য স্বস্তিকর। 'আবদুল মালিক পত্র মারফত আমাকে তাঁর কাছে চলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।"

উরওয়া প্রশ্ন করলেন : তাহলে সেখানে চলে যাচ্ছেন না কেন? জবাবে ইবন আল-হানাফিয়্যা বলেন : খুব শীঘ্র এ ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট ইসতিখারা (সঠিক ও মঙ্গলজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ) করবো। আমার এখান থেকে চলে যাওয়া আপনার ভাইয়ের পছন্দ হবে এবং এতে তিনি খুশী হবেন। 'উরওয়া বলেন : আমি আপনার বক্তব্য আমার ভাইকে জানাবো।

এই আলোচনার পর 'উরওয়া ফিরে গেলেন। ইবন আল-হানাফিয়্যার সমর্থক কিছু লোক 'উরওয়াকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু তিনি তাদেরকে শক্তভাবে বাধা দেন। এ কারণে 'উরওয়া সহীহ-সালামতে ফিরে যাওয়াতে তারা ভীষণ নাখোশ হয়। তারা ইবন আল-হানাফিয়্যাকে বলে : যদি আপনি আমাদের কথা শুনতেন তাহলে আমরা তার ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতাম। ইবন আল-হানাফিয়্যা বলেন : কোন অপরাধে তোমরা তাঁকে হত্যা করতে? তিনি শুধু তাঁর ভাইয়ের দূত হিসেবে এসেছিলেন এবং আমাদের যিম্মায় ও নিরাপত্তায় ছিলেন। আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনার পর আমরা তাঁকে তাঁর ভাইয়ের নিকট ফেরত পাঠিয়েছি। তোমরা যে কথা বলছো তা তো প্রতারণা। আর প্রতারণার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। যদি আমি তোমাদের কথামত কাজ

করতাম তাহলে মক্কায় রক্ত ঝরতো। আর এই ব্যাপারে তোমরা আমার চিন্তাধারা সম্পর্কে অবহিত আছো। যদি সকল মুসলিম আমার খিলাফাতের ব্যাপারে একমত হয়ে যায় এবং একজন মাত্র মানুষ ভিন্নমত পোষণ করে তাহলেও আমি ঐ লোকটির সাথে যুদ্ধ করা সঙ্গত মনে করবো না।"

'উরওয়া ফিরে গেলেন এবং ভাইকে ইবন আল-হানাফিয়্যার বক্তব্য শোনালেন। সেই সাথে এ পরামর্শও দিলেন যে, আপনি তাঁর সঙ্গে আর বিবাদ না করে তাঁকে মুক্ত করে দিন। তিনি আমাদের এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা দূরে কোথাও চলে যাক। 'আবদুল মালিক তাঁর থেকে বাই'আত না নিয়ে তাঁকে শামে থাকতেই দেবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সকল মুসলিম 'আবদুল মালিকের খিলাফাতের ব্যাপারে একমত না হবে ততক্ষণ তিনিও তাঁর বাই'আত করবেন না। এমতাবস্থায় 'আবদুল মালিক তাঁকে হত্যা অথবা কারারুদ্ধ করবে। আর এতে আপনার উদ্দেশ্য তার দ্বারা পূর্ণ হবে। তাতে আপনি দায়মুক্ত থাকবেন। 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) তাঁর ভাইয়ের এ উপদেশ গ্রহণ করেন এবং ইবন আল-হানাফিয়্যার সাথে আর কোন বিবাদে গেলেন না।[৩৬]

'আবদুল মালিকের আমন্ত্রণ এবং ইবন আল-হানাফিয়্যার শাম গমন ও প্রত্যাবর্তন

'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরকে (রা) প্রতিহত করার উদ্দেশে 'আবদুল মালিক মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার সমর্থন লাভের আশায় বহুদিন আগে থেকে তাঁকে শামে চলে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট থেকে 'উরওয়ার ফিরে যারওয়ার পর 'আবদুল মালিক ইবন আল-হানাফিয়্যাকে আরেকটি পত্র পাঠান। পত্রটি নিম্নরূপ :[৩৬]

إنه قد بلغني أن بن الزبير قد ضيق عليك وقطع رحمك واستخف بحقك حتى تبايعه فقد نظرت لنفسك ودينك وأنت أعرف به حيث فعلت ما فعلت، وهذا الشام فانزل منه حيث شئت فنحن مكرموك وواصلوا رحمك وعافو حقك.

"আমি জেনেছি, আপনার বাই'আত আদায়ের জন্য 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন, আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, আপনার সম্মান ও অধিকার ভুলুণ্ঠিত করছেন। আপনি যা কিছু করেছেন তা আপনার জীবন ও দীনের প্রতি লক্ষ্য রেখে করেছেন। এই শাম আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত। এখানে আপনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারবেন। আমরা আপনার সব ধরনের নিরাপত্তা, সম্মান ও অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করবো।"

আগে থেকেই মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মক্কা থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছিলেন। তাই এই চিঠি পেয়ে তিনি শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রথমে আয়লায় পৌঁছেন।

---

৩৬. প্রাগুক্ত-৫/১০৫-১০৬: তাবি'ঈন-৪১৭-৪১৯

৩৬ . প্রাগুক্ত-৫/১০৭

তথাকার অধিবাসীরা তাঁর সকল সহযাত্রীসহ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। তাঁর প্রতি দারুণ বিনয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। অত্যন্ত সম্মানের সাথে তিনি সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। দু'চার দিনের মধ্যেই তিনি সেখানে "আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার" (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ)-এর কাজ শুরু করেন। তিনি মানুষকে বলতে থাকেন, তাঁর অনুসারীদের উপর এবং তাঁর উপস্থিতিতে যেন কেউ কারো উপর যুলম না করে। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার আয়লায় উপস্থিতি ও জনপ্রিয়তার কথা 'আবদুল মালিক জানতে পেরে শংকিত হলেন। তিনি তাঁর বিশেষ উপদেষ্টা কুবায়সা ইবন যুওয়াইব ও রাও'উ ইবন যানবা' জুযামীর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বলেন, তাঁর বাই'আত গ্রহণ ছাড়া তাঁকে এত নিকটে অবস্থান করার অনুমতি দেওয়া ঠিক হবে না। হয় তিনি বাই'আত করবেন, না হয় তাঁকে আবার হিজাযে পাঠিয়ে দিন।

উপরোক্ত পরামর্শের ভিত্তিতে 'আবদুল মালিক মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে লেখেন :[৩৮]

إنك قدمت بلادى فنزلت فى طرف منها، وهذه الحرب بيني وبين بن الزبير كما تعلم، وأنت لك ذكر ومكان، وقد رأيت أن لاتقيم فى سلطانى إلا أن تبايع لى، فإن بايعتني فخذ السفن التى قدمت علينا من القلزم وهى مائة مركب فهى لك وما فيها، ولك ألفا ألف درهم أعجل لك منها خمسمائة ألف وألف ألف وخمسمائة ألف أتيتك مع ما أردت من فريضة لك ولولدك ولقراتبك ومواليك ومن معك، وإن أبيت فتحول عن بلدى إلى موضع.

"আপনি আমার দেশের একটি কোণে এসে অবস্থান নিয়েছেন। আপনি জানেন এখন আমার ও ইবন আয-যুবাইরের (রা) মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। আপনি একজন বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি। এ কারণে আমার ক্ষমতাধীন দেশে আমার বাই'আত ছাড়া আপনার অবস্থান আমার স্বার্থের পরিপন্থী। যদি আপনি বাই'আত করতে ইচ্ছুক হন তাহলে লোহিত সাগরে যে একশো জাহাজ ভর্তি দ্রব্যসামগ্রী এসেছে তা সবই এবং সেই সাথে আরো বিশ লাখ দিরহাম আপনাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। তার মধ্যে পাঁচ লাখ এক্ষুণি দেওয়া হবে এবং পনেরো লাখ পরে পাঠানো হবে। এছাড়া আপনি যে পরিমাণ নির্ধারণ করবেন সেই অনুযায়ী আপনার নিকট আত্মীয়, দাস-দাসী এবং আপনার সংগী-সাথীদের ভাতা প্রদান করা হবে। আর যদি আপনি বাই'আত না করেন তাহলে এই মুহূর্তে আমার দেশ ছেড়ে আমার সীমানার বাইরে চলে যান।"

জবাবে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা লিখলেন :[৩৯]

---

৩৮. প্রাগুক্ত

৩৯. প্রাগুক্ত-৫/১০৮

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن علي إلى عبد الملك بن مروان، سلام عليك، فإني أحمد إليك الذى لا إله إلا هو، أما بعد فقد عرفت رأيي في هذا الأمر قديما، وإني لست أسفهه على أحد، والله لو إجتمعت هذه الأمة عليّ إلا أهل الزرقاء ما قاتلتهم أبدا ولا اعتزلتهم حتى يجتمعوا. نزلت مكة فرارا مما كان بالمدينة فجاورت بن الزبير فأساء جوارى وأراد منى أن أبايعه فأبيت ذلك حتى يجتمع الناس عليك أو عليه، ثم أدخل فيما دخل الناس فأكون كرجل منهم، ثم كتبت إلى تدعونى إلى ما قبلك فأقبلت سائرا فنزلت في طرف من أطرافك، والله ما عندى خلاف ومعى أصحابى فقلنا بلاد رخيصة الأسعار وندنو من جوارك ونتعرض صلتك. فكتبت بما كتبت به ونحن منصرفون عنك إن شاء الله.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। মুহাম্মাদ ইবন 'আলীর পক্ষ থেকে 'আবদুল মালিকের প্রতি সালাম। সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। অতঃপর এই যে, খিলাফাতের ব্যাপারে আমার চিন্তাধারা সম্পর্কে আপনি পূর্বেই অবহিত আছেন। এ ব্যাপারে আমি কাউকে বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিই না। আল্লাহর কসম! যদি গোটা মুসলিম উম্মাহ আমার খিলাফাতের ব্যাপারে একমত হয়ে যায় এবং কেবল যারকা' বাসীরা দ্বিমত পোষণ করে তাহলেও তাদের সংগে সংঘাতে যাব না। তাদেরকে ছেড়ে বিচ্ছিন্নও হয়ে যাব না, যতক্ষণ না তারা ঐকমত্যে আসে। মদীনায় অস্থিরতার কারণে মক্কায় চলে এসেছিলাম এবং 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের নিকটে অবস্থান করছিলাম। কিন্তু তিনি আমার সাথে সদাচরণ করেননি, আমার থেকে বাই'আত নিতে চেয়েছেন, কিন্তু অস্বীকার করেছি। বলেছি, যতক্ষণ আপনার ও তাঁর মধ্যেকার বিরোধে মুসলিম উম্মাহ্ কোন ঐকমত্যে না পৌঁছবে ততক্ষণ আমি বাই'আত করবো না। তারা যে সিদ্ধান্ত নিবে, আমিও তাদের সাথে থাকবো। এই অবস্থা এবং এমন টানাপোড়নের মধ্যে আপনি আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আপনার ক্ষমতাধীন দেশের একটি কোণায় এসে অবস্থান নিয়েছি। আল্লাহর কসম! আমার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন ইচ্ছা নেই। আমার সকল লোকজন আমার সংগেই ছিল। দেখলাম এ স্থানটি নিরিবিলি জীবন যাপনের জন্য উপযুক্ত। তাই মনে করলাম, ভালো হলো, আপনার নিকটে থেকে আপনার সাথে সম্পর্কের দ্বারা উপকৃত হবো। কিন্তু এখন আপনি যা লেখার তা লিখছেন। এ কারণে, ইনশাআল্লাহ আমরা আবার ফিরে যাব।"

এই জবাবী পত্রটি পাঠিয়ে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা নিজের সাত হাজার সঙ্গীর সামনে নিম্নের এই ভাষণটি দান করেন :[৪০]

---

৪০. প্রাগুক্ত

الله ولى الأمور كله وحاكمها، ماشاء الله كان ومالا يشاء لم يكن، كل ماهو آت قريب، عجلتم بالأمر قبل نزوله، والذى نفسى بيده إن فى أصلابكم لمن يقاتل مع آل محمد ما يخفى على أهل الشرك أمر آل محمد وأمر آل محمد مستأخر. والذى نفس محمد بيده ليعودن فيكم كما بدأ الحمد لله الذى حقن دماءكم وأحرز دينكم! من أحب منكم أن يأتي مأمنه إلى بلده آمنا محفوظا فلينفعل.

"আল্লাহ সকল কাজ ও বিষয়ের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক। তিনি যা চান তাই হয়, আর যা না চান তা হয় না। যা কিছু হওয়ার তা অবশ্যই হবে। আপনারা খিলাফাতের ব্যাপারে সময়ের পূর্বেই খুব তাড়াহুড়ো করেছেন। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! আমাদের পশ্চাতে এমন সব জীবন উৎসর্গকারী মানুষ আছে যারা মুহাম্মাদ (সা)-এর বংশধরদের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করবে। মুহাম্মাদ (সা)-এর বংশধরদের অধিকার অংশীবাদীদের জন্য ঢাকা থাকবে না। দেরীতে হলেও পূরণ হবে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতের মুঠোয় আমার জীবন! যেভাবে এ খিলাফাত তোমাদের মধ্যে ছিল, একদিন আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে আসবে। সেই আল্লাহর শোকর যিনি আপনাদের জীবন বাঁচিয়েছেন এবং আপনাদের দীনের হিফাযাত করেছেন। আপনাদের মধ্যে যারা নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে নিজ নিজ শহর ও আবাসস্থলে ফিরে যেতে পারবেন বলে মনে করেন, তারা যেতে পারেন।"

এই অনুমতির পর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার অধিকাংশ সঙ্গী চলে যায়। সাত হাজারে মধ্যে মাত্র নয় শো থেকে যায়। তাদেরকে সংগে নিয়ে তিনি মক্কায় ফিরে যান।[৪১]

আয়লা থেকে ফিরে আসার পর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার অবস্থা সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা এ রকম যে, তখন ছিল হজ্জের মওসুম। এ কারণে তিনি 'উমরার নিয়্যাতে ইহরাম বাঁধেন এবং কুরবানীর পশু সংগে নিয়ে সোজা মক্কায় পৌঁছেন। কিন্তু যখন হারামে প্রবেশ করতে যাবেন তখন 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) অশ্বারোহী সৈনিকরা বাধা দেয়। তিনি ইবন আয-যুবাইরের (রা) নিকট এ বার্তা পাঠান যে, আমি মক্কা থেকে যাওয়ার সময়ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হইনি এবং এখন ফেরার পরেও সে ইচ্ছা নেই। এ কারণে আমাদের পথ ছেড়ে দিন, আমরা বাইতুল্লাহ-তে যেয়ে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করি। হজ্জ আদায়ের পর আমরা এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু ইবন আয-যুবাইর (রা) তাঁকে বায়তুল্লাহ'-য় যাওয়ার অনুমতি দেননি। তাই তিনি কুরবানীর পশুসহ মদীনায় চলে যান এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি মক্কায় পৌঁছে তাঁর মিনার শিবিরে অবস্থান নেন।

---

৪১. প্রাগুক্ত-৫/১০৯

দু'দিন পরেই ইবন আয-যুবাইর (রা) তাঁকে এ বার্তা পাঠান যে, এখান থেকে সরে যান, আমাদের কাছাকাছি থাকবেন না। এ বার্তা পেয়ে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মন্তব্য করেন : 'যতক্ষণ আল্লাহ্ আমাদের জন্য কোন উপায় বের করে না দেন ততক্ষণ আমরা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক ধৈর্যধারণ করবো। আল্লাহর কসম! আমি এখনো পর্যন্ত তরবারি উঠানোর ইচ্ছা করিনি। যদি আমি তরবারি উঠাতাম তাহলে আমি একা হলেও এবং তাঁর সাথে তাঁর পুরো দল থাকলেও তিনি এভাবে আমার সাথে খেলতে পারতেন না। কিন্তু আমি তরবারি উঠাতে চাই না। ইবন আয-যুবাইর (রা) প্রতিবেশীকে দুঃখ দান থেকে বিরত হবেন না।" এরপর তিনি তায়িফ চলে যান। এর কয়েক মাস পরেই হিজরী ৭২ সনে যুল কা'দা মাসে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ মক্কা অবরোধ করে এবং ইবন আয-যুবাইরকে তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ নির্মমভাবে হত্যা করে।[৪২]

আরেকটি বর্ণনা এ রকমও আছে যে, হাজ্জাজ কর্তৃক 'আবদুল্লাহ্ ইবন আয-যুবাইর (রা) অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মক্কাতেই ছিলেন। হাজ্জাজ তাঁর কাছেও 'আবদুল মালিকের বাই'আতের জন্য বার্তা পাঠায়। জবাবে তিনি হাজ্জাজকে বলে পাঠান : আমার মক্কায় অবস্থান, তায়িফ ও শাম সফরের অবস্থা আপনার জানা আছে। সব রকমের কষ্ট আমি এজন্য সহ্য করছি যে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কারো হাতে বাই'আত করতে চাই না যতক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের কোন একজনের ব্যাপারে জনগণ ঐকমত্যে না পৌঁছে। আমার মধ্যে বিরুদ্ধাচরণের কোন প্রেরণা নেই। কিন্তু আমি যখন দেখেছি খিলাফাতের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে মত পার্থক্য আছে তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যতক্ষণ সকলে কোন একজনের ব্যাপারে একমত না হবে ততক্ষণ এই বিষয় থেকে দূরে থাকবো। আল্লাহর এই শহরে, যার সম্মান ও মর্যাদা সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক, যেখানে একটি পাখীও নিরাপদ, সেখানে আমি আশ্রয় নিয়েছি। ইবন আয-যুবাইর (রা) আমার সাথে সদাচরণ করেননি, তাই আমি শামে চলে যাই। কিন্তু সেখানে 'আবদুল মালিকও আমার নৈকট্য চাননি। এ কারণে আমি আবার মক্কার হারামে চলে এসেছি। এখন যদি ইবন আয-যুবাইর (রা) নিহত হন এবং 'আবদুল মালিকের খিলাফাতের ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত হয়ে যায় তাহলে আমি আপনার হাতে বাই'আত করে নিব। কিন্তু হাজ্জাজ বাই'আতের ব্যাপারে অপেক্ষা করতে মোটেই রাজী ছিলেন না। তিনি বার বার চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন, আর ইবন আল-হানাফিয়্যাও কোন না কোনভাবে এড়িয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) নিহত হলেন। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার ছেলে হাসান বলেন :

لم يبايع أبى الحجاج.

"আমার পিতা হাজ্জাজের বাই'আত করেননি।"[৪৩]

---

৪২. প্রাগুক্ত

৪৩. প্রাগুক্ত--৫/১১০

'আবদুল মালিকের অনুকূলে বাই'আত

'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) নিহত হওয়ার পর 'আবদুল মালিক হাজ্জাজকে লিখলেন যে, "মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার মধ্যে বিরোধিতার কোন মানসিকতা নেই। তাই আশা করা যায় এখন তিনি তোমার কাছে এসে বাই'আত করে নিবেন। তাঁর সাথে নম্র ব্যবহার কর।" মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা নিজেও প্রথম থেকে বলে আসছিলেন যে, যখন কোন এক ব্যক্তির ব্যাপারে মুসলমানদের ঐকমত্য হয়ে যাবে তখন আমি তাঁকে মেনে নিব। অতএব 'আবদুল মালিকের ব্যাপারে সকলে একমত হওয়ার পর যখন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাঁর বাই'আত করেন তখন তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে বলেন, এখন তো বিষয়টি আর অমীমাংসিত নয়। সুতরাং আপনিও বাই'আত করে নিন। পূর্বেই এ ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্তে এসে গিয়েছিলেন, তাই এখন হাজ্জাজের হাতে বাই'আত করে খলীফা 'আবদুল মালিককে নিম্নের পত্রটি লেখেন :[৪৪]

بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من محمد بن على أما بعد فانى لما رأيت الأمة قد اختلفت اعتزلتهم، فلما افضى هذا الأمر إليك و بايعك الناس كنت كرجل منهم أدخل فى صالح ما دخلوا فيه، فقد بايعتك وبايعت الحجاج لك بعثت إليك ببيعتى، ورأيت الناس قد اجتمعوا عليك، ونحن نحب أن تؤمننا وتعطينا ميثاقا على الوفاء فإن العذر لاخير فيه، فإن أبيت فإن أرض الله واسعة.

"অতঃপর এই যে, সেই সময় যখন উম্মাতের মধ্যে খলীফার ব্যাপারে মত বিরোধ ছিল, আমি মানুষের থেকে দূরে ছিলাম। এখন, যখন আপনি খিলাফাত পেয়ে গেছেন এবং মুসলমানরাও আপনার বাই'আত করেছে, তখন আমিও এই দলে মিশে গেলাম। তারা যে কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করেছে আমিও তাতে প্রবেশ করলাম। আমি হাজ্জাজের হাতে আপনার বাই'আত করেছি এবং এখন এই লিখিত বাই'আত আপনাকে পাঠাচ্ছি। কারণ, আপনার খিলাফাতের ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা' হয়ে গেছে। এখন আমি চাই, আপনি মানুষকে নিরাপত্তা ও অঙ্গীকার পূরণের আশ্বাস দিন। প্রতারণার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। আর যদি এখনো আপনার মধ্যে দ্বিধা-সংশয় থাকে, অথবা থাকে অস্বীকৃতি, তাহলে জেনে রাখুন আল্লাহর এই যমীন খুবই প্রশস্ত।"

এ পত্র পাওয়ার পর 'আবদুল মালিক তাঁর বিশেষ উপদেষ্টা কুবায়সা ইবন যুওয়াইব ও রাওউ ইবন যানবা' জুযামীর সংগে পরামর্শ করেন। তাঁরা বলেন : 'মুহাম্মাদ ইবন আল-

---

৪৪. প্রাগুক্ত-৫/১১১

হানাফিয়্যার উপর আজও আপনার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তিনি যখন ইচ্ছা তখন সংঘাত-সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারেন। এমতাবস্থায় তিনি যখন আপনার খিলাফাত মেনে নিয়ে বাই'আত করেছেন, তখন আমাদের পরামর্শ হলো, আপনি এক্ষুণি তাঁকে জান-মালের নিরাপত্তার অঙ্গীকার পত্র লিখে পাঠিয়ে দিন। সেই সাথে তাঁর সংগী-সাথীদের ব্যাপারেও তাঁর অঙ্গীকার আদায় করে নিন। তাঁদের এ পরামর্শের পর 'আবদুল মালিক যে পত্রটি লেখেন তা নিম্নরূপ :

"এখন আপনি আমার নিকট একজন প্রশংসা পাওয়ারযোগ্য, সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং ইবন আয-যুবাইরের (রা) চেয়েও অধিকতর নিকটতম ব্যক্তিত্ব। এ কারণে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে হাজির-নাজির জেনে অঙ্গীকার করছি যে, আপনাকে এবং আপনার সংগী-সাথীদের কাউকে এমন আচরণ ও কর্মের দ্বারা অস্থির করা হবে না যা আপনি মোটেই পছন্দ করেন না। আপনি আপনার নিজ শহরে ফিরে যান এবং যেখানে ইচ্ছা নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে অবস্থান করুন। আমি যতদিন জীবিত থাকবো আপনার এই প্রীতি ও শুভেচ্ছার কথা ভুলবো না এবং আপনাকে সাহায্যের ব্যাপারে কোন রকম কার্পণ্য করবো না।" এই পত্রের সাথে হাজ্জাজকেও একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি হাজ্জাজকে ইবন আল-হানাফিয়্যার সাথে সদাচরণের এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন। এই আনন্দদায়ক সন্ধি ও সমঝোতার পর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মদীনায় ফিরে যান এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সেখানে বসবাসের সুযোগ লাভ করেন।[৪৫]

শাম গমন ও 'আবদুল মালিকের সদাচরণ

কয়েক বছর পর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা 'আবদুল মালিকের সাক্ষাৎ কামনা করে একটি পত্র লেখেন। তিনি সানন্দে তা মঞ্জুর করেন। সুতরাং মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা হিজরী ৭৮ সনে শাম সফর করেন। 'আবদুল মালিক হৃষ্টচিত্তে তাঁকে স্বাগতম জানান এবং তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক স্বীয় মহলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের আতিথেয়তার জন্য শাহী ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এক মাসেরও কিছু বেশি সময় তিনি দিমাশকে অবস্থান করেন। এ সময়ে মাঝে মাঝে তিনি 'আবদুল মালিকের সাথে মিলিত হতেন। দরবারে প্রবেশের ক্ষেত্রে শাহী খান্দানের লোকদের পরেই ছিল তাঁর স্থান। একদিন নিরিবিলিতে তিনি 'আবদুল মালিককে তাঁর মোটা অংকের ঋণের কথা বলেন। 'আবদুল মালিক তা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাঁর আরো কোন প্রয়োজন আছে কিনা তা জানতে চান। তিনি ঋণ পরিশোধ, আরো কিছু প্রয়োজন এবং নিজের সন্তানাদি, সঙ্গী-সাথী, চাকর-বাকর ও দাস-দাসীদের ভাতা নির্ধারণের কথাও তাঁকে বলেন। 'আবদুল মালিক দাস-দাসীদের ভাতা ছাড়া অন্য সকল প্রয়োজন ও দাবী পূরণ করেন। তারপর তাঁর একান্ত পীড়াপীড়িতে দাস-দাসীদের ভাতাও

---

৪৫. প্রাগুক্ত; তাবি'ঈন-৪২৪

নির্ধারণ করেন। তবে তাদের পরিমাণ কম রাখেন। শেষ পর্যন্ত ইবন আল-হানাফিয়্যার অত্যধিক চাপে 'আবদুল মালিক তাদেরও ভাতা বাড়িয়ে দেন। তিনি তাঁর সকল দাবী ও প্রয়োজন পূরণের প্রতিশ্রুতি আদায় করে মদীনায় ফেরেন। মৃত্যু পর্যন্ত খলীফা 'আবদুল মালিকের সাথে তাঁর এ সম্পর্ক অটুট ছিল।

মৃত্যু

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার মৃত্যু সন ও স্থান নিয়ে বিস্তর মত পার্থক্য আছে। সঠিক মতে তিনি হিজরী ৮১, খৃস্টাব্দ ৭০০ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন এবং বাকী' গোরস্তানে দাফন করা হয়। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইবন আয-যুবাইরের হাত থেকে বাঁচার জন্য কূফায় পালিয়ে যান এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। তবে শী'আদের একটি উপদল কায়সানিয়্যা মনে করে, তিনি জীবিত আছেন, মৃত্যু বরণ করেননি।[৪৬]

পূর্ববর্তী বর্ণনার উপর একটি পর্যালোচনা

পূর্বে যা কিছু উপস্থাপন করা হয়েছে তা কেবল ইতিহাসের আলোকে তাঁর জীবনের ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। কোন রকম পর্যালোচনা করা হয়নি। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা ও বিষয় আছে যা পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। অন্যথায় পূর্বে উল্লেখিত ঘটনাবলীর অনেকটা ইবন আল-হানাফিয়্যার জীবন চিত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। এখানে কয়েকটি ঘটনার কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

হযরত ইমাম হুসাইনের (রা) প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন হযরত ইমাম যাইনুল 'আবিদীন (রহ)। কিন্তু তিনি তাঁর পিতার শাহাদাতের পর পার্থিব ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েন এবং ইমামত ও খিলাফাতের বিবাদ থেকে নিজেকে সযত্নে সম্পূর্ণ দূরে রাখেন। 'আলীর (রা) অনুসারীরা তাঁকে বহু ক্ষেত্রে টেনে আনতে চায়। কিন্তু তিনি এতো দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন যে কারো কোন আহ্বানে কখনো ঘরের বাইরে পা রাখেননি। তাঁর থেকে হতাশ হয়ে 'আলীর (রা) অনুসারীরা ইবন আল-হানাফিয়্যার কাঁধে এই কঠিন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এ কারণে খিলাফাত, ইমামত, আহলি বায়ত ও গায়র আহলি বায়তের প্রশ্ন এবং এর থেকে উদ্ভব বিভিন্ন 'আকীদা, চিন্তা-ভাবনা ও মাসয়ালা ইবন আল-হানাফিয়্যার ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় ইবন আল-হানাফিয়্যা এমন কিছু কাজ করেছেন এবং এমন কিছু 'আকীদা ও চিন্তা-ভাবনা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর নয়। এসব বিষয় পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে।

শী'আ আন্দোলন এবং আহলি বায়ত ও গায়র আহলি বায়ত (নবী পরিবার-নবী পরিবারের বাইরের লোক) ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তি পুরোটাই প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার উপর। এই দল নিজেদের আন্দোলন এবং উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এমন বহু 'আকীদা ও চিন্তা আহলি বায়তের প্রতি আরোপ করেছে। এ কারণে তিনি খিলাফাতের প্রতি দারুণ লোভী

---

৪৬. আত-তাবাকাত-৫/১১২; আল-আ'লাম-৬/২৭০; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩১৯

বলে চিত্রিত হয়েছেন। এর মধ্যে কিছু চিন্তা এমন আছে যা নিতান্তই বিভ্রান্তিকর, যা মানুষকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এসব কথা ও চিন্তা যদি ঐ সকল মহান ব্যক্তির জীবদ্দশায় প্রকাশ পেত অথবা তাঁরা যদি অবগত হতেন তাহলে তার উদ্ভাবক ও প্রচারকদেরকে নিজেদের দল থেকে বের করে দিতেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, "ইসলামী খিলাফাত" যখন পার্থিব অন্যসব রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপ ধারণ করে তখন আহলি বায়তের মধ্যে খিলাফাত লাভ করার প্রেরণা অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছে। অনেকাংশে তা সঠিকও ছিল। কারণ ইসলামী খিলাফাত ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যতক্ষণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর থাকে। ঠিক তেমনি তা গণতান্ত্রিক হবে যখন তা খিলাফাত থাকে। ব্যক্তি ও বংশগত রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপ লাভ করার পর তার দীনী অবস্থান আর অবশিষ্ট থাকে না। সে সময় যদি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতার উত্তরাধিকারীদের অন্তরে তা লাভ করার প্রেরণা সৃষ্টি হয়, অথবা কোন দল তাদের সাহায্যের জন্য উঠে দাঁড়ায় তাহলে তা দোষের কিছু হতে পারে না। কিন্তু আহলি বায়তের প্রেমিক ও সমর্থক বলে দাবীদারগণ ভ্রান্ত 'আকীদা বিশ্বাস আবিষ্কার করে ঐসব মহান ব্যক্তির প্রতি আরোপ করেছে। আসলে তারা ঐসব কথা ও বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা ছিলেন এমন একজন মহান তাওহীদবাদীর ('আলী রা.) বংশধর যিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে জ্বালিয়ে দেন। এ কারণে ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা তিনি কলুষিত হতেই পারেন না। এ ধরনের ভ্রান্ত কথা-বার্তা ও চিন্তা-ভাবনার কথা যখন তাঁর কানে আসতো, তিনি তা শক্তভাবে অস্বীকার করতেন। একবার তিনি জানতে পারলেন, মুখতারের অনুসারীরা প্রচার করছে যে, ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট কুরআন ছাড়াও অন্তরস্থ জ্ঞানের একটি অংশ আছে। একথা শুনে তিনি বিশেষভাবে একটি ভাষণ দেন। তিনি বলেন : "আল্লাহর কসম! এই গ্রন্থ ছাড়া অর্থাৎ কুরআন ছাড়া উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আর কোন জ্ঞান পাইনি।"

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল অনেকে তাঁকে মাহদী বলে সালাম করতো। বলতো : সালামুন 'আলাইকা ইয়া মাহদী! জবাবে তিনি বলতেন, এই অর্থে আমি অবশ্যই মাহদী যে, আমি মানুষকে ভালো ও কল্যাণের পথ দেখাই। কিন্তু আমার নাম আল্লাহর নবীর নামে এবং আমার কুনিয়াত বা উপনাম নবীর কুনিয়াতের উপরে। এ কারণে তোমরা যখন সালাম করবে তখন মাহদীর পরিবর্তে বলবে : আস-সালামু 'আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ, অথবা আস-সালামু 'আলাইকা ইয়া আবাল কাসিম।

সাধারণ মানুষ কুরাইশ বংশের দু'টি শাখা-বানূ হাশিম ও বানূ উমাইয়্যার মর্যাদা পূজা-উপাসনার সীমা পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। একটির ভিত্তি ছিল পার্থিব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এবং অন্যটির ছিল দীনী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা এটাকে খুবই অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন :

أهل بيتين من العرب يتخذهما الناس أندادا مـن دون الله، نحـن وبنـو عمنـا هـؤلاء يعني بني أمية.

"আমাদের কুরাইশ গোত্রের দু'টি শাখা– আমরা আহলি বায়ত ও বানূ উমাইয়্যাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেলা হয়েছে।"

কোন কোন উপদল 'আলীকে (রা) আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দেয়। কিন্তু ইবন আল-হানাফিয়্যা তাঁকে একজন আল্লাহর বান্দা হিসেবেই দেখতেন। তিনি বলতেন :

ما أشهد على أحد بالنجاة ولاأنه مـن أهـل الجنـة بعـد رسـول الله صلـى الله عليـه وسلم، ولا على أبي ولدني. قال فنظر القوم إليه، قال : مـن كـان فـي النـاس مثـل على سبق له كذا سبق له كذا؟

"আমি রাসূলুল্লাহর (সা) পরে কোন মানুষের নাজাত ও তার জান্নাতী হওয়ার নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারিনে। এমনকি আমার পিতা 'আলী (রা) সম্পর্কেও, যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, নিশ্চিতভাবে বলতে পারিনে তিনি জান্নাতী।"[৪৭]

মুখতার আছ-ছাকাফীর পৃষ্ঠপোষকতার কারণ

একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার 'আকীদা বিশুদ্ধ ইসলামী 'আকীদার পরিপন্থী ছিল না। মুখতার আছ-ছাকাফীর প্রতারণার ফাঁদে আটকে যাওয়া বাহ্যত অগ্রহণযোগ্য মনে হয়। কিন্তু এটা ছিল মানব স্বভাবের দাবী। হযরত মু'আবিয়া (রা) আজীবন আহলি বায়তের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরে ইয়াযীদ থেকে নিয়ে 'আবদুল মালিকের সময় পর্যন্ত এই পরিবারের মহান ব্যক্তিবর্গের সাথে উমাইয়্যা খলীফাগণ যে আচরণ করেছেন তা খুবই নিষ্ঠুর ও অবমাননাকর। ইমাম হুসাইন (রা) ও নবী পরিবারের সকল সদস্যকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়, যা গোটা উমাইয়া শাসনের উপর এমন কলঙ্ক লেপন করেছে যা মোটেই উঠার নয়। এ অবস্থায় কেবল মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা নন, বরং বানূ হাশিমের সকল সদস্যের অন্তর উমাইয়্যাদের উপর ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। এছাড়া 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) ভীতি তাদের মাথার উপর চেপে বসেছিল। এমতাবস্থায় মুখতার ইমাম হুসাইনের রক্তের বদলা নেওয়ার দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ান এবং হুসাইনের (রা) হত্যাকারীদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে হত্যা করেন। তিনি বানূ উমাইয়্যা ও 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) মুকাবিলা করার জন্য মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করেন। এরূপ অবস্থায় যদি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মানব স্বভাব অনুযায়ী অথবা অন্য কোন কল্যাণ চিন্তায় তাঁর দ্বারা প্রভাবিত

---

৪৭. আত-তাবাকাত-৫/৯৪; তাবি'ঈন-৪২৮

হয়ে থাকেন তাতে তেমন দোষের কিছু আছে বলে মনে হয় না। তারপরেও তিনি মুখতারকে কখনো বিশ্বাস করেননি। তাঁকে কার্যসিদ্ধির একটি হাতিয়ারের বেশি কিছু ভাবেননি। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় এসেছে যে, যখন মুখতার মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট ইরাক যাওয়ার অনুমতি চান তখন তিনি অনুমতি দেন। তবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস না থাকায় 'আবদুল্লাহ ইবন কামিল হামাদানীকে তাঁর সাথে দিয়ে দেন। তাকে একথাও বলে দেন যে, মুখতার তেমন আস্থাভাজন ব্যক্তি নয়। অতএব তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। অথবা যখন 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) পক্ষ থেকে তাঁর ভাই 'উরওয়া আসেন মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট বার্তা নিয়ে তখন তিনি 'উরওয়াকে বলেন, আমি না মুখতারকে আমার প্রচারক হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, না সাহায্যকারী হিসেবে, অথবা যখন মুখতারের কথা ও বক্তৃতা-ভাষণে কিছু ইরাকীর সন্দেহ হয় এবং তারা তাঁর কথার সত্যতা যাঁচাইয়ের জন্য মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট যায় তখন তিনি তাদেরকে বলেন : এটা আমরা পছন্দ করি যে, আল্লাহ তার যে বান্দা দ্বারা চেয়েছেন, আমাদের সাহায্য করেছেন। তবে তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের থেকে সতর্ক থাকবে এবং তাদের থেকে নিজেদের জীবন ও নিজেদের দীনের হিফাযাত করবে।[৪৮]

তবে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার মধ্যে গোত্রীয় টান ও খিলাফাত লাভের সহজাত প্রবণতা অবশ্যই ছিল। আর এই প্রবণতাকে উসকে দেওয়ার পিছনে কাজ করে বানূ উমাইয়্যাদের লাগামহীন আচরণ ও স্বৈরাচারী কর্মপদ্ধতি। 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) ও 'আবদুল মালিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার উপর 'আবদুল্লাহর (রা) বাড়াবাড়িমূলক শক্তি প্রয়োগ এই প্রবণতাকে আরো শক্ত ও চাঙ্গা করে দেয়। কিন্তু তার জন্য বাস্তবে তিনি কোন চেষ্টা করেননি। বরং সব সময় একথাই বলতে থাকেন যে, আমি খিলাফাত অবশ্যই চাই। তবে তা এ অবস্থায় যে, তাতে একজন মুসলমানও ভিন্নমত পোষণ করবে না। উমাইয়্যাদের বিপরীতে তাঁর এ অবস্থান কোনভাবেই অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বলা যাবে না।

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার অনুসারী একটি দল

যদিও মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা শী'আ সম্প্রদায়ের "ইছনা 'আশরিয়া" উপ-দলের ইমাম নন এবং তাঁদের সকল ইমাম নবী দুহিতা হযরত ফাতিমার (রা) বংশধর, তথাপি শী'আদের একটি উপ-দল হযরত হুসাইনের (রা) পরে তাঁকেই ইমাম বলে মানে। এই দলটির নাম "কায়সানিয়া"। তারা বিশ্বাস করে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মৃত্যু বরণ করেননি, বরং তিনি তাঁর চল্লিশজন ভক্ত-অনুসারীসহ মদীনা থেকে সাত দিনের দূরত্বে "রিদাবী" পাহাড়ে গমন করেন এবং এখনো সেখানে বিদ্যমান আছেন। একটি বাঘ ও একটি চিতা তাঁদেরকে পাহারা দিচ্ছে এবং তাঁদের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য একটি মধু ও

---

৪৮. প্রাগুক্ত-৫/৯৯, ১০৬

একটি পানির ঝর্ণা প্রবাহমান আছে। এই নির্জন স্থানে আল্লাহ তাঁদের খাদ্য সরবরাহ করেন। একদিন তিনি এ পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং আদল-ইনসাফে পূর্ণ করে দেবেন। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার পরে তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[৪৯]

এই "কায়সানিয়্যা" সম্প্রদায়ের জন্ম কূফায় মুখতার আছ-ছাকাফীর পৃষ্ঠপোষকতায়। তাদের বিশ্বাসের মূল কথা হলো, পিতা 'আলীর (রা) পরে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা হলেন ইমাম। তাদের বিশ্বাস মতে তাদের ইমামগণ আল্লাহর জ্ঞানের অধিকারী হন, তাই ইবন আল-হানাফিয়্যাও এ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দু'ভাই আল-হাসান ও আল-হুসাইন (রা) তাঁকে গূঢ় রহস্যের জ্ঞান দেন এবং ব্যাখ্যা ও বাতিনী জ্ঞানও দান করেন।[৫০] তাদের একটি শাখা বিশ্বাস করে যে, 'আলী, আল-হাসান ও আল-হুসাইন (রা) ও ইবন আল-হানাফিয়্যা (রহ) সকলে নবী। তারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে। সুতরাং ইবন আল-হানাফিয়্যা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। তবে তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে যে, তিনি পিতা 'আলীর (রা) মৃত্যুর পর সরাসরি উত্তরাধিকার সূত্রে ইমাম হন, না তাঁর দু'ভাই আল-হাসান ও আল-হুসাইনের (রা) মাধ্যমে হন? আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন মূসা আন-নাওবাখতী (২৩২/৮১৭) বলেন :[৫১]

وفرق قالت بإمامة محمد بن الحنفية، لأنه كان صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويه، وداعى (المختار) أن محمد بن الحنفية أمره بذلك وأنه الإمام بعد أبيه، وكان يقول إن محمد بن الحنفية وصى على بن أبى طالب، وأنه الإمام المختار قيمه وعامله.

"কয়েকটি উপদল মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার ইমামতের কথা বলে। কারণ বসরার যুদ্ধের দিন (উটের যুদ্ধ) তাঁর দু'ভাই নন, তিনিই তাঁর পিতার ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন। আল-মুখতার দাবী করেন, তিনি যে তাঁর পিতার পরে ইমাম, সে কথা বলতে তিনি তাকে আদেশ করেছেন। আল-মুখতার একথাও বলতেন যে, মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা 'আলী (রা) ইবন আবী তালিবের অছি, তাঁর নির্বাচিত ইমাম, দায়িত্বশীল ও শাসক।"

আশ-শাহ্‌রাস্তানী বলেন, প্রাচীন পারস্যের অগ্নি উপাসক, ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্যবাদ, প্রাচীন কালের দার্শনিক ও মূর্তি পূজকদের চিন্তা দর্শনের উপর ভিত্তি করে কায়সানিয়্যারা তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে।[৫২]

---

৪৯. ওয়াফাইয়াত আল-আ'য়ান-১/৪৫; ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখ আল-ইসলাম-১/৪০৫

৫০. আশ-শাহ্‌রাস্তানী, কিতাব আল-মিলাল ওয়া আন-নিহাল-২/১৯৬-১৯৮

৫১. কিতাবু ফিরাক আশ-শী'আ-২০-২১

৫২. আল-মিলাল ওয়া আন-নিহাল-২০২

জ্ঞান ও বিজ্ঞতা

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা ছিলেন হযরত 'আলীর (রা) মত জ্ঞানের সাগরতুল্য পিতার সন্তান। এ কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে জ্ঞানের ঐশ্বর্য লাভ করেন। ইবন সা'দ লিখেছেন :[৫৩]

"তিনি একজন বড় জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।" ইবন হিব্বান তাঁকে তাঁর বংশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৫৪]

কিন্তু তাঁর জ্ঞানের বিস্তারিত বিবরণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তিনি বলতেন :[৫৫]

الحسن والحسين أفضل منى وأنا أعلم منهما.

"হাসান ও হুসাইন আমার চেয়ে উত্তম। তবে আমি তাঁদের চেয়ে বেশি জানি।"

হাদীস

হাদীসের জ্ঞান তিনি লাভ করেন তাঁর সম্মানিত পিতা 'আলীর (রা) নিকট থেকে। তাছাড়া আর যাঁদের নিকট থেকে এ জ্ঞান অর্জন করেন তাঁরা হলেন : 'উসমান ইবন 'আফফান, 'আম্মার ইবন ইয়াসির, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, আবূ হুরাইরা ও 'আবদুল্লাহ ইবন আল-'আব্বাস (রা)। অনেক মুহাদ্দিছের মতে তাঁর সূত্রে বর্ণিত হযরত 'আলীর (রা) হাদীছগুলির সনদই সর্বাধিক শক্তিশালী।[৫৬]

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত। তাঁর চার পুত্র : ইবরাহীম, হাসান, 'আবদুল্লাহ ও 'আওন; ভাতিজা মুহাম্মাদ ইবন 'উমার ইবন 'আলী (রা), ভাইয়ের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন হাসান (রা), ভাগিনা 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আকীল এবং অন্যদের মধ্যে 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, মিনহাল ইবন 'আমর, মুহাম্মাদ ইবন কায়স ইবন মাখরামা, মুনযির ইবন ইয়া'লা, মুহাম্মাদ ইবন বাশীর হামাদানী, সালিম ইবন আবী আল-জা'দ ও 'আমর ইবন দীনার তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে উদারভাবে গ্রহণ করেন।[৫৭]

মূল্যবান উক্তি

তাঁর কিছু মূল্যবান উক্তি সূক্ষ্ম ভাব সমৃদ্ধ ও শিক্ষাপ্রদ। তিনি বলতেন : "যার অন্তর তার নিজের দৃষ্টিতে সম্মানিত তার দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন মূল্যই থাকে না। যে ব্যক্তি তার জীবন যাপনে সঙ্গীদের সাথে মানিয়ে চলতে পারে না সে বুদ্ধিমান নয়। আল্লাহ জান্নাতকে তোমাদের প্রাণের বিনিময়ে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং অন্য কোন

---

৫৩. আত-তাবাকাত-৫/৯৪
৫৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩১৬
৫৫. আল-আ'লাম-৬/২৭০
৫৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩১৫
৫৭. প্রাগুক্ত; ড. হাসান ইবরাহীম হাসান-১/২৫৩

কিছুর বিনিময়ে তা বিক্রি করো না। যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না তা ব্যর্থ হয়ে যায়।"[৫৮]

'ইবাদাত-বন্দেগী

তিনি যেমন একজন বড় মাপের 'আলিম ছিলেন তেমনি ছিলেন একজন বড় 'আবিদ ব্যক্তি। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি ছিলেন একেবারেই উদাসীন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন, তিনি 'ইলম ও ইবাদাত দুটিতেই ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষ।[৫৯]

মায়ের খিদমত

তিনি মায়ের খিদমতে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। নিজ হাতে তাঁর চুলে খিজাব লাগাতেন, চিরুনী করতেন ও খোপা বাঁধতেন। একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে মানুষের সামনে এলে দেখা গেল তাঁর হাতে মেহেদীর ছাপ। একজনের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, আমি মায়ের চুলে খিজাব লাগাচ্ছিলাম।[৬০]

দৈহিক শক্তি ও সাহস

আসাদুল্লাহ আল-গালিব 'আলীর (রা) যথার্থ উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। 'ইলমের সাথে শক্তি ও সাহসও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। এত শক্তিশালী ছিলেন যে, লৌহ বর্ম দু'হাতে ধরে ফেঁড়ে ফেলতেন। হযরত 'আলীর (রা) একটি বর্ম একটু লম্বা ছিল। একদিন তিনি বর্মটি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার হাতে দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, এই বেশি অংশটুকু কম করে দাও। তিনি এক হাতে বর্মটি ধরে অন্য হাতে বেশি অংশটুকু ধরে এক টানে দু'টুকরো করে ফেলেন। দৈহিক শক্তিতে 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) ছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ। একথা তাঁর সামনে কেউ উঠালে তিনি রাগে কাঁপতে থাকতেন। আল্লামা যিরিক্লী তাঁর শক্তি ও সাহসের কথা বলেছেন এভাবে :[৬১]

أحد الأبطال الأشداء فى صدر الاسلام.

"ইসলামের প্রাথমিক যুগের একজন শক্ত-কঠিন বীর।"

أخبار قوته وشجاعته كثيرة.

"তাঁর শক্তি ও বীরত্বের কাহিনী অনেক।"

একবার রোমান সম্রাট খলীফা হযরত মু'আবিয়াকে (রা) লিখলেন, আমাদের এখানকার রাজা-বাদশারা বিভিন্ন জিনিস আদান-প্রদান করেন এবং প্রত্যেকে তার নিজ নিজ দেশের অভিনব ও বিস্ময়কর জিনিস পাঠিয়ে অন্যকে অভিভূত ও বিস্মিত করে থাকেন এবং

---

৫৮. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়া-১৩২

৫৯. শাযারাত আয-যাহাব-১/৮৯

৬০. আত-তাবাকাত-৫/৮৮

৬১. আল-আ'লাম-৬/২৭০

গৌরব বোধও করেন। আপনার অনুমতি পেলে আমরাও তেমন আদান-প্রদান করতে পারি। হযরত মু'আবিয়া (রা) সম্মতি জানিয়ে তাঁকে তেমন কিছু পাঠানোর অনুমতি দেন। রোমান সম্রাট বিস্ময়কর দু'জন পুরুষ মানুষ মু'আবিয়ার (রা) নিকট পাঠান। তাদের একজন ছিল অত্যধিক লম্বা ও অত্যধিক মোটা। যেন জঙ্গলের কোন সুউচ্চ বৃক্ষ অথবা বিশাল আকৃতির কোন অট্টালিকা।

অন্যজন ছিল অত্যধিক শক্তিশালী এবং পাথরের মত শক্ত ও কঠিন। যেন একটা হিংস্র জন্তু। তাদের সাথে পাঠানো একটি পত্রে তিনি বলেন, আপনার সাম্রাজ্যে লম্বায় ও শক্তিতে এ দু'ব্যক্তির সমকক্ষ কেউ আছে কি? মু'আবিয়া (রা) 'আমর ইবন আল-'আসকে (রা) বললেন : লম্বায় তার মত একজনকে পেয়েছি, বরং তার চেয়ে একটু বেশি লম্বা হবে। আর সে হলো কায়স ইবন সা'দ ইবন 'উবাদা। তবে শক্তিমান ব্যক্তিটির ব্যাপারে আমি আপনার মতামত কামনা করছি।

'আমর বললেন : এই ব্যাপারটির জন্য দু'জন উপযুক্ত মানুষ আছেন। তবে দু'জনই এখন আপনার থেকে দূরে আছেন। তাঁরা হলেন 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর ও মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা (রা)।

মু'আবিয়া (রা) বললেন : মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা দূরে নয়, কাছেই আছেন।

'আমর বললেন : আপনি কি মনে করেন তাঁর মত মর্যাদাবান ব্যক্তি এভাবে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে একজন রোমানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজী হবেন? মু'আবিয়া (রা) বললেন : তিনি যদি দেখেন এতে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে তাহলে শুধু এতটুকু নয়, বরং এর চেয়ে বেশি করবেন।

হযরত মু'আবিয়া (রা) কায়স ইবন সা'দ ও মুহাম্মাদ উভয়কে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা উপস্থিত হলেন। বৈঠক বসলো। এক পর্যায়ে কায়স ইবন সা'দ তাঁর একটি পায়জামা বিরাট বপুধারী রোমান পালোয়ানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সেটি তাকে পরতে বলেন। রোমান পালোয়ান সেটি পরলে তার বুকের উপরি ভাগ পর্যন্ত পৌঁছে। এ অবস্থা দেখে উপস্থিত লোকেরা হাসিতে ফেটে পড়ে।

অন্যদিকে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা দোভাষীকে বললেন : আপনি রোমান পালোয়ানকে বলুন, সে ইচ্ছা করলে বসে থেকে আমার দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিক এবং আমি দাঁড়িয়ে তাকে উঠানোর চেষ্টা করি। হয় আমি তাকে টেনে তুলবো, অথবা সে আমাকে টেনে বসিয়ে দেবে। অথবা এর বিপরীতটাও হতে পারে অর্থাৎ আমি বসে থাকবো, আর সে দাঁড়িয়ে আমাকে উঠানোর চেষ্টা করবে। রোমান পালোয়ান বসে থাকতে চাইলো। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা একটানে তাকে দাঁড়িয়ে দিলেন। রোমান ব্যক্তি মুহাম্মাদকে বসাতে ব্যর্থ হলো। এতে তার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলো। সে এবার দাঁড়িয়ে মুহাম্মাদকে বসা অবস্থা থেকে উঠাতে চাইলো। মুহাম্মাদ বসলেন এবং রোমান লোকটির হাত ধরে এমন জোরে টান দিলেন যে, মনে হলো তার হাতটি কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তিনি তাকে মাটিতে বসিয়ে দিলেন।[৬২]

---

৬২. ওয়াফায়াত আল-আ'য়ান-১/৪৪৯; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-২৭৪

এভাবে বিশাল দেহের অধিকারী-পালোয়ানদ্বয় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে গেল।

অবয়ব-আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ

তিনি মধ্যমাকৃতির ছিলেন। শেষ বয়সে মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। চুলে মেহেদীর খিজাব লাগাতেন। "খুয" নামক এক প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করতেন। মাথায় কালো পাগড়ী ধারণ করতেন এবং হাতে আংটি পরতেন। আবূ ইদরীস একদিন তাঁকে খিজাব লাগানো অবস্থায় দেখে প্রশ্ন করেন : আপনার পিতা 'আলী (রা) কি খিজাব লাগাতেন? বললেন : না। তবে আমি এটা করি স্ত্রীদের নিকট নিজেকে যুবক হিসেবে প্রকাশ করার জন্য।[৬৩]

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

তিনি একাধিক বিয়ে করেন। সেই স্ত্রী ও দাসীদের গর্ভে জন্ম নেয়া বহু সন্তানের জনক তিনি। সন্তানদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ : ১. আবূ হাশিম, ২. 'আবদুল্লাহ, ৩. হামযা, ৪. 'আলী, ৫. জা'ফার আল-আকবর– এ পাঁচজন একজন দাসীর গর্ভের সন্তান। ৬. হাসান- কায়স ইবন মাখরামা ইবন আল-মুত্তালিবের কন্যা জামাল-এর গর্ভজাত। ৭. ইবরাহীম– মুসরি'আ ইবন 'আব্বাদ ইবন শায়বান-এর গর্ভজাত। ৮. কাসিম, ৯. 'আবদুর রহমান- এ দু'জন বাররা বিনত 'আবদির রহমান ইবন হারিছ আল-মুত্তালিবীর গর্ভজাত। ১০. জা'ফার আল-আসগার, ১১. 'আওন, ১২. 'আবদুল্লাহ আল-আসগার– এ তিনজন হযরত জা'ফার ইবন আবী তালিবের পৌত্রী উম্মু কুলছুমের গর্ভজাত এবং ১৩. 'আবদুল্লাহ ও ১৪. রুকাইয়া– এ দু'জন একজন দাসীর গর্ভের সন্তান।[৬৪]

ইবন সা'দ তাঁর সন্তানদের পরিচয় দান করতে গিয়ে বলেন :[৬৫]

والحسن بن محمد، وكان من ظرفاء بنى هاشم وأهل العقل منهم وهو أول من تكلم في الإرجاء.

"মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার ছেলে আল-হাসান ছিলেন বানূ হাশিমের সুরসিক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। তিনি 'ইরজা' মতবাদের প্রথম প্রবক্তা।"

---

৬৩. আত-তাবাকাত-৫/১১৪

৬৪. ওয়াফায়াত আল-আ'য়ান-১/৪৫৩

৬৫. আত-তাবাকাত-৫/৯২

যাইনুল ‘আবিদীন ‘আলী ইবন হুসাইন (রা)

হযরত ‘আলী ইবন হুসাইনের (রা) ‘কুনিয়াত’ বা ডাকনাম আবুল হাসান এবং ‘লকব’ বা উপাধি যাইনুল ‘আবিদীন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) অত্যন্ত আদরের দৌহিত্র হযরত হুসাইনের (রা) কনিষ্ঠ পুত্র এই ‘আলী। কারবালায় নবুওয়াতী উদ্যান তছনছ হওয়ার পর এই একটি মাত্র ফুল অবশিষ্ট ছিল যার মাধ্যমে দুনিয়াতে সাইয়্যিদ বংশের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে এবং হযরত হুসাইনের (রা) নাম বিদ্যমান থাকে। তাঁর পিতৃকুলের শাজারা-ই-নসব (বংশধারা) সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল এবং চন্দ্রের চেয়েও দীপ্তিমান। তবে মাতৃকুলের শাজারা-ই-নসবের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ মত পার্থক্য আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে তিনি ছিলেন পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াযদাগুরদের দৌহিত্র।

বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ‘উমারের (রা) খিলাফতকালে ইয়াযদাগুরদের পরাজয় হয় তখন আরো যুদ্ধ বন্দীদের সাথে তাঁর তিন মেয়েও বন্দী হয়। হযরত ‘উমার (রা) অন্যান্য বন্দীদের মতো তাদেরকেও বিক্রির নির্দেশ দেন। কিন্তু হযরত ‘আলী (রা) খলীফার সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, এই তিন শাহযাদীর সাথে অন্য সাধারণ মানুষের কন্যাদের সাথে যে আচরণ করা হয়, তেমন করা সঙ্গত হবে না। তিনি প্রস্তাব দেন তাদের মূল্য নির্ধারণ করা হোক এবং সেই মূল্যে যে কিনতে চায়, কিনে নিবে। সম্ভবতঃ হযরত ‘আলী (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) একটি হাদীছের ভিত্তিতে এমন কথা বলেন। হাদীছটি এই ঃ إِرْحَمُوْا عَزِيزَ قَوْمٍ ذَلَّ - “কোন কাওম বা জাতির সম্মানিত ব্যক্তি হেয় ও অপমানিত হলে তোমরা তার প্রতি দয়া দেখাবে।” ‘উমার (রা) ‘আলীর (রা) প্রস্তাবে রাজী হন। তিন শাহযাদীর একটা দাম নির্ধারণ করা হয় এবং তিনজনকেই ‘আলী (রা) নিজে ক্রয় করেন। অতঃপর একজনকে হযরত আবূ বকরের (রা) ছেলে মুহাম্মাদকে, আরেকজনকে হযরত ‘উমারের (রা) ছেলে হযরত ‘আবদুল্লাহকে (রা) এবং তৃতীয়জনকে নিজের ছেলে হযরত হুসাইনকে (রা) দান করেন। এই তিন শাহযাদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন যথাক্রমে হযরত কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, হযরত সালিম ইবন ‘আবদিল্লাহ (রা) ও হযরত ‘আলী ইবন হুসাইন (রা)।

ইবন কুতাইবা (মৃত্যু ২৭৬ হি) যাইনুল ‘আবিদীনের মা'কে সিন্ধুর এবং আল-ইয়া‘কূবী কাবুলের[১] মেয়ে এবং তার নাম সুলাফা অথবা গাযালা বলে উল্লেখ করেছেন।[২] ইবন সা‘দ গাযালা নামটিকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি কোন বংশধারা উল্লেখ করেননি। তবে ইয়াযদাগুরদের শাহী বংশধারার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইবন কুতাইবার বর্ণনাটি বিভিন্ন

---

১. তারীখ আল-ইয়া‘কূবী-২/৩০৩

২. ইবন কুতাইবা, আল মা‘আরিফ-৫৪

দিক দিয়ে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন অনেকে। আল্লামা শিবলী নু'মানী (রহ) বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তাঁর বর্ণনাটি ভিত্তিহীন বলে মত দিয়েছেন। তবে এসব বর্ণনা দ্বারা একথাটি স্পষ্ট হয় যে, তিনি কোন অনারব মহিলা ছিলেন।[৩] আল-ইয়া'কূবী তার মায়ের নাম "হারার" বলেছেন। ইয়াযদাগুরদের যে কন্যাটিকে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দৌহিত্র হযরত হুসাইন ইবন 'আলীর (রা) হাতে সমার্পণ করা হয় তার ফার্সী নাম ছিল "شَاهِ زَنَانْ শাহে যিনানা।" দাসী হিসাবে হযরত হুসাইনের সাথে যুক্ত হওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন নিষ্ঠাবতী মুসলমানে পরিণত হন। পৌত্তলিক জীবনের সকল সম্পর্ক জীবন থেকে মুছে ফেলেন। এমনকি "শাহে যিনানা" (নারীদের রাণী) নামটি পরিত্যাগ করে "غَزَالَة - গাযালা" নাম ধারণ করেন। হযরত হুসাইন (রা) তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন এবং পরবর্তীতে উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এভাবে গাযালা একজন চমৎকার স্বামী লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি এক পুত্র সন্তানের মা হন এবং পিতা-মাতা তাঁদের শিশু সন্তানের নাম রাখেন তার মহান দাদা 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) নামে 'আলী ইবন আল হুসাইন (রা)। সন্তান প্রসবের পর মা "গাযালা" জ্বরে আক্রান্ত হন এবং তাতেই ইনতিকাল করেন। শিশু আলী মায়ের আদর ও স্নেহ-মমতা থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হন। একজন দাসী তাঁকে মাতৃ স্নেহে লালন-পালন করেন। জীবনে তাকেই তিনি মা বলে জানেন।

একটু বুদ্ধি হলে তাঁকে শিক্ষার প্রতি মনোযোগী করে তোলা হয়। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড আগ্রহও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রথম শিক্ষালয়টি ছিল নিজ গৃহ। তেমনি প্রথম ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাঁর মহান পিতা হযরত হুসাইন ইবন 'আলী (রা)। তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষালয়টি ছিল মদীনার পবিত্র মাসজিদে নববী। এই মাসজিদ তখন সব সময় জীবিত সাহাবা ও বড় বড় তাবি'ঈন কিরামের (রহ) পদচারণায় মুখর থাকতো। তাঁরা মাসজিদের এখানে ওখানে হালকা করে সাহাবায়ে কিরামের (রা) সন্তানদেরকে কুরআন শিখাতেন, ইসলামী বিধি-বিধানের তত্ত্বজ্ঞান দান করতেন, তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ, সীরাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী শোনাতেন এবং সেই সাথে আরবী কবিতা ও ভাষা সাহিত্যের জ্ঞানও দান করতেন। সাথে সাথে তাঁরা তাঁদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা, ভয়-ভীতির বীজও রোপন করতেন। এভাবে তাঁরা সত্য-সঠিক পথের অনুসারী বা 'আমল 'আলিমে পরিণত হতেন।

'আলী ইবন হুসাইনের (রা) মন মস্তিষ্কে আল কুরআন বিষয়টি যেভাবে স্থান পায় সেভাবে শিক্ষার অন্য কোন বিষয় স্থান পায়নি। সেই শৈশব থেকে আল কুরআনের ভয়-ভীতি ও আযাবের আয়াত পাঠ করে তার দেহে আবেগ অনুভূতি যেভাবে আন্দোলিত হতো তেমন আর কোন ব্যাপারে হতো না। জান্নাতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত পাঠের সময় এতই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়তেন যে, কল্পনায় যেন জান্নাতে পৌছে যেতেন। আর জাহান্নামের

---

৩. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৩; তাবি'ঈন-২৯৩

বর্ণনা বিধৃত কোন আয়াত শোনার সাথে সাথে তিনি এমনভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তেন যেন তার অভ্যন্তরে জাহান্নামের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।[৪]

জন্ম

হযরত যাইনুল আবিদীন (রহ) হিজরী ৩৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] তাঁর মহান দাদা হযরত আলীর (রা) সময়কালে তিনি নিতান্ত একটি শিশু ছিলেন। এজন্য এ সময়ের কোন ঘটনায় তাঁর উপস্থিতি আশা করা যায় না। একটু বোধ-বুদ্ধির বয়স হলে কারবালার সেই বিষাদময় ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। এই সফরে তিনি তাঁর মহান পিতার সঙ্গে ছিলেন। তখন তাঁর বয়স বিশের কিছু বেশী।[৬] তবে অসুস্থতার কারণে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। হযরত আল হুসাইনের (রা) শাহাদাতের পর শামার যী-আল-জাওশান তাঁকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তার এক সঙ্গীর অন্তরে আল্লাহ দয়া ও করুণার সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন : সুবহানাল্লাহ! এই অসুস্থ নওজোয়ান যে যুদ্ধেও কোন রকম ভূমিকা রাখেনি, তাকে আমরা হত্যা করতে পারি না। এর মধ্যে আমর ইবন সা'দ এসে পৌঁছেন। তিনি অসুস্থ ব্যক্তি ও মহিলাদের সাথে কোন রকম অসদাচরণ করা থেকে শামবাসীদেরকে বিরত রাখেন।[৭]

কারারুদ্ধ

কারবালায় ইয়াযীদ বাহিনীর এক শামী সৈনিক যে আহ্‌লি বাইত তথা নবী পরিবারের প্রতি ছিল শ্রদ্ধাশীল, সে যাইনুল আবিদীনকে গোপন করে ফেলে। সে ভীষণ আন্তরিকতার সাথে তাঁর সেবা করতো। লোকটি তাঁকে এতো পরিমাণ ভালোবাসতো যে, যখনই বাইরে যেত, কাঁদতে কাঁদতে যেত, আর ফেরার সময় কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসতো। লোকটির এমন অদ্ভুত আচরণ নিয়ে শামী সৈনিকদের মধ্যে সাধারণ শামবাসীদের মধ্যে নবী পরিবারের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ যাইনুল আবিদীনকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তিন শো দীনার পুরস্কার ঘোষণা করে। এই তিন শো দীনারের লোভে লোকটি যাইনুল আবিদীনকে বেঁধে ইবন যিয়াদের লোকদের হাতে তুলে দেয়।[৮]

উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের সংগে আলোচনা

গ্রেফতার হওয়ার পর হযরত আল হুসাইনের (রা) সঙ্গী অন্য বন্দীদের সাথে তাঁকেও ইবন যিয়াদের সামনে হাজির করা হয়। তারপর দুইজনের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন হয় :

৪. সুওয়ারুম মিন হায়াতিত তাবিঈন-৩৩৯-৩৪১

৫. ওয়াফইয়াতুল আ'য়ান-১/৩২১

৬. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৭৫

৭. তাবাকাত-৫/১৫৭

৮. প্রাগুক্ত

ইবন যিয়াদ : তোমার নাম কি?

যাইনুল 'আবিদীন : 'আলী

'আলী নামটি শুনে ইবন যিয়াদ বললো : আল্লাহ কি 'আলীকে হত্যা করেনি? তিনি চুপ থাকলেন, ইবন যিয়াদ একটু ধমকের সুরে বললো : আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছো না কেন?

– আমার আরেকটি ভাইয়ের নাম 'আলী ছিল। মানুষ তাকে হত্যা করেছে।

ইবন যিয়াদ : মানুষ নয়, বরং আল্লাহ তাকে হত্যা করেছে।

ইমাম যাইনুল 'আবিদীন চুপ থাকলেন। ইবন যিয়াদ একই কথা আবারো বললো। এবার যাইনুল 'আবিদীন নিম্নের আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করেন :

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا.

"আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু হয়নি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়।"

"আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু তার মেয়াদ অবধারিত।"[৯]

এ জবাব শুনে ইবন যিয়াদ বললো, তুমিও ঐসব লোকদের মতো। তারপর সে যাইনুল 'আবিদীনকে হত্যার নির্দেশ দেয়। তখন তিনি ইবন যিয়াদের নিকট জানতে চান, এই মহিলাদেরকে দেখার দায়িত্ব কে পালন করবে? যাইনুল 'আবিদীনের ফুফু হযরত যায়নাব এমন অন্যায় নির্দেশ শুনে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি যাইনুল 'আবিদীনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ইবন যিয়াদকে লক্ষ্য করে বলেন, যদি তাকে হত্যা করতে চাও তাহলে তার সাথে আমাকেও হত্যা কর। তবে ইমাম যাইনুল 'আবিদীনের উপর ভীতি ও শঙ্কার কোন চিহ্ন দেখা গেলনা। তিনি অত্যন্ত স্থির চিত্তে নির্ভীকভাবে বললেন, আমাকে যদি হত্যা করতেই হয় তাহলে এসব মহিলাদের সঙ্গে কমপক্ষে এমন একজন লোক দাও যে তাঁদেরকে নিরাপত্তার সাথে স্বদেশে পৌঁছে দেবে। তাঁর এমন দৃঢ়তা লক্ষ্য করে ইবন যিয়াদ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। ইতোমধ্যে আল্লাহ ইবন যিয়াদের অন্তরে দয়া ও করুণা সৃষ্টি করেন। অতঃপর সে আহ্লি বাইতের অসহায় নারী-শিশুদের সঙ্গে থাকার জন্য ইমাম যাইনুল 'আবিদীনকে ছেড়ে দেয়।[১০]

শামে উপস্থিতি ও ইয়াযীদের সাথে আলোচনা

ইবন যিয়াদ আহ্লি বাইত (রা) তথা নবী পরিবারের জীবিত সদস্যদেরকে দিমাশকে

---

৯. সূরা আয-যুমার-৪২; সূরা আলে 'ইমরান-১৪৫

১০. তাবাকাত-৫/১৫৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/৭০-৭১

ইয়াযীদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। তাঁদেরকে ইয়াযীদের সামনে হাজির করা হয়। তিনি ইমাম আল হুসাইনের (রা) ছিন্ন মাথা দেখে যাইনুল 'আবিদীনকে বলেন, 'আলী! যা কিছু তুমি দেখছো তা সবই তোমার পিতার কর্মফল। তিনি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, আমার অধিকারের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়েছেন এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে ঝগড়া করেছেন।

জবাবে ইমাম যাইনুল 'আবিদীন (রা) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন :[১১]

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَفِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ.

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করবার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর পক্ষে ইহা খুবই সহজ।"

পাশেই বসা ছিল ইয়াযীদের ছেলে খালিদ। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেন, খালিদ তুমি এর জবাব দাও। কিন্তু সে জবাব দিতে পারলো না। তখন ইয়াযীদ বললেন, তুমি এ আয়াতটি পড় :[১২]

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ.

"তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃত কর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।"

এই বৈঠকে জনৈক শামী ব্যক্তি অভিমত ব্যক্ত করে যে, এসব কয়েদী আমাদের জন্য হালাল। হযরত যাইনুল 'আবিদীন (রহ) বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি যদি মারাও যাও তবুও তোমার জন্য হালাল নয়। যতক্ষণ তুমি আমাদের দীন-ধর্ম থেকে বেরিয়ে না যাও। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় কোন মুসলমান বন্দী নারী কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়। ইয়াযীদ উক্ত শামী ব্যক্তিকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দেন।[১৩]

ইয়াযীদ আহ্লি বাইতের সাথে সাক্ষাতের পর তাঁদেরকে শাহী মহল "সার্‌রা"তে থাকার ব্যবস্থা করেন। এসব সম্মানিত মহিলাগণ তাঁর আত্মীয়া ছিলেন। এ কারণে তিন দিন পর্যন্ত ইয়াযীদের শাহী মহলে শোক ও মাতম বিরাজ করে। যতদিন তাঁরা সেখানে ছিলেন ইয়াযীদ তাঁদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেন। যাইনুল 'আবিদীনকে সংগে নিয়ে একই দস্তরখানে বসে আহার করতেন।[১৪]

মদীনায় প্রত্যাবর্তন এবং ইয়াযীদের অঙ্গীকার

ইয়াযীদের শাহী মহলে কিছুদিন থাকার পর যখন আহ্লি বাইত কিছুটা সুস্থ ও স্বাভাবিক

---

১১. সূরা আল-হাদীদ-২২

১২. সূরা আশ-শূরা-৩০

১৩. তারীখ আত-তাবারী-৭/৩৭৬

১৪. প্রাগুক্ত

হলেন তখন ইয়াযীদ একদিন যাইনুল 'আবিদীনকে বললেন, "তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে এখানে থাকতে চাও, থাকতে পার। আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবো, তোমাদের সকল অধিকার পূরণ করবো। আর ফিরে যেতে চাইলে যেতে পার। আমি তোমাদের সংগে ভালো আচরণ করতে থাকবো।" যাইনুল 'আবিদীন (রহ) ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।[১৫]

তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী ইয়াযীদ তাঁদেরকে সরকারী সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে নিরাপদে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। বিদায় বেলা তিনি যাইনুল 'আবিদীনকে বলেন : "ইবন মারজানার উপর আল্লাহর অভিশাপ! আমি যদি উপস্থিত থাকতাম তাহলে আল হুসাইন (রা) যে দাবী করতেন, মেনে নিতাম। এভাবে তাঁর প্রাণ হরণ করতাম না। তাতে আমার নিজের ও আমার সন্তানদের জীবন চলে গেলেও পরোয়া করতাম না। যাই হোক, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হয়েছে। আগামীতে যখনই তোমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন হবে সংগে সংগে আমাকে লিখে জানাবে।"[১৬]

মদীনায় অবস্থান এবং নির্জনতা অবলম্বন

আপনজনদের শাহাদাত বরণ, বাড়ী-ঘরের বিধ্বস্ত অবস্থা এবং নিজের অসহায়ত্ব যাইনুল 'আবিদীনের অন্তরকে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় যে, মদীনায় ফেরার পর তিনি একেবারেই নির্জনতা অবলম্বন করেন এবং পরবর্তী কোন ধরনের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। যে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলামূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। ইয়াযীদও সব সময় তাঁর প্রয়োজন ও সুখ-সুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) বিদ্রোহ এবং যাইনুল 'আবিদীনের সম্পর্কহীনতা

হযরত ইমাম আল হুসাইনের (রা) শাহাদাত বরণের পর হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হিজাযের অধিবাসীরা তাঁর আনুগত্যের বাই'আত করে। মক্কা ও মদীনাবাসীরা এই দুই স্থান থেকে উমাইয়াদের নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের তাড়িয়ে দেয়। ইয়াযীদ হারামাইনের অধিবাসীদেরকে সতর্ককরণের জন্য মুসলিম ইবন 'উকবার নেতৃত্বে একদল দুঃসাহসী সৈন্য পাঠান। যাইনুল 'আবিদীনকে (রহ) কোন রকম বিরক্ত না করার জন্য বাহিনীর অধিনায়ককে তিনি সতর্ক করে দেন। মদীনাবাসীরা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। মদীনায় অসংখ্য মানুষ মারা যায়, ইয়াযীদের বাহিনী কয়েকদিন ধরে মদীনায় লুটতরাজ চালায়। এই যুদ্ধে যাইনুল 'আবিদীন (রহ) ও তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা কোন রকম অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা মদীনা ছেড়ে 'আকীকে চলে যান। মদীনাতুর রাসূলকে বিরাণভূমিতে পরিণত করে

---

১৫. তাবাকাত-৫/১৫৭
১৬. আত-তাবারী-৭/৩৭৯

মুসলিম ইবন উকবা 'আকীকে যাত্রাবিরতি নিয়ে অবস্থানকালে যাইনুল 'আবিদীন (রহ) সেখানেই আছেন। যাইনুল 'আবিদীন মুসলিমের উপস্থিতির খবর পেয়ে নিজেই তার সাথে সাক্ষাতের জন্য যান। সঙ্গে নিয়ে যান চাচাতো ভাই আবু হাশিম 'আবদুল্লাহ ও হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাকে। মুসলিম অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে তাঁর সাথে মিলিত হয়। তাঁকে নিজের পাশে বসিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করার পর বলে, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে আপনার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।" জবাবে যাইনুল 'আবিদীন (রহ) বলেন, "আল্লাহ তাঁকে ভালো প্রতিদান দিন।" মুসলিম তাঁর সঙ্গের ছেলে দুইটির পরিচয় জিজ্ঞেস করে। যাইনুল 'আবিদীন (রহ) বলেন, "তাঁরা আমার চাচাতো ভাই।" তাদের সাথে মিলিত হতে পেরে মুসলিম সন্তোষ প্রকাশ করে। এই আনন্দদায়ক সাক্ষাৎকারের পর যাইনুল 'আবিদীন (রহ) ফিরে যান।

মুখতার আছ-ছাকাফীর বিদ্রোহ এবং যাইনুল 'আবিদীনের সম্পর্কহীনতা

এ সময় উচ্চাভিলাষী ও পাপাচারী মুখতার আছ-ছাকাফী রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে আহ্‌লি বাইতের প্রতি ভালোবাসার নামে হযরত আলী ইবনুল হুসাইন (রা)-এর পক্ষে বাই'আত নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। হাজার হাজার মানুষ তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। সে তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যাইনুল 'আবিদীনের নিকট মোটা অংকের সম্মানী পাঠিয়ে বলে, "আপনি আমাদের ইমাম। আমাদের নিকট থেকে বাই'আত গ্রহণ করুন।" কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য যাইনুল 'আবিদীনের জানা ছিল। এ কারণে তিনি তার এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সোজা মাসজিদে নববীতে গিয়ে এই মুখতারের বিকৃতি, পাপাচার ও নাস্তিকতার রাজ-রহস্য ফাঁস করে দেন। তিনি জনগণকে লক্ষ্য করে বলেন : সে শুধু মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য আহ্‌লি বাইতকে ঢাল হিসেবে নিয়েছে। [illegible] তাঁর কাছ থেকে হতাশ হয়ে মুখতার এবার মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যার নিকট ধর্ণা দেয়। তিনি তার ধোঁকার জালে আটকা পড়েন। যাইনুল 'আবিদীন তাঁকে সতর্ক করে বলেন, "আহ্‌লি বাইতের প্রতি ভালোবাসা– এ তার মুখের কথা, অন্তরের কথা নয়। আহ্‌লি বাইতকে যাঁরা ভালোবাসেন তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এ তার মিথ্যা শ্লোগান। আসলে আহ্‌লি বাইতের ভালোবাসার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই; বরং সে আহ্‌লি বাইতের একজন দুশমন। তাই আমার মতো আপনারও উচিত হবে তার রহস্য ফাঁস করে দেওয়া।" মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যা বিষয়টি নিয়ে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) সংগে আলোচনা করলেন। যেহেতু কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনায় মুসলিম বিশ্বের সকল আহ্‌লি বাইত-প্রেমিক, বিশেষতঃ বানু হাশিমের অন্তর থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল, তাই ইবনুল 'আব্বাস (রা) মুখতারের সহযোগী হলেন এবং ইবন হানাফিয়্যাকে যাইনুল 'আবিদীনের কথা মানতে নিষেধ করলেন।

---

১৭. ইবন সা'দের তাবাকাতে নামটি মুসরিফ ইবন 'উকরা এসেছে।

১৮. মাসউদী, মুরূজ আয-যাহাব-২/৪৭৯-৪৮০

এরপর যখন উমাইয়্যা ও আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) মাঝে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, ইমাম যাইনুল আবিদীন সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে দূরে থাকেন। মুখতার নিহত হওয়ার পরও তিনি তাকে অভিশাপ দিতেন। আল্লামা যাহাবী বর্ণনা করেছেন, 'আলী ইবনুল হুসাইন কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে মুখতারকে অভিশাপ দিতেন। একজন ব্যক্তি একদিন বললো, 'আপনি এমন একজন ব্যক্তিকে অভিশাপ দিচ্ছেন যে আপনার খান্দানের ভালোবাসায় জীবন দান করেছে।" তিনি বললেন : "সে ছিল মিথ্যাবাদী, আল্লাহ ও রাসূলের (সা) প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো।"[19]

একটি বর্ণনায় জানা যায়, তাঁর এমন নির্জনতা অবলম্বন এবং সবকিছু এড়িয়ে চলা সত্ত্বেও প্রথম দিকে খলীফা আবদুল মালিক তাঁর দিক থেকে খিলাফতের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর আশঙ্কা করতেন। তাই তিনি তাঁকে শামে চলে যেতে বাধ্য করেন। ইমাম যুহ্‌রী (রহ) তাঁর পক্ষ থেকে 'আবদুল মালিকের নিকট সাফাই পেশ করে বলেন, "যাইনুল আবিদীনের ব্যাপারে আপনার ধারণা অমূলক। রাত-দিন তিনি কেবল নিজেকে নিয়ে এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। তিনি কোন ঝগড়া-বিবাদে জড়াবেন না।" যুহ্‌রীর এই সুপারিশের ভিত্তিতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।[20]

সম্ভবতঃ এটা 'আবদুল মালিকের খিলাফতের দায়িত্ব লাভের প্রথম দিকের ঘটনা। পরবর্তীকালে দুইজনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মারওয়ান ও 'আবদুল মালিক উভয়ে তাঁকে খুব সমীহ করতেন। ইমাম যুহ্‌রী বলেন, "যাইনুল আবিদীন তাঁর খান্দানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সদাচারী ও অনুগত ছিলেন। মারওয়ান ও 'আবদুল মালিক উভয়ে আহলি বাইতের মধ্যে তাঁকেই বেশী ভালোবাসতেন।"[21]

মৃত্যু

তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে বেশ মতপার্থক্য আছে। আল্লামা যাহাবী হিজরী ৯৪ সনের রাবি'উল আউয়াল মাসের কথা বলেছেন। আল-ইয়া'কূবী হিজরী ৯৯ মতান্তরে ১০০ সনের কথা উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আটান্ন (৫৮) বছর। মদীনায় ইনতিকাল করেন এবং আল-বাকী' গোরস্তানে চাচা হযরত আল হাসান (রা) ও দাদা হযরত 'আব্বাসের (রা) পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।[22]

মহত্ত্ব ও মর্যাদা

তিনি যে খান্দানের সন্তান ছিলেন সেটি ছিল দীনী ইল্‌ম তথা ধর্মীয় জ্ঞানের উৎসস্থল। তাঁর মহান দাদা ছিলেন ইল্‌ম ও আমল (জ্ঞান ও কর্ম)-এর "মাজমা' আল-বাহরাইন" তথা দুই সাগরের সঙ্গমস্থল। এ কারণে ইল্‌ম ছিল তাঁর ঘরের সম্পদ। কিন্তু পারিপার্শ্বিক

---

১৯. তাবাকাত-৫/১৫৮

২০. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৫

২১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭৫

২২. আল-ইয়া'কূবী, তারীখ-২/৩০৩; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৩২১

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনায় তিনি এমন ভগ্ন হৃদয় এবং দুনিয়ার সকল জিনিসের প্রতি এমন বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েন যে, জ্ঞান চর্চাও যেন ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর জ্ঞানগত যোগ্যতা প্রকাশ হতে পারেনি। তবে জ্ঞানের জগতে তাঁর উঁচু মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। ইমাম যুহ্‌রী (রহ) বলতেন, "মদীনায় আমি তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কাউকে পাইনি।" ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, "প্রতিটি জিনিসে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।[২৩]

হাদীছ

বিখ্যাত হাফিজে হাদীছদের মধ্যে যদিও তাঁকে গণ্য করা হয় না তা সত্ত্বেও হাদীছ হিফ্‌জ তথা স্মৃতিতে ধারণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ইবন সা'দ বলেছেন :[২৪]

كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليًا رفيعًا.

"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত আমানতদার, বহু হাদীছের ধারণকারী, অত্যুচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।"

হাদীছের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন মহান পিতা হযরত আল হুসাইন (রা), চাচা হযরত আল হাসান (রা), দাদা ইবনুল 'আব্বাস (রা), নানী উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা), উম্মু সালামা (রা), সাফিয়্যা (রা), রাসূলুল্লাহর (সা) আযাদকৃত দাস আবূ রাফি' (রা), তাঁর ছেলে 'উবাইদুল্লাহ (রা), হযরত 'আয়িশার (রা) দাস যাকওয়ান (রা), আবূ হুরাইরা (রা), মিসওয়ার ইবন মাখরামা ও সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) নিকট থেকে।[২৫]

হাদীছ শাস্ত্রে বর্ণনার সনদসমূহের মধ্যে একটি সনদকে 'সিলসিলাতুয যাহাব' বা সোনার চেইন বলা হয়। আর সেটা হলো যে সনদের ধারাবাহিকতায় তাঁর মহান দাদা, পিতা ও তিনি আছেন। আবূ বকর ইবন শাইবা বলেন, "যুহরীর ঐ সকল বর্ণনা যা 'আলী ইবনুল হুসাইন (যাইনুল 'আবিদীন), তাঁর মহান পিতা ও দাদার সিলসিলায় বর্ণিত হয়েছে, তাই হলো সর্বাধিক সঠিক ও বিশুদ্ধ সনদ।[২৬]

ছাত্র-শিষ্য

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের পরিধি অনেক ব্যাপক। তাঁর ছেলেদের মধ্যে মুহাম্মাদ, যায়দ, 'আবদুল্লাহ ও 'উমার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সাধারণ রাবীদের মধ্যে আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, তাউস ইবন কায়সান, ইমাম যুহ্‌রী আবুয যানাদ, 'আসিম ইবন 'উমার ইবন কাতাদা, 'আসিম ইবন 'উবায়দিল্লাহ, কা'কা' ইবন হাকীম, যায়দ ইবন আসলাম,

---

২৩. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৪৩

২৪. তাবাকাত-৫/১৬৪

২৫. তাহ্‌যীব আত-তাহযীব-৭/৩০৪; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭৫

২৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/৩০৫

হাকাম ইবন 'উতবা, হাবীব ইবন আবী ছাবিত, আবুল আসওয়াদ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রহমান, মুসলিম আল-বাত্তীন, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, হিশাম ইবন 'উরওয়া, 'আলী ইবন যায়দ ইবন জাদ'আন ও আরো অনেকে।[২৭]

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। ইমাম যুহ্‌রী বলতেন, "আমি 'আলী ইবনুল হুসাইনের (রা) চেয়ে বড় কোন ফকীহ্ দেখিনি।"[২৮] ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর মনীষার বড় সনদ এই যে, মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহ্‌র পরেই ছিল তাঁর স্থান।[২৯]

জ্ঞানগর্ভ কথা

তাঁর বিভিন্ন কথা তাঁর জ্ঞানগর্ভ পূর্ণতার দর্পণ এবং উপদেশ ও নীতিকথার পাঠ হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি বলতেন, "আমার ঐ দাম্ভিক ও অহঙ্কারীদের দেখে বিস্ময় হয় যারা গতকালও ছিল এক ফোঁটা নিকৃষ্ট পানি এবং আগামীকাল হবে মৃত। আর ঐ ব্যক্তিকে দেখে অবাক হই যে আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে। অথচ তাঁরই সৃষ্টি তার সামনে বিদ্যমান। আর সেই ব্যক্তিকে দেখে আমার বিস্ময় লাগে যে কিয়ামতের দিন দ্বিতীয়-বার সৃষ্টির কথা অস্বীকার করে। অথচ প্রথম সৃষ্টি তার সামনে রয়েছে। আর সেই ব্যক্তির জন্য বিস্ময় লাগে যে একটি অস্থায়ী বাসস্থানের জন্য কাজ করে, আর স্থায়ী বাসস্থানকে পরিত্যাগ করে। প্রিয়জনদের হারানোই প্রমাণ করে সে একজন মুসাফির। হে আল্লাহ! আপনি আমার বাহ্যিক অবস্থাকে মানুষের দৃষ্টিতে ভালো দেখিয়ে আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে খারাপ করে দেন– এ ব্যাপারে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! যখন আমি কোন খারাপ কাজ করেছি, আপনি আমার সাথে ভালো আচরণ করেছেন। ভবিষ্যতে আমি যদি এমন করি, আপনিও আমার সাথে তেমনই করবেন। কিছু মানুষ ভয়ে আল্লাহর 'ইবাদাত করে। এ হলো দাসের 'ইবাদাত। আর কিছু মানুষ জান্নাতের লোভে 'ইবাদাত করে। এ হলো ব্যবসায়ীদের 'ইবাদাত। কিছু মানুষ কেবল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য 'ইবাদাত করে। এটাই হলো মুক্ত-স্বাধীন মানুষের 'ইবাদাত।"[৩০]

তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ বলেন, আমার পিতা আমাকে উপদেশ দিতেন যে, "পাঁচ প্রকার মানুষের সাথে কখনো থাকবে না।" আমি প্রশ্ন করলাম, "তারা কারা?" বললেন, "ফাসিকের (পাপাচারী) সাথে। সে তোমাকে এক লোকমা বরং তার চাইতেও কম মূল্যে বিক্রি করে দেবে।" আমি জানতে চাইলাম, "তার চাইতেও কম কি জিনিস হতে পারে?" বললেন, "এক লোকমার আশা করা, কিন্তু তাও পেল না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম :

---

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৫

২৯. আ'লাম আল-মুওক্কি'ঈন-১/২৬

৩০. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৩

"দ্বিতীয় প্রকার কারা?" বললেন, "বখীল। যে জিনিসটির তোমার বেশী প্রয়োজন হবে সে তোমার নিকট থেকে সেটি দূরে সরিয়ে দেবে।" জিজ্ঞেস করলাম, "তৃতীয় প্রকার কারা?" বললেন, "মিথ্যাবাদী। সে মরীচিকার মতো তোমাকে নিকটকে দূর এবং দূরকে নিকটবর্তী করে দেখাবে।" জিজ্ঞেস করলাম, "চতুর্থ কারা?" বললেন, "নির্বোধ। সে তোমার উপকার করতে চাইবে, কিন্তু উল্টো তোমার ক্ষতি করে বসবে।" জিজ্ঞেস করলাম, "পঞ্চম প্রকার কারা?" বললেন, "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। আল্লাহর কিতাবে আমি তাকে তিনটি স্থানে অভিশপ্ত পেয়েছি।"

তিনি আরো বলতেন, "ঐ ব্যক্তি কেমন করে তোমার বন্ধু হতে পারে, যদি তুমি তোমার প্রয়োজনের জন্য তার থলি থেকে কিছু নিতে চাও, আর সে খুশী হয়ে না দেয়?"[৩১]

তিনি বলতেন : কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে– মর্যাদাবান ব্যক্তিগণ ওঠো! কিছু লোক উঠে দাঁড়াবে, তখন তাদেরকে বলা হবে : তোমরা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাও। তখন ফেরেশতারা তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলবে : তোমাদের এমন সম্মান ও মর্যাদা কিসের জন্য? তারা বলবে : দুনিয়াতে যখন কেউ আমাদের সাথে মূর্খের মতো আচরণ করেছে, আমরা তখন তাদের সাথে বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো আচরণ করেছি। যখন আমরা অত্যাচারিত হয়েছি, ধৈর্য ধারণ করেছি। আমাদেরকে কেউ ব্যথা দিলে আমরা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ফেরেশতারা বলবে : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, আমলকারীদের জন্য এ অতি উত্তম প্রতিদান। এরপর ঘোষক ঘোষণা দেবে : ধৈর্যশীলগণ ওঠো! কিছুলোক উঠে দাঁড়াবে। তাদেরকে বলা হবে, বিনা হিসাবে তোমরা জান্নাতে চলে যাও। ফেরেশতারা তাদের সামনে এসে বলবে : তোমাদের ধৈর্যের ধরন কেমন ছিল? তারা বলবে : আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে আমরা ধৈর্য ধরেছি। তেমনিভাবে আমরা ধৈর্য ধরেছি আল্লাহর অবাধ্যতার ব্যাপারে। তারা বলবে : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, আমলকারীদের জন্য এ এক চমৎকার প্রতিদান। এরপর ঘোষক ঘোষণা দেবে : আল্লাহর প্রতিবেশীরা ওঠো! কিছু লোক উঠে দাঁড়াবে। সংখ্যায় এরা হবে সবচেয়ে কম। তাদেরকে বলা হবে : তোমরা কি আল্লাহর প্রতিবেশী হয়েছিলে? তারা বলবে : আল্লাহর ভালোবাসায় আমরা এক সাথে বসতাম, আলোচনা করতাম, দেখা-সাক্ষাৎ করতাম। তারা বলবে : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, এ অতি চমৎকার প্রতিদান!

তিনি আরো বলতেন : যারা দীনের বিনিময়ে দুনিয়াকে চায় তারা কতই না খারাপ সম্প্রদায়! আর সেই সম্প্রদায় অতি নিকৃষ্ট যারা কিছু কাজ করে এবং তার দ্বারা দুনিয়া প্রত্যাশা করে।[৩২]

চারিত্রিক গুণাবলী

তাঁর চরিত্র ছিল একটি আলোকিত প্রদীপের মতো যা থেকে অন্যরা পথ দেখতো। তিনি

---

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. আল-ইয়া'কূবী, তারীখ-২/৩০৩-৩০৪

ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) স্বভাব-আখলাকের প্রতিচ্ছবি। বানূ হাশিম খান্দানে তাঁর চাইতে উত্তম আর কেউ তাঁর সময়ে ছিলেন না।[৩৩]

আল্লাহ্-ভীতি

তাঁর অন্তর সর্বদা আল্লাহ-ভীতিতে পরিপূর্ণ থাকতো। অনেক সময় আল্লাহর ভয়ে অচেতন হয়ে পড়তেন। ইবন 'উয়াইযা বলেন, একবার 'আলী ইবনুল হুসাইন (রা) হজ্জে গেলেন। ইহরাম বেঁধে যখন বাহনের পিঠে উঠে বসলেন তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর সারা দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যায় এবং এমনভাবে কাঁপতে থাকেন যে মুখ থেকে "লাব্বাইক" পর্যন্ত বের হলো না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি "লাব্বাইক" উচ্চারণ করছেন না কেন? বললেন : আমার ভয় হচ্ছে এই ভেবে যে, আমি লাব্বাইক বলবো, আর সেদিক থেকে জবাব আসে "লা লাব্বাক"। অর্থাৎ আমি হাজির বলবো, আর জবাবে তিনি না বলেন, তোমার হাজিরা গ্রহণযোগ্য নয়। লোকেরা বললো "লাব্বাইক বলা তো জরুরী। মানুষের চাপাচাপিতে উচ্চারণ করলেন। কিন্তু যেই না মুখ থেকে "লাব্বাইক" বের হলো, অমনি বেহুঁশ হয়ে বাহনের পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। এমনকি যখন জোরে বাতাস বইতো এবং রাতের অন্ধকার নেমে আসতো তখন আল্লাহর 'আযাবের ভয়ে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতেন।[৩৪]

'ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনা

তাঁর শিরা-উপশিরায় ঐ সকল মহান ব্যক্তির পবিত্র রক্ত বহমান ছিল, অসির নীচেও যাঁদের 'ইবাদাত-বন্দেগী ছুটতে পারেনি। এ কারণে তিনিও ছিলেন একজন দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত 'আবিদ ব্যক্তি। হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) ছিলেন একজন উঁচু স্তরের 'আবিদ ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ ব্যক্তি। তিনি বলতেন : 'আলী ইবনুল হুসাইনের (রা) চাইতে বেশী আল্লাহ-ভীরু মানুষ আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ ছিল 'ইবাদাত। রাত-দিনের বেশীরভাগ সময় তাঁর কাটতো 'ইবাদাতে। বলা হয়েছে রাত-দিনে এক হাজার রাক'আত নামায আদায় করতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। আর এমন 'ইবাদাতের কারণেই তাঁর লকব বা উপাধি হয়ে যায় 'যাইনুল 'আবিদীন' বা 'আবিদ ব্যক্তিদের সৌন্দর্য ও শোভা। সফর অথবা বাড়ীতে অবস্থান কোন অবস্থায় "কিয়ামুল লাইল" বা রাত্রিকালীন নামায বাদ পড়তো না।[৩৫]

'ইবাদাতে ঐকান্তিকতার অবস্থা এমন ছিল যে, নামাযে তাঁর সারা দেহে কম্পন শুরু হয়ে যেত। 'আবদুল্লাহ ইবন সালমান বলেন, যখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন তখন তাঁর দেহে কম্পন শুরু হয়ে যেত। লোকেরা জানতে চাইলো আপনার এমন অবস্থা হয় কেন?

---

৩৩. তাহ্যীবুল আসমা'-১/৩৪৩

৩৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/৩০৬

৩৫. আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৩; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৫ মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৭

বললেন, তোমরা কি জান আমি কোন সত্তার সামনে দাঁড়াই এবং কার সাথে গোপন কথা বলি?[৩৬]

তাঁর এমন আল্লাহ-ভীতি ও 'ইবাদাত-বন্দেগী দেখে মানুষ তাঁকে "যাইনুল 'আবিদীন" ('ইবাদাতকারীদের শোভা ও সৌন্দর্য) উপাধিতে ভূষিত করে। আর সেই উপাধির তলে তাঁর আসল নামটি হারিয়ে যায়। একাগ্রচিত্তে দীর্ঘ সিজদায় নিমগ্ন থাকার কারণে মদীনাবাসীরা তাঁকে "সাজ্জাদ" বলে অভিহিত করতো। পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ মন এবং অন্তঃকরণের জন্য মানুষ তাঁকে "আয-যাকী" অভিধায় ভূষিত করে।[৩৭]

হযরত যাইনুল 'আবিদীন (রহ) বিশ্বাস করতেন, 'ইবাদাতের মগয তথা সারবস্তু হলো দু'আ। তাই প্রায়ই তিনি কা'বার গিলাফ আঁকড়ে ধরে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে দু'আ করতে পসন্দ করতেন। এ অবস্থায় বহুবার একাগ্রচিত্তে নিম্নের কথাগুলো বলতে শোনা গেছে :[৩৮]

رَبِّ لَقَدْ أَذَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ مَاأَذَقْتَنِي وَأَوْلَيْتَنِي مِنْ إِنْعَامِكَ مَاأَوْلَيْتَنِي فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا مِنْ غَيْرِ وَجَلٍ وَاسْأَلُكَ مستأنِسًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، رَبِّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ تَوَسُّلَ من اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ إِلَى رَحْمَتِكَ وَضَعُفَتْ قُوَّتُه عَنْ أَدَاءِ حُقُوْقِكَ.

فَاقْبَلْ مِنِّي دُعَاءَ الْغَرِيْقِ الْغَرِيْبِ الَّذِيْ لَايَجِدُ لِإِنْقَاذِهِ إِلاَّ أَنْتَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِيْنَ.

"প্রভু হে! আপনি আপনার দয়া-অনুগ্রহের স্বাদ যতটুকু গ্রহণ করার তা আমাকে করিয়েছেন এবং যতটুকু দান ও করুণা আমার প্রতি করার তা আপনি করেছেন। সুতরাং নিঃসঙ্ক চিত্তে ও নির্ভীকভাবে আপনাকে ডাকতে এবং আপনার নিকট চাইতে পারছি। প্রভু হে! আপনার দয়া-অনুগ্রহের তীব্র মুখাপেক্ষী এবং আপনার অধিকার পূরণে অক্ষম ব্যক্তির বিনয়ের মতো বিনীতভাবে আপনার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি। আত্মীয়-স্বজন থেকে বহু দূরে পানিতে নিমজ্জমান ব্যক্তি, যাকে উদ্ধার করার একমাত্র আপনি ছাড়া আর কেউ নেই, তার দু'আ কবুল করার মতো আমার দু'আও আপনি কবুল করুন! ইয়া আকরামাল আকরামীন!"

একবার প্রখ্যাত তাবি'ঈ তাউস ইবন কাইসান (রহ) তাঁকে কা'বার ছায়ায় মৃত্যুর মুখোমুখি ব্যক্তির মতো অস্থিরভাবে পায়চারী করতে, অসুস্থ ব্যক্তির মতো কাঁদতে এবং অসহায় আশ্রয় প্রার্থীর মতো প্রার্থনা করতে দেখেন। তিনি অপেক্ষায় থাকেন। তাঁর দু'আ ও কান্না থামলে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন : "হে আল্লাহর রাসূলের (সা) বংশধর! একটু আগের অবস্থায় আমি আপনাকে দেখেছি। অথচ আপনার এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য

---

৩৬. তাবাকাত-৫/১৬০

৩৭. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৩৪২

৩৮. প্রাগুক্ত

আছে যা আপনাকে সকল ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দিবে।" যাইনুল 'আবিদীন (রহ) প্রশ্ন করলেন :

"তাউস, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কি?"

তাউস : প্রথমটি হলো আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) বংশধর। দ্বিতীয়টি হলো, আপনার জন্য আপনার দাদা রাসূলুল্লাহর (সা) সুপারিশ। তৃতীয়টি হলো আল্লাহর রহমত।

যাইনুল 'আবিদীন বললেন : তাউস! আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিম্নের এই বাণীটি শুনার পর থেকে আমি আর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার রক্ত-সম্পর্কের দ্বারা নিরাপত্তাবোধ করি না। আল্লাহ বলেন :[৩৯]

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ.

"যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নিবে না।"

আর আমার দাদার সুপারিশের যে কথা বললেন, সে সম্পর্কে তো আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :[৪০]

وَلاَيَشْفَعُوْنَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ.

"তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।"

আর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের রহমত, সে সম্পর্কে তিনিই বলেছেন :[৪১]

إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।"[৪২]

তার একাগ্রতার অবস্থা এমন ছিল যে, নামায অবস্থায় অন্য কোন কিছুর খবর থাকতো না। একবার যখন সিজদায় ছিলেন তখন পাশেই কোথাও আগুন লাগে। লোকেরা "ইয়া ইবন রাসূলিল্লাহ"– "হে আল্লাহর রাসূলের বংশধর" বলে ডাকতে থাকে, কিন্তু তিনি সিজদা থেকে মাথা তুললেন না। এক পর্যায়ে আগুন নিভে যায়। পরে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : কোন জিনিস আপনাকে আগুনের ব্যাপারে এত উদাসীন করে দিয়েছিল? বললেন : অন্য আগুন। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন।[৪৩]

তিনি ও সুলাইমান ইবন ইয়াসার প্রতিদিন মসজিদে নববী ও রাসূলে কারীমের (সা) কবরের মধ্যবর্তী স্থানে অপরাহ্ন বেলা পর্যন্ত হাদীছ চর্চা ও আল্লাহর যিকরে মশগুল

---

৩৯. সূরা আল-মু'মিনূন-১০১

৪০. সূরা আল-আম্বিয়া-২৮

৪১. সূরা আল-আ'রাফ-৫৬

৪২. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন : ৩৪৩-৩৪৪

৪৩. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৩

থাকতেন। উঠার সময় 'আবদুল্লাহ ইবন আবী সালামা কুরআনের একটি সূরা শুনাতেন। কুরআন শুনার পর দু'আ করতেন।[৪৪]

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) বলেন :[৪৫]

"ما رأيت قط أفضل من عليّ بن الحسين، وما رأيته قط إلا مقتُّ نفسـى، مـا رأيتـه ضاحكا يومًا قط."

"আমি 'আলী ইবন আল-হুসাইনের (রা) চাইতে ভালো মানুষ আর কখনো দেখিনি। যখনই তাঁকে দেখেছি, আমি নিজেকে তিরস্কার করেছি। আমি তাঁকে কোন দিন কখনো হাসতে দেখিনি।"

আবূ খালিদ আল-কাবুলী বলেন, আমি 'আলী ইবন আল-হুসাইনকে (রা) বলতে ঃ শুনেছি :[৪৬]

مـن عـفٌ عـن محـارم الله كـان عـابدًا، ومـن رضـى بقسـم الله كـان غنيـا، ومـن أحسن مجاورة من جاوره كان مسلما، ومن صاحب الناس بما يُحـبُّ أن يصـاحبوه به كان عدلاً.

"যে আল্লাহর হারামকৃত জিনিস থেকে সংযত থাকলো, সে-ই 'আবিদ। আর যে আল্লাহর ভাগ-বন্টনে খুশী থাকলো, সেই ধনী। যে তার প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করলো, সে-ই মুসলিম। আর যে কোন ব্যক্তির সাথে উঠা-বসা করে এবং তার কাছ থেকে যেমন আচরণ আশা করে তেমন আচরণ যদি সেও করে তাহলে সে হবে একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষ।"

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার বা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারকে এত গুরুত্ব দিতেন যে, এ ব্যাপারে কোন রকম গাফলাতি বা উদাসীনতাকে কিতাবুল্লাহর প্রতি উদাসীনতা বলে গণ্য করতেন। তিনি বলতেন, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারকে যে ছেড়ে দেয় প্রকৃতপক্ষে সে ঐ ব্যক্তির মতো যে কিতাবুল্লাহকে পিছনে ফেলে রাখে। তবে শর্ত হলো যদি সে নিজের নিরাপত্তার জন্য না ছাড়ে। লোকেরা জানতে চাইলো, নিরাপত্তার অর্থ কি? বললেন, যখন কোন অত্যাচারী ও খোদাদ্রোহী শাসকের বাড়াবাড়ির ভয় হয়।[৪৭]

---

৪৪. তাবাকাত-৫/১৬০

৪৫. আল-ইয়া'কূবী, তারীখ-২/৩০৩

৪৬. প্রাগুক্ত

৪৭. তাবাকাত-৫/১৬০

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অঢেল সম্পদ দান করেছিলেন। তাঁর ছিল একটি লাভজনক ব্যবসা। আর ছিল কৃষি খামার। তাঁর দাসেরা এগুলো পরিচালনা ও দেখাশুনা করতো। এ দু'টি উৎস থেকে তিনি প্রচুর অর্থ আয় করতেন। বিত্ত-বৈভব তাঁর মধ্যে কোন রকম গর্ব-অহঙ্কার সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি বরং এ সম্পদকে আখিরাতের কামিয়াবীর বাহনে পরিণত করেন। সুতরাং তাঁর এই সম্পদ একজন সৎকর্মশীল বান্দাহর জন্য উৎকৃষ্ট সম্পদে পরিণত হয়। গোপনে মানুষকে দান করা ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ।

ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ্, দানশীলতা এবং সাগরের মতো উদারতা ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর রাস্তায় তিনি অকৃপণ হাতে ব্যয় করতেন। ফকীর-মিসকীন ও অভাবীদের অভাব দূর করার জন্য তাঁর দানের হাত সব সময় প্রসারিত থাকতো। মদীনার কত গরীব পরিবার যে তাঁর উদার সাহায্যে জীবন ধারণ করতো তা অজ্ঞাত রয়ে গেছে। কারণ, কেউ কখনো তা জানতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুর পর জানা গেছে, গোপনে তিনি এক শো পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতেন।[৪৮]

গোপনীয়তা রক্ষার জন্য তিনি নিজে রাতের অন্ধকারে ঐ সকল বাড়ীতে গিয়ে দান-সদকা পৌঁছে দিতেন। মদীনায় তখন এমন অনেক মানুষ ছিল যাদের জীবিকার বাহ্যিক কোন উপায়-উপকরণ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর জানা যায় যে, তিনি ঐ সকল বাড়ীতে রাতের অন্ধকারে যেতেন এবং সাহায্য-সামগ্রী দিয়ে আসতেন।

খাদ্য-সামগ্রীর বস্তা নিজের পিঠে উঠিয়ে অভাবীদের গৃহে পৌঁছে দিতেন। মৃত্যুর পর যখন গোসল দেওয়া হচ্ছিল তখন তাঁর দেহে নীল রংয়ের বড় দাগ দেখা যায়। কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, তা ছিল আটার বস্তা বহনের দাগ। সেই আটা তিনি রাতের অন্ধকারে অভাবী মানুষের বাড়ীতে পৌঁছে দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর মদীনাবাসীরা বলতো, গোপনে দান-খয়রাত করা যাইনুল 'আবিদীনের (রহ) রক্তের সাথে ছিল। সাহায্যপ্রার্থীদের তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন, যখন কোন প্রার্থী আসতো তখন তিনি– "আমার পাথেয়কে আখিরাতের দিকে বহনকারী, মারহাবা"– বলে তাকে স্বাগতম জানাতেন। নিজে উঠে গিয়ে প্রার্থীকে সাহায্য দিতেন। বলতেন, দান-খয়রাত প্রার্থীর হাতে পৌঁছার পূর্বে আল্লাহর হাতে পৌঁছে যায়।[৪৯]

জীবনে দুইবার নিজের সকল অর্থ-বিত্তের অর্ধেক করে আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। পঞ্চাশ দীনারের একটি পোশাক মাত্র এক মওসুম পরে বিক্রী করে দিতেন এবং সেই অর্থ দান করতেন।

হালাল রুযি খাওয়ার ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিতেন যে, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সম্পর্ক অথবা নামের দ্বারা এক দিরহাম পরিমাণও ফায়দা উঠানো পসন্দ করতেন না।[৫০]

---

৪৮. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৩৪৩

৪৯. আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৩; মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৪

৫০. তাবাকাত-৫/১৬০-১৬২

দাস-দাসী মুক্ত করা ছিল তাঁর আরেকটি প্রিয় কাজ। আর এ কাজের জন্য তিনি সেকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কোন দাস-দাসীর আচরণে সন্তুষ্ট হলে যেমন তাকে মুক্ত করে দিতেন তেমনি মুক্ত করতেন কারো আচরণে অসন্তুষ্ট হলেও। বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর জীবনে এক হাজার দাস মুক্ত করেন। এক বছরের অধিক সময় তিনি কোন দাস-দাসীর সেবা গ্রহণ করতেন না। সাধারণতঃ 'ঈদুল ফিতরের রাতেই অধিক হারে দাস-মুক্তির কাজটি করতেন। এ রাতে তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমরা কিবলামুখী হয়ে এ কথাগুলো বলো :

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَلِيِّ بْنِ الحسين.

"হে আল্লাহ! তুমি 'আলী ইবন হুসাইনকে (রা) ক্ষমা কর।"

তারপর তাদেরকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দান করে মুক্ত করে দিতেন। এভাবে তারা এক সাথে দুইটি 'ঈদের আনন্দ উপভোগ করতো।[৫১]

তাঁর একজন দাস বর্ণনা করেছেন। একদিন তিনি আমাকে একটি প্রয়োজনে পাঠালেন। আমার ফিরতে দেরী হলো। এজন্য তিনি আমাকে চাবুক দিয়ে একটি আঘাত করলেন। আমি কেঁদে ফেললাম। তাঁর প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হলাম। কারণ, এর আগে এভাবে আমাকে কেউ কোনদিন মারেনি। আমি তাঁকে বললাম : 'আলী ইবন হুসাইন! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছেন, আমি সে কাজ করেছি! তারপরও আমাকে মারলেন? আমার এ কথা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন : তুমি এখান থেকে সোজা মসজিদে নববীতে যাবে, দুই রাক'আত নামায পড়বে, তারপর বলবে : হে আল্লাহ! তুমি 'আলী ইবন হুসাইনকে ক্ষমা করে দাও। এ কাজ করার পর আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি মুক্ত ও স্বাধীন।

আমি তাঁর কথা মতো মসজিদে গেলাম এবং তাঁর ক্ষমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম। সেখান থেকে আমি যখন তাঁর বাড়ীতে আবার এসেছি তখন আমি একজন মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ।[৫২]

ধৈর্য ও সহনশীলতা

ধৈর্য ও সহনশীলতায় পিতা হযরত হুসাইনের (রা) মতই ছিলেন। খিলাফতে রাশিদার পর একমাত্র হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের (রহ) স্বল্পকালীন খিলাফতকাল ছাড়া গোটা উমাইয়্যা শাসনকালটি ছিল বানূ হাশিম, বিশেষতঃ হযরত 'আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের জন্য নানা রকম বিপদ-আপদ এবং লাঞ্ছনা ও অবমাননার সময়কাল। এ সময়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হযরত 'আলীকে (রা) প্রকাশ্যে গালি দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়, তাঁর বংশধরদের হত্যা করা হয় এবং জীবিতদেরকে সর্বদা ভয়-ভীতির মধ্যে

---

৫১. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৩৪৮

৫২. প্রাগুক্ত-৩৪৬

রাখা হয়। এ কারণে হযরত যাইনুল 'আবিদীন (রহ) সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সযত্নে দূরে থাকা সত্ত্বেও হয়রানি ও অপমান-লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পেতেন না। অনেক সময় বহু কটু কথা, অশ্রাব্য গালি ও অশালীন মন্তব্য তাঁকেও শুনতে হতো। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সবই হজম করে ফেলতেন। তাঁর এই সহনশীলতার ফলে যে লোকটি তাঁকে গালি দিত অনেক সময় সে লজ্জিত হতো। তাই তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে পথ চলতেন তখন সেই লোকটিও তাঁর সঙ্গী হতো এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতো, ভবিষ্যতে আমার মুখ থেকে এমন কথা আপনি আর শুনতে পাবেন না।

অনেক সময় এমনও হতো যে, বাজে কথা যে বলতো তিনি তার প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করতেন না। অনেক বেয়াদব ও বাচাল এমনও বলতো যে, আপনাকে ক্ষ্যাপানোর জন্য আমি এসব কথা বলছি। জবাবে তিনি বলতেন, আমি উপেক্ষা করছি।

যদি কখনো জবাব দিতেন তাহলে সেই অশোভন উক্তিকারী তা শুনে লজ্জিত হতো। একবার তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন, পথে এক ব্যক্তি তাঁকে গালি দিতে শুরু করলো। তাঁর দাস ও চাকর-বাকররা লোকটির দিকে ধেয়ে গেল। তিনি তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার যে সকল গুণ তোমার অজানা তা তুমি যা বলছো তার চাইতে অনেক ভালো। তোমার কোন প্রয়োজন থাকলে বল আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। এমন জবাব শুনে লোকটি ভীষণ লজ্জিত হয়। তিনি নিজের জামাটি খুলে তাকে দান করেন। সেই সাথে এক হাজার দিরহামও দেন। তাঁর এমন আচরণে লোকটি এতখানি মুগ্ধ হয় যে, এরপর থেকে যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হতো অসঙ্কোচে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো–

أَشْهَدُ أنك من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) বংশধর।"[৫৩]

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, জনৈক ব্যক্তি আপনার সম্পর্কে নিন্দা-মন্দ কথা বলে। তিনি লোকটিকে সংগে করে সেই ব্যক্তির নিকট গেলেন। আর এই লোকটি মনে করলো যে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য সাথে নিয়েছেন। নিন্দাকারীর নিকট পৌঁছে তিনি বললেন, আমার সম্পর্কে তুমি যা কিছু বলেছো তা যদি সত্য ও সঠিক হয় তাহলে আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করেন। আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।[৫৪]

ক্ষমা ও উপেক্ষা

তাঁর চরম দুশমন, তাঁর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষে যাদের অন্তর পরিপূর্ণ এবং যাদের কারণে তিনি অনেক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, সুযোগ পেয়েও তিনি কোন বদলা নেননি। মদীনার ওয়ালী হিশাম ইবন ইসমা'ঈল তাঁকে এবং গোটা আহ্‌লি বাইতকে নানাভাবে

---

৫৩. প্রাগুক্ত : ৩৪১-৩৪২

৫৪. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৭

ভীষণ কষ্ট দিত। প্রকাশ্যে হযরত 'আলীকে (রা) গালি দিত। তার বিভিন্ন অপকর্মে বিরক্ত হয়ে খলীফা আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক তাকে অপসারণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, তাকে জনসমাবেশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোক এবং মানুষ নিজ নিজ বদলা গ্রহণ করুক। হিশাম নিজেই বলেছে আমার সবচাইতে বেশী ভয় ছিল 'আলী ইবন হুসাইনের (রা) বদলা গ্রহণের। কিন্তু তিনি তাঁর ছেলে ও সমর্থকদের আমার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে বারণ করে দেন। তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহর কসম! সে আমাদের সাথে খুব খারাপ আচরণ করেছে, আর আমরা এমন একটি সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি বললেন, আমরা তাঁকে আল্লাহর যিম্মায় ছেড়ে দিলাম। তাঁর এ কথার পর আর কেউ হিশাম সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। এতে হিশাম যাইনুল 'আবিদীনের (রহ) একজন গুণমুগ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হন।[৫৫]

স্বভাবগতভাবে তিনি খুব নরম মেজাযের ছিলেন। রূঢ়তা ও রুক্ষতা তাঁর মধ্যে মোটেও ছিল না। জীব-জন্তুকেও কখনো মারা তো দূরের কথা ধমকও দিতেন না। হিশাম ইবন 'উরওয়া বলেন, 'আলী জন্তুর পিঠে চড়ে মক্কায় গিয়ে আবার ফিরে আসতেন। এই দীর্ঘ সফরে কখনো নিজের বাহন জন্তুটিকে মারতেন না।

মানুষের প্রীতি ও ভক্তি-শ্রদ্ধা

তাঁর এমন ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমা, উদারতা, দয়া ও নম্রতার ফলে মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা স্থায়ী হয়ে যায়। তিনি কোথাও বের হলে তাঁকে পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে ব্যস্ততা শুরু হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকের সংগে তাঁর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক তখনো খিলাফতের মসনদে আসীন হননি। তখন একবার শামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সংগে নিয়ে হজ্জে গেলেন। কা'বার তাওয়াফ শেষ করে হাজরে আসওয়াদ চুমু দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে এত ভীড় ছিল যে বহু চেষ্টা করেও সক্ষম হলেন না। বাধ্য হয়ে ইচ্ছা ত্যাগ করলেন।

ভীড়ের দৃশ্য দেখার জন্য নিকটেই তাঁর জন্য একটি চেয়ার পেতে দেওয়া হয়। তিনি বসে বসে ভীড়ের দৃশ্য অবলোকন করছেন। এমন সময় ইমাম যাইনুল 'আবিদীন আসলেন এবং তাওয়াফ শেষ করে হাজরে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখা মাত্র আপনা থেকেই স্থানটি ফাঁকা হয়ে গেল। তিনি অতি সহজেই হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলেন। এ দৃশ্য দেখে একজন শামী ব্যক্তি হিশামকে জিজ্ঞেস করলো! এ ব্যক্তি কে যাঁর প্রতি মানুষের অন্তরে এত ভীতি ও শ্রদ্ধা? যাইনুল 'আবিদীনকে হিশাম ভালোই করে চিনতেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি শামবাসীদের উৎসুক্য দূর করার জন্য না চেনার ভান করে বললেন : আমি তাকে চিনি না। পাশেই ছিলেন তৎকালীন 'আরবের বিখ্যাত কবি ফারাযদাক। তিনি ছিলেন আহ্লি বাইতের একজন ভক্ত। হিশামের এমন উপেক্ষায় তিনি

---

৫৫. তাবাকাত-৫/১৬৩

আহত হন। বলেন : হিশাম না চিনলেও আমি তাঁকে চিনি। শামের লোকটি জানতে চাইলো, তিনি কে? কবি ফারাযদাক তাৎক্ষণিকভাবে হযরত যাইনুল 'আবিদীনের পরিচয় ও প্রশংসায় একটি কাসীদা রচনা করে ফেলেন। সেই বিখ্যাত কাসীদার কিছু অংশ নিম্নরূপ :[৫৬]

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحِلُ الحرم

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء اللهِ قد ختموا

وليس قولك : من هذا؟ بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم

ما قال : لا، قطُّ إلا فى تشهده لولا التشهدُ كانت لاؤه هم

يُغضى حياءً ويغضَى من مهابته فما يُكلَّمُ إلا حين يبتسم

يكاد يُمْسِكُهُ ـ عرفان راحته ركن الحطيم إذا ماجاء يستلم

ينشقُّ ثوبُ الدجى عن نور غرته كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلَمُ

من معشرٍ حُبُّهم دين، وبُغضُهم كفر، وقُربهم مَنْجًى ومعتصم.

"এ সেই ব্যক্তি যাঁর পদচারণা ও পদক্ষেপকে বাতহা উপত্যকা চেনে। মক্কার কা'বা ঘর, হারামের অধিবাসী ও মক্কার বাইরের লোকেরাও চেনে।

তুমি যদিও তাঁকে না জানার ভান করছো, তিনি তো ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মাদ (সা)-এর বংশধর। তাঁরই দাদার মাধ্যমে আল্লাহর নবীদের আগমনের ধারা সমাপ্ত হয়েছে।

তোমার এ প্রশ্ন : "এ কে?"– তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি যাঁকে চেননা বলছো, আরব-আজমের সবাই তাঁকে চেনে।

একমাত্র নামাযের ভিতরে তাশাহ্হুদ-এর মধ্যের "লা" (না) ছাড়া আর কখনো তিনি "লা" বলেন না। যদি তাশাহ্হুদ না থাকতো তাহলে তাঁর "লা"ও "না'আম" (হাঁ) হয়ে যেত।

লজ্জা-শরমে তিনি দৃষ্টি অবনত রাখেন এবং মানুষ তাঁর সামনে তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে তাঁর প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধের কারণে। তিনি যখন একটু হাসেন কেবল তখনই কথা বলা যায়।

যখন তিনি হাজরে আসওয়াদ চুমু দিতে যান তখন হাতীম (হাজরে আসওয়াদের পাশের কা'বার অংশ বিশেষ)-এর খুঁটি তাঁর হাত চিন্তে পেরে তাঁকে প্রায় আটকে রাখতে চায়।

---

৫৬. ডঃ 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৬৬২; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন : ৩৪৯-৩৫২

তাঁর কপালের দীপ্তিতে অন্ধকারের পর্দা বিদীর্ণ হয়ে যায়। যেমন সূর্যের আলোতে অন্ধকার দূর হয়।

তিনি এমন বংশের যাঁদের ভালোবাসা হলো দীন ও ধর্ম, আর তাঁদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরী কাজ। তাঁদের নৈকট্য হলো মুক্তি ও শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা।"

কাসীদাটি শুনে হিশাম কবি ফারাযদাকের উপর ভীষণ ক্ষেপে যান এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। আর এদিকে ইমাম যাইনুল 'আবিদীন তাঁদের প্রতি ভালোবাসার প্রতিদান হিসাবে ফারাযদাককে বারো হাজার দিরহাম দান করেন। কিন্তু কবি বিনয়ের সাথে সেই অর্থ এই বলে ফেরত দেন যে, আমি কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টির জন্য মাদাহ বা প্রশংসা করেছি। প্রতিদান বা পুরস্কারের লোভে নয়। ইমাম যাইনুল 'আবিদীন (রহ) আবার সে অর্থ তাঁর নিকট একথা বলে ফেরত পাঠান যে, আমরা আহ্লি বাইত কাউকে কিছু দান করলে তা আর ফেরত নিই না। আল্লাহ তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। তিনি তোমাকে আরো প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তোমার এ চেষ্টা কবুল করুন। এরপর ফারায়দাক সে অর্থ গ্রহণ করেন।[৫৭]

গর্ব-অহঙ্কারের প্রতি ঘৃণা

এত উঁচু মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভীষণ নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। গর্ব-অহঙ্কারকে দারুণ ঘৃণা করতেন। বলতেন, আমি গর্বিত-অহঙ্কারী মানুষকে দেখে বিস্মিত হই, গতকাল যে ছিল এক ফোঁটা নিকৃষ্ট পানি এবং আগামীকাল যে মৃতে পরিণত হবে। এমন বিনীতভাবে চলতেন যে, চলার সময় হাত দু'টি হাঁটুর আগে যেতে পারতো না।[৫৮]

সাম্য ও সমতা

বংশীয় আভিজাত্য দূর করা এবং সাম্য ও সমতার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি নিজের এক মেয়েকে তাঁর এক দাসের সাথে বিয়ে দেন এবং এক দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নিজে তাঁকে বিয়ে করেন। খলীফা 'আবদুল মালিক একথা অবগত হয়ে একটি চিঠিতে তাঁকে তিরস্কার করেন। জবাবে তিনি 'আবদুল মালিককে লেখেন: হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বাস্তব জীবন তোমাদের জন্য আদর্শ। তিনি হযরত সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াইকে (রা)- যিনি দাসী ছিলেন, মুক্তি দিয়ে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। অন্যদিকে নিজের দাস যায়দ ইবন হারিছাকে (রা) মুক্তি দিয়ে তাঁর সাথে ফুফাতো বোন যায়নাব বিন্ত জাহাশকে (রা) বিয়ে দেন।[৫৯]

আহ্লি বাইতের ভালোবাসার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থার উপদেশ

অনেক আহ্লি বাইতের প্রেমিক বলে দাবীদার তাদের বাড়াবাড়িমূলক আচরণের মাধ্যমে

---

৫৭. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৬

৫৮. প্রাগুক্ত

৫৯. তাবাকাত-৫/১৫৯

আহ্‌লি বাইতকে ধুলার ধরণী থেকে আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলে নিয়ে যায়। হযরত ইমাম যাইনুল 'আবিদীন এ ধরনের ভ্রান্ত অসংযত প্রেমকে ভীষণ অপসন্দ করতেন। তিনি তাদেরকে এমন কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতেন। বলতেন : 'তোমরা ইসলাম নির্ধারিত সীমার মধ্যে আমাদেরকে ভালোবাস। আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের সম্পর্কে এত অতিরঞ্জিত কথা বলে থাক যা অনেকের নিকট আমাদেরকে অপ্রিয় করে দিয়েছে।" কখনো বলতেন : "আল্লাহর ওয়াস্তে ইসলাম বিঘোষিত সীমার মধ্যে আমাদেরকে মুহাব্বত কর। তোমাদের মুহাব্বত তো আমাদের গ্লানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৬০]

তিনজন খলীফায়ে রাশেদা-এর প্রতি সুধারণা

নিজের সত্যপন্থী পূর্বসূরীদের মত আবূ বকর, 'উমার ও 'উসমান (রা)– তিন খলীফার প্রতি ইমাম যাইনুল 'আবিদীনও সুধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের নিন্দা-মন্দ ও সমালোচনা শোনা মোটেই পসন্দ করতেন না। কেউ তাঁদের সম্পর্কে কোন অশোভন উক্তি করলে তিনি নিজের বৈঠক থেকে তাঁকে বের করে দিতেন। একবার ইরাক থেকে কয়েক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে। তাদের ধারণা ছিল, তিনিও তাঁদের মত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। আর তাই তারা তাঁর সামনে তিন খলীফা সম্পর্কে অশোভন উক্তি করে বসে। তিনি কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :[৬১]

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ.

"এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী।"

এ আয়াতে মুহাজিরদের মহত্ত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কি প্রথম পর্বের এই মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে তাঁদের ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, যারা এসব কিছুর বিনিময়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তাঁর রাসূলের (সা) সাহায্য করে?

ইরাকীরা বললো! না, আমরা তাঁদের কেউ নই। তারপর ইমাম যাইনুল 'আবিদীন (রহ) আয়াতটির দ্বিতীয় অংশ পাঠ করলেন :[৬২]

---

৬০. প্রাগুক্ত-৫/১৫৮
৬১. সূরা আল-হাশর-৮
৬২. প্রাগুক্ত-৯

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَاهَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَيَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ؛ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা তাঁদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"

এ আয়াতে আনসারদের মর্যাদা ও গুণাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতটি তিলাওয়াতের পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা মুহাজিরদের আগমনের পূর্ব থেকে মদীনায় বসবাস করতেন, তারপর ঈমান আনেন এবং যাঁরা হিজরাত করে তাঁদের এখানে আসেন তাঁদেরকে মুহাব্বত করেন?

ইরাকীরা বললো, আমরা তাঁদেরও অন্তর্ভুক্ত নই। তিনি বললেন : তোমরা নিজেরাই স্বীকার করছো, তোমরা ঐ দুইটি দলের একটিরও অন্তর্ভুক্ত নও। এখন আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা এই দলটিরও নও যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدَهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالإِيْمَانِ وَلاَتَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاً لِلَّذِيْنَ امَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"

তোমরা যখন এই তিনটি ইসলামী দলের কোন একটির মধ্যেও নেই তখন আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করুন। আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাও। হযরত 'উসমান (রা) সম্পর্কে তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম! তাঁকে অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়েছে।[৬৩]

দৈহিক অবয়ব ও আকৃতি

তিনি সুন্দর অবয়ব ও আকৃতির ছিলেন। দেহ থেকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়তো। কাঁধ পর্যন্ত বাবরী ছিল। কপালের সিঁথি বেরিয়ে থাকতো। কখনো কালো, আবার কখনো লাল– দুই রকম খিজাবই ব্যবহার করতেন।[৬৪]

---

৬৩. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৪; তাবাকাত-৫/১৬০

৬৪. তাবাকাত-৫/১৬০

পোশাক-পরিচ্ছদ

অতি সুন্দর ও দামী পোশাক পরতেন। জোব্বা ও চাদর ব্যবহার করতেন। একেকটি চাদরের মূল্য পঞ্চাশ দীনার পর্যন্ত হতো। এই দামী দামী চাদরগুলো মাত্র এক মওসুম ব্যবহার করে বিক্রী করে দিতেন এবং সেই অর্থ গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। শীতকালে শীত প্রধান অঞ্চলের "সুমূর" নামক এক প্রকার জন্তুর কোমল পশম বিশিষ্ট চামড়ার পোশাক পরতেন। সাদা, কালো, লাল, হলুদ সকল প্রকার রং তাঁর পসন্দ ছিল। গোলাকৃতির মাথাওয়ালা জুতো পরতেন।[৬৫]

সুরুচি ও পরিচ্ছন্নতা

সুরুচি ও পরিচ্ছন্নতা ছিল তাঁর স্বভাবগত। কোন রকম অপরিচ্ছন্নতা ও নোংরামী মোটেই সহ্য করতে পারতেন না, অনেক জিনিস পসন্দ না হলেও মানুষের কথা চিন্তা করে মেনে নিতেন। আবূ জা'ফার বর্ণনা করেছেন, একবার 'আলী ইবন হুসাইন (রা) বাইতুল খালা বা পায়খানায় গেলেন। এক ব্যক্তি হাত ধোয়ার পানি নিয়ে দরজায় দাড়িয়ে ছিল। পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর বললেন : আমি পায়খানার মধ্যে এমন জিনিস দেখেছি যা আমাকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো : সেই জিনিস কি? বললেন : দেখলাম ময়লার উপর মাছি বসে এবং তা উড়ে এসে মানুষের গায়ে পড়ে। এ কারণে আমি ইচ্ছা করেছিলাম পায়খানায় যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ পোশাক তৈরি করবো। কিন্তু পরে চিন্তা করে বললেন, যে জিনিস মানুষের সাধ্যের মধ্যে না হয় তা আমারও করা উচিত হবে না।[৬৬]

---

৬৫. প্রাগুক্ত-৫/১৬২

৬৬. প্রাগুক্ত

'আমর ইবন দীনার (রহ)

হযরত 'আমর ইবন দীনারের (রহ) কুনিয়াত বা ডাকনাম ছিল আবূ মুহাম্মাদ। বাযান 'আজমীর আযাদকৃত দাস ছিলেন। হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৪৫/৪৬ সনে অথবা তার কাছাকাছি সময়ে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

তাঁর সম্মান ও মর্যাদা

জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে হাদীছের হাফিয, ইমাম ও মক্কার হারামের ইমাম অভিধায় ভূষিত করেছেন।[২] তিনি বলেন ঃ[৩]

أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه.

–তিনি তাঁর সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ও মক্কার হারামের শায়খ তথা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর মহত্ত্ব, নেতৃত্ব ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলে একমত। তিনি ছিলেন তাবি'ঈন শ্রেণীর ইমাম।[৪] আল-হাকেম তাঁর "আল-মুযাক্কী আল-আখবার" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

هو من كبار التابعين. – তিনি শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের একজন।[৫]

'ইলমে হাদীছে তাঁর স্থান

তিনি হাদীছের একজন বড় হাফিয ছিলেন, ইবন সা'দ বলেন ঃ[৬]

كان عمرو ثقة ثبتًا كثير الحديث.

–'আমর ছিলেন বিশ্বস্ত, সুদৃঢ় ও বহু হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ ও বর্ণনাকারী। সাহাবীদের মধ্যে ইবন 'উমার, ইবন 'আব্বাস, ইবন যুবাইর, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, আবূ হুরাইরা, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, আবুত তুফায়ল, সায়িব ইবন ইয়াযীদ, আনাস ইবন মালিক (রা) প্রমুখের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন। তাবি'ঈদের মধ্যে

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৩০০; আসরুত তাবি'ঈন-৪৪৭

২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৩

৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৩০০

৪. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২৭

৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/৫০০

৬. তাবাকাত-৫/৪৮০

সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, সা'ঈদ ইবন আয-যুবাইর, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ, তাঊস, 'আতা, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, মুজাহিদ, আবূ মুলাইকা, সুলাইমান ইবন ইয়াসার, ওয়াহাব ইবন 'উতবা, যুহ্রী, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) প্রমুখ সহ বিখ্যাত তাবি'ঈদের বড় একটি দলের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন ও বর্ণনা করেন।[৭]

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল অতি ব্যাপক ও গভীর। সমকালীন আলিমদের সম্মিলিত জ্ঞান তিনি নিজের বুকে ধারণ করেন। বিখ্যাত তাবি'ঈ তাঊস (রহ) তাঁর ছেলেকে বলতেন ঃ[৮]

إذا قدمت مكة يابنى فعليك بعمرو بن دينار، فإن أذنه كانت قمعًا للعلماء.

–ছেলে, যখন তুমি মক্কায় যাবে, 'আমর ইবন দীনারের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। কারণ, তাঁর কান 'আলিমদের বশীভূত।

তাঁর বর্ণিত হাদীছের স্থান

হাদীছ বিশারদদের নিকট তাঁর বর্ণিত হাদীছের স্থান অনেক উর্ধ্বে। ইমাম যুহ্রী বলতেন, আমি উঁচু মানের হাদীছের ক্ষেত্রে এই শায়খ তথা বিজ্ঞ ব্যক্তির চাইতে আর কাউকে দেখিনি। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না একবার সা'দকে জিজ্ঞেস করেন, হাদীছের ক্ষেত্রে আপনি সব চাইতে শক্ত ও দৃঢ়পদ কাদেরকে দেখেছেন? বললেন, 'আমর ইবন দীনার ও কাসিম ইবন 'আবদির রহমানকে। ইবন 'উয়ায়না ও 'আমর ইবন জারীর তাঁকে– "বিশ্বস্ত, দৃঢ়পদ, সত্যবাদী ও বহু হাদীছের ধারক"– বলতেন।[৯]

রিওয়ায়াত বিল মা'না বা হাদীছের ভাব ও অর্থ বর্ণনা

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তা সত্ত্বেও শ্রুত মূল শব্দসহ হাদীছ বর্ণনা করা জরুরী মনে করতেন না। তিনি নিজের ভাষায় শ্রুত হাদীছের অর্থ ও ভাব বর্ণনা করতেন।[১০] হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞানের কারণে তিনি এর একজন নির্ভরযোগ্য সূত্রে পরিণত হন। এ শাস্ত্রের আগ্রহী ছাত্ররা মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করে করে তাঁর বর্ণিত হাদীছ লিখতেন। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না বলেন, আইয়ূব আস-সিখ্তিয়ানী আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'আমর ইবন দীনার অমুকের সূত্রে কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন? আমি তাঁকে হাদীছটি বলে দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, আপনি কি হাদীছটি লিখতে চান? বলতেন, হাঁ।[১১]

---

৭. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৩

৮. তাবাকাত-৫/৪৭৯; তাহযীব আত-তাহযীব-৮/২৯

৯. তাবাকাত-৫/৪৮০

১০. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩০

১১. তাবাকাত-৫/৪৮০

তাঁর ছাত্র-শিষ্য

তাঁর ব্যাপক জ্ঞান তাঁর ছাত্র-শিষ্যের গণ্ডিকে ভীষণ প্রশস্ত করে দেয়। তাঁর সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন ছাত্র হলেন ঃ ইমাম জা'ফার আস-সাদিক, আবূ কাতাদা, মিসওয়ার, ইবন আবী নাজীহ্, হাম্মাদ, সুফইয়ান (রহ) ও আরো অনেকে।[১২]

ফিক্হ

ফিক্হ শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। কুরআন ও সুন্নাহ্তে গবেষণা করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও আইন-কানুন বের করার ক্ষেত্রে তাঁর ছিল যেমন ইজতিহাদের বিশেষ যোগ্যতা, তেমনি ছিল স্বকীয়তাও। ইমাম নাওবী (রহ) লিখেছেন, তিনি মাযহাবপন্থীদের অনুকরণীয় একজন বড় মুজতাহিদ ছিলেন।[১৩] প্রায় তিরিশ বছর যাবত ফাতওয়া দেন। তৎকালীন অনেক বড় বড় আলিম তাঁকে তাউস, 'আতা ও মুজাহিদের (রহ) মতো শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের উপর প্রাধান্য দিতেন। ইবন আবী দীনার তো তাঁকে উল্লেখিত তিনজনের চাইতেও বড় ফকীহ (ফিক্হ বিশারদ) বলতেন।

ما رأيت أحدا أفقه من عمرو بن دينار، لاعطاء ولا طاووسا ولا مجاهدا.[১৪]

–আমি 'আমর ইবন দীনারের চাইতে বড় ফকীহ্ আর কাউকে দেখিনি। 'আতা, তাউস ও মুজাহিদ কাউকে না।

সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না বলতেন ঃ[১৫]

ما كان عندنا أحد أفقه من عمرو بن دينار، ولا أعلم ولا أحفظ منه.

–আমাদের দৃষ্টিতে 'আমর ইবন দীনারের চাইতে বড় ফকীহ্, বড় 'আলিম এবং বড় হাফিযে হাদীছ আর কেউ ছিলেন না।

সতর্কতা

অত্যধিক সতর্কতার কারণে তিনি হাদীছ ও ফিক্হ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়িল লেখালেখি পসন্দ করতেন না। বলতেন, মানুষ আমাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। আমরা তার উত্তর দিলে তারা তা পাথরে খোদাই করার মতো লিখে নেয়। হতে পারে আজ যে সিদ্ধান্ত আমরা দিলাম, আগামীকাল তা প্রত্যাহার করে নিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। তখন পূর্বের ভুল সিদ্ধান্তটি লিখিত থেকে গেল।[১৬] একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললো, সুফইয়ান আপনার নিকট থেকে যা কিছু শোনে তা লিখে রাখে। একথা শুনে

---

১২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩০

১৩. তাহ্যীবুল আসমা'-১/২৭; তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৮/৩০

১৪. তাহ্যীবুল আসমা'-১/২৭

১৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৩; 'আসরুত তাবি'ঈন-৪৪৭

১৬. তাবাকাত-৫/৪৮০

তিনি কাঁদতে থাকেন। তারপর বলেন, যে ব্যক্তি আমার কথা লেখে সে আমার প্রতি বড় যুলুম করে।[১৭] তিনি বলতেন ঃ[১৮]

أُحَرِّجُ على من يكتب عني، فما كتبت عن أحد شيئًا، كنت أحفظ.

–আমার থেকে কেউ কিছু লিখে রাখুক তা আমি পসন্দ করি না। আমি কারো কাছ থেকে কিছু লিখিনি। আমি মুখস্থ করতাম।

একদিন তিনি তাঁর মেধাবী ছাত্র সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়নার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিয়ে বলেন ঃ[১৯]

مثلك حفظت الحديث وكنت صغيرا.

–আমিও ছোট অবস্থায় তোমার মতো হাদীছ মুখস্থ করেছি।

একবার এক ব্যক্তি কোন একটি জিনিস সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করে। তিনি কোন জবাব দিলেন না। প্রশ্নকারী বললো, জিনিসটির ব্যাপারে আমার অন্তরে একটু সন্দেহ আছে। এ কারণে আপনার নিকট থেকে একটি জবাব পেতে চাই। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম! তোমার অন্তরে আবূ কুবায়স পাহাড় পরিমাণ সন্দেহ থাকার পরিবর্তে আমার অন্তরে একটি পশম পরিমাণ সন্দেহ থাকা আমার কাছে বেশী অপসন্দনীয়। অর্থাৎ আমার জবাব দানের পর আমার অন্তরে সামান্য সন্দেহ হোক তার চাইতে তোমার অন্তরে পাহাড় পরিমাণ সন্দেহ বিদ্যমান থাকুক, সেটাই আমার পসন্দ।[২০]

তাঁর 'ইবাদাত-বন্দেগী

তিনি একজন ভীষণ 'আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। রাতের বেশীর ভাগ 'ইবাদাত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করতেন। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না (রহ) বলেন ঃ[২১]

كان عمرو بن دينار قد جزّأ الليل ثلاثة أجزاء، ثلثا ينام وثلثا يدرس حديثه وثلثا يصلي.

–'আমর ইবন দীনার রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন। এক ভাগে ঘুমোতেন, এক ভাগে হাদীছ বর্ণনা করতেন এবং আরেক ভাগ নামাযে অতিবাহিত করতেন।

জামা'আতে নামায আদায়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান

তিনি জামা'আতে নামায আদায়ের প্রতি এত গুরুত্ব দিতেন যে, বার্ধক্যে যখন শক্তিহীন

---

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৩০১

১৯. প্রাগুক্ত-৫/৩০৭

২০. তাবাকাত-৫/৪৮০

২১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৩০২; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৩

হয়ে পড়েন তখনও নিজের বাসস্থান থেকে বেশ দূরে মসজিদেই নামায আদায় করতেন। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না (রহ) বলেন, তিনি জীবনের কোন পর্যায়ে মসজিদে যাওয়া-আসা বন্ধ করেননি। গাধার পিঠে বসিয়ে তাঁকে মসজিদে আনা হতো। বার্ধক্যের একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন কোন বাহন ছাড়া চলতেই পারতেন না তখন আমি সব সময় তাঁকে মসজিদে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকতে দেখতাম। আমার বয়স কম হওয়ার কারণে আমি তাঁকে বাহনের পিঠে উঠিয়ে দিতে পারতাম না। তবে কিছু দিন পর উঠিয়ে দিতে পারতাম। তাঁর বাসস্থান মসজিদ থেকে দূরে ছিল।[২২]

ইসলামী সেবামূলক কাজের বিনিময়ে কোন কিছু না নেয়া

তিনি সেবামূলক কোন কাজের বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ভালো মনে করতেন না। এ জাতীয় সকল কাজ তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতেন। তৎকালীন খলীফা একবার তাঁর ইচ্ছার কথা এভাবে ব্যক্ত করেন যে, আমি আপনার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেই, আর আপনি নিশ্চিন্ত মনে ফাতওয়ার দায়িত্বটি পালন করে যান। তিনি এ প্রস্তাবে রাজী হননি। কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই পূর্বে যে রকম দায়িত্ব পালন করছিলেন, সেভাবে পালন করতে থাকেন।[২৩]

আল-ওয়াকিদী বলেছেন, 'আমর ইবন দীনার হিজরী ১২৬ সনে আশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।[২৪]

---

২২. তাবাকাত-৫/৪৭৯

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৩

রাবী'আ ইবন ফাররূখ আর-রায় (রহ)

হিজরী ৫১ সনের কথা। মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী তখন ইসলামের সুমহান বিশ্বাস ও বাণী বহন করে দিক্‌বিদিক ছড়িয়ে পড়েছে, বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের দিকে তাঁদের দয়া ও মমতাভরা হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁরা জনপদের পর জনপদে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসছে। বিজয়ী সেনাপতি, সিজিস্তান বিজয়ী ও খুরাসানের আমীর মহান সাহাবী আর-রাবী' ইবন যিয়াদ আল-হারিছী (রা) তাঁর বাহিনীসহ রণাঙ্গনে অবস্থান করছেন। সংগে আছেন তাঁর সাহসী দাস ফাররূফ।

সিজিস্তান ও তার আশে-পাশের অঞ্চলসমূহ বিজয়ের পর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন 'সায়হূন'[১] নদী পার হবেন এবং 'মা ওয়ারা আন-নাহ্‌র' নামে পরিচিত অঞ্চলে ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডীন করবেন। অভিযানের তোড়জোড় শুরু করলেন এবং এর জন্য সৈন্য, রসদপত্র, অস্ত্রশস্ত্র যা কিছু প্রয়োজন সংগ্রহ করে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এক সময় অভিযান শুরু হলো। ভয়াবহ যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে সামনে এগিয়ে চললেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী নদী পার হলো। তখন তাদের সামনে বিশাল তুর্কিস্তান, চীন ও মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সায়হূন নদী পার হয়ে নিজেদের অবস্থান একটু শক্ত করে সেনাপতি রাবী' ইবন যিয়াদ (রা) নিজে নদীর পানি দ্বারা ওযু করেন এবং সৈনিকদেরকেও ওযু করতে নির্দেশ দেন। তারপর সকলে এই বিজয় ও সাফল্যের জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া আদায় করেন দু'রাক'আত নামায আদায়ের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, সায়হূন নদী পার হওয়ার সময় যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয় তাতে সেনাপতির দাস ফাররূফ দারুণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। এতে সেনাপতি রাবী' (রা) ভীষণ খুশী হন। নদী পার হওয়ার পর দাসকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেন। তাই শোকরানা নামায আদায়ের পর তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তির ঘোষণা দেন। গনীমাতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে বড় একটি অংশ এবং নিজের সম্পদ থেকেও প্রচুর অর্থ-সম্পদ তাঁকে দান করেন।

এই যুদ্ধের মাত্র দু'বছর পর মহান সেনাপতি রাবী' ইবন যিয়াদ (রা) ইনতিকাল করেন। মনীবের মৃত্যুর পর বীর যুবক ফাররূফ মদীনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গনীমাতে তাঁর অংশের বিপুল অর্থ-সম্পদ, আর সেই সাথে মনীবের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদ নিয়ে একদিন মদীনার দিকে যাত্রা করেন।

ফাররূফ মদীনায় ফিরে আসলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় তিরিশ বছর। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা মদীনার অলিতে-গলিতে আলোচিত হচ্ছে। মানুষের মনকাড়া চেহারা,

---

১. সায়হূন একটি বিশাল নদী। সমরকন্দের পরে তুর্কিস্তান সীমান্তে প্রবাহিত।

সুস্বাস্থ্য ও পূর্ণ যৌবনের অধিকারী এক ব্যক্তি তিনি। মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ জন্য একটি বাড়ী বানানো ও বিয়ে করার কথা ভাবলেন। মদীনার মধ্যম ধরনের একটি বাড়ী কিনলেন। তারপর নিজের সমবয়সী শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও দীনদার এক মহিলাকে বিয়ে করলেন।

নতুন বাড়ীতে নব বধূর সাথে অতি সুখেই দিন কাটছিল। আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল তাঁদের জীবন। কিন্তু যে যুবক বেড়ে উঠেছে অশ্বের পিঠে ও তরবারির ছায়ায় এবং যার ঘুম ভেঙ্গেছে শত্রুর রণ হুংকারে, এত আনন্দময় জীবন তাঁর ভালো লাগার কথা নয়। এ জীবন তাঁর সৈনিক জীবনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলো না। তিনি আবার রণাঙ্গনে ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ও শাহাদাতের তীব্র বাসনা সব সময় তাঁকে স্ত্রীর ভালোবাসা ও পরিবারের আকর্ষণ ছিন্ন করার জন্য তাগাদা দিতে লাগলো। তাঁকে আরো ব্যাকুল করে তুলতো যখন মদীনার রাস্তা-ঘাটে চলার সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনের বিজয়ের খবর তাঁর কানে আসতো।

ফাররূখের মনের অবস্থা যখন এমন পর্যায়ে তখন তিনি এক জুম'আর দিনে মসজিদে নববীতে গেছেন নামায আদায় করতে। খতীব সাহেব মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর গুরুত্বের কথা বলে সকলকে জিহাদে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করলেন। সেই সাথে বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের কথাও ঘোষণা করলেন। মদীনা থেকে বিভিন্ন রণাঙ্গনগামী বাহিনীসমূহের যে কোন একটিতে নাম লিখানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি ঘরে ফিরে আসলেন। এক সময় সুযোগ মত স্ত্রীকে তাঁর এ সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। স্ত্রী বললেন :

–আবূ 'আবদির রহমান! আপনি আমাকে এবং আমার গর্ভে আপনার যে সন্তান রয়েছে তাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? মদীনায় আপনি একজন বহিরাগত। এখানে আপনার আত্মীয়-স্বজন ও গোত্র-গোষ্ঠীর কেউ নেই।

বললেন : আমি তোমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হিফাযতেই ছেড়ে যাচ্ছি। গনীমাতের অংশে আমি যে সম্পদ পেয়েছি তার থেকে তিরিশ হাজার দীনার জমা রেখেছি, তা তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি এ অর্থ সংরক্ষণ করবে, ব্যবসায় খাটিয়ে আরো বৃদ্ধি করবে। আর এর থেকেই তোমার নিজের ও আমাদের সন্তানের জন্য খরচ করতে থাকবে। এর মধ্যে আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসবো অথবা আল্লাহ আমাকে শাহাদাত দান করবেন।

এভাবে স্ত্রীকে রাজি করিয়ে তাঁকে আল্লাহ ও রাসূলের হিফাযতে রেখে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে স্বামী বিচ্ছেদ-ব্যথায় কাতর স্ত্রী কিছুদিন পরে চাঁদের মত সুন্দর ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সন্তান পেয়ে দারুণ খুশী হলেন এবং তার পিতার বিচ্ছেদ-ব্যথা ভুলে গেলেন। তিনি এই শিশু সন্তানের নাম রাখেন 'রাবী'আ'। শৈশবেই তার কথা ও কাজে মেধা ও বুদ্ধির প্রকাশ ঘটতে থাকে। মা তার শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সে লেখা ও পড়ায় দক্ষ

হয়ে ওঠে। এরপর সে কুরআন হিফ্‌য করে। তাঁর কুরআন তিলাওয়াত হয় অতি চমৎকার। তাঁর তিলাওয়াত শুনে মনে হতো এখনই যেন তা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) উপর নাযিল হচ্ছে। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বহু হাদীছও মুখস্থ করেন। আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। দীনী 'ইলমের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ বুৎপত্তিও লাভ করেন। মা তার ছেলের সুশিক্ষার জন্য তার পিতার রেখে যাওয়া অর্থ থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। শিক্ষকদেরকে উচ্চ হারে ভাতা ও মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন দিতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলের কিছু সাফল্য দেখলে তিনি শিক্ষকদেরকেও সেই হারে উপহার দিতেন। এভাবে তিনি স্বামীর অনুপস্থিতিতে অতি যত্নের সাথে ছেলেকে গড়ে তোলেন।

সুশিক্ষা নিয়ে ছেলে বড় হচ্ছে। মা ছেলের পিতার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকেন। কবে আসবেন তিনি, যখন প্রাণপ্রিয় ছেলেকে তাঁর হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু তাঁর এ প্রতীক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। ফাররূখের ফেরার সময় আর হয় না। এদিকে তাঁর সম্পর্কে নানা কথা শোনা যেতে থাকে। যেমন, অনেকে বলতে থাকে তিনি শত্রু বাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছেন, আবার কেউ কেউ বলতে থাকে তিনি এখনো জিহাদের ময়দানে আছেন। অন্যদিকে রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসা একদল মুজাহিদ বলতে থাকে, তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। যে শাহাদাতের তীব্র বাসনা তিনি আজীবন লালন করেছেন। রাবী'আর মা শেষ কথাটিই বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন এবং দুঃখ-বেদনায় ভীষণ কাতর হয়ে পড়েন। তারপর এক সময় স্বাভাবিক হয়ে তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দু'আ করেন।

রাবী'আ তখন কৈশর পেরিয়ে যৌবনে পা রেখেছেন। তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর মাকে বললেন : আল্লাহর ইচ্ছায় রাবী'আ তো এখন বেশ লেখা-পড়া শিখেছে। সে তার সংগীদের ডিঙ্গিয়ে কুরআন হিফ্‌য করেছে এবং হাদীছও বর্ণনা করা শুরু করেছে। এখন তার কোন একটি পেশা বেছে নিয়ে তাতে দক্ষ হওয়া উচিত হবে। তাহলে কিছু ভালো আয়-রোজগার করতে পারবে এবং আপনারা স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারবেন। মা বললেন : আমি আল্লাহর কাছে চাই, তিনি যেন তার জন্য এমন কিছু নির্বাচন করে দেন যাতে তার পার্থিব জীবনে সুন্দর জীবিকা এবং পরকালীন জীবনে সুখ-শান্তির ব্যবস্থা হয়। রাবী'আ নিজের জন্য জ্ঞানচর্চাকে বেছে নিয়েছে। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ছাত্র ও শিক্ষক হয়েই থাকবে।

রাবী'আ নিজের জন্য যে পথ বেছে নেন, কোন রকম দ্বিধা-সংশয় ও জড়তা-অলসতা ছাড়াই সেই পথে চলতে থাকেন। মদীনার মসজিদে জ্ঞান চর্চার মজলিস ও আসরসমূহে অংশ গ্রহণ চলতে থাকে অবিচ্ছিন্নভাবে। তখনও যে সকল মহান সাহাবী জীবিত ছিলেন, তাঁদের নিকট, বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহর (সা) খাদিম হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) আসরে অংশ গ্রহণ করতেন। প্রথম শ্রেণীর মহান তাবি'ঈ, যেমন সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, মাকহূল আশ-শামী, সালামা ইবন দীনার (রহ) প্রমুখের দারসের মজলিসেও বসতেন। জ্ঞান চর্চায় তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁর এমন শ্রম ও সাধনা

দেখে অনেকে তাঁর প্রতি দয়া-ও সহানুভূতি প্রকাশ করতো। জবাবে তিনি বলতেন, আমি শিক্ষকদের মুখে শুনেছি :

إِنَّ الْعِلْمَ لاَ يُعْطِيْكَ بَعْضَهُ إِلاَّ إِذَا أَعْطَيْتَهُ نَفْسَكَ كُلَّهَا.

"জ্ঞানের কিছু অংশ তোমাকে কেবল তখনই দান করা হবে যখন তুমি তাকে নিজের সবটুকু দান করবে।"

এরপর তাঁর নাম ও খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র ও গুণমুগ্ধের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। প্রতিটি দিন তাঁর কাটে একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। দিনের একটি অংশ কাটে বাড়ীতে মায়ের সাথে এবং অপর অংশ কাটে মসজিদে নববীর জ্ঞান চর্চার হালকা ও মজলিসসমূহে। একই নিয়ম ও রীতিতে চলতে থাকেন দিনের পর দিন।

গ্রীষ্মের এক চন্দ্রালোকিত রাতে একজন অশ্বারোহী মুজাহিদ মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করলেন। বয়স তাঁর ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে। তিনি অশ্বের পিঠে বসেই সোজা তাঁর বাড়ীর দিকে যাচ্ছেন। তিনি জানেন না, এত দিন তাঁর বাড়ীটি ঠিক আছে, না কালের করাল গ্রাসে পরিণত হয়েছে। প্রায় তিরিশ বছর পর বা তার কাছাকাছি সময় হবে, তিনি সেই বাড়ী ছেড়ে যান। তিনি চলছেন, আর মনে মনে ভাবছেন তাঁর সেই যুবতী স্ত্রী ও তার গর্ভের সন্তানের কথা। তিনি ভাবছেন, সেই সন্তানটি কি ছেলে হয়েছিল, না মেয়ে? সে কি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, না মৃত? জীবিত থাকলে বর্তমানে তার অবস্থা কি? বুখারা, সমরকন্দ ও তার আশে-পাশের অঞ্চলসমূহে জিহাদে যাওয়ার সময় জীবনের প্রথম ভাগে প্রাপ্ত গনীমাতের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ স্ত্রীর হাতে দিয়ে যান, সে কথাও মনে মনে ভাবছেন।

মদীনার রাস্তাঘাট এখনো পূর্বের মত মানুষের চলাচলে সরব। মসজিদে নববীতে সবেমাত্র 'ঈশার সালাত শেষ হয়েছে। কিন্তু তিনি যাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন তাদের কেউ তাঁকে চেনে না। কেউ তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করছে না, এমনকি তাঁর উন্নত জাতের অশ্বটি ও কাঁধে ঝোলানো তরবারিটির দিকেও তাকাচ্ছে না। তখন ইসলামী বিশ্বের শহরগুলোতে মানুষ সদ্য রণাঙ্গন থেকে আগত মুজাহিদদের এমন দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ অশ্বারোহীকে পথচারীরা মোটেই গুরুত্ব না দেওয়ায় তিনি ভীষণ দুঃখ পেলেন। নানা কথা তাঁর মনে উঁকি দিচ্ছে। এভাবে ভাবনার সাগরে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ এক সময় তিনি নিজের বাড়ীর সামনে এসে পড়েন। বাড়ীর বাইরের দরজাটি খোলা ছিল। আনন্দের আতিশয্যে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে অশ্ব হাঁকিয়ে সোজা বাড়ীর ভিতরের আঙ্গিনায় পৌঁছে যান।

আঙ্গিনায় মানুষের উপস্থিতি বুঝতে পেরে বাড়ীর মালিক দোতলা থেকে উঁকি দিয়ে চাঁদের আলোতে দেখতে পান, একজন সশস্ত্র ব্যক্তি ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তিনি মনে করলেন,

হয়তো ডাকাতির উদ্দেশ্যে সে ঢুকেছে। গৃহ-স্বামীর যুবতী স্ত্রী আগন্তুক লোকটির দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করছেন। গৃহ-স্বামী রাগে-উত্তেজনায় খালি পেয়ে নীচে নেমে আসেন এবং হুংকার ছেড়ে বলেন : 'ওরে আল্লাহর দুশমন! রাতের অন্ধকারে আমার বাড়ীতে ডাকাতি করতে চাস?' –তিনি লোকটিকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিজের আস্তানায় আক্রান্ত বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। দু'জনের ধস্তা-ধস্তি ও হাঁক-ডাকে চারিদিক থেকে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। আগন্তুক লোকটিকে তারা ঘিরে ফেলে এবং যুবক গৃহ-স্বামী তাঁকে ধরে বেঁধে ফেলেন। চিৎকার করে তিনি বলতে থাকেন : ওহে আল্লাহর দুশমন! তোকে আমি ছাড়বো না। তোকে আমি কাজীর নিকট সোপর্দ করবো।

লোকটি বললো : আমি আল্লাহর দুশমন নই। আমি কোন অপরাধ করিনি। এতো আমার বাড়ী, এ বাড়ী আমার কেনা। বাড়ীর দরজা খোলা দেখে আমি ঢুকে পড়েছি। তারপর তিনি উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বলেন : ভায়েরা! আমার কথা একটু শুনুন! এ বাড়ী আমার, নিজের অর্থে এটি আমি কিনি। ভায়েরা! আমি ফাররূখ। প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন কেউ কি জীবিত নেই যে ফাররূখকে চেনে? যে ফাররূখ তিরিশ বছর পূর্বে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিল? গৃহ-স্বামীর মা ঘুমিয়ে ছিলেন। বাড়ীর আঙ্গিনায় শোরগোল শুনে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। উপর তলার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পান, তাঁর স্বামী দাঁড়িয়ে। আনন্দ ও বিস্ময়ে তাঁর কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন : তাঁকে ছেড়ে দাও। রাবী'আ! ছেড়ে দাও। আমার ছেলে! ছেড়ে দাও। ইনি তোমার পিতা। আমার প্রতিবেশী ভায়েরা! আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন। আপনারা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যান।

তারপর স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন, আবূ 'আবদির রহমান! এতক্ষণ আপনি যার সঙ্গে ধস্তা-ধস্তি করছিলেন, সে আপনার কলিজার টুকরো ছেলে।

কথাগুলো কানে যেতেই ফাররূখ দ্রুত রাবী'আর দিকে এগিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। রাবী'আও ফাররূখকে জড়িয়ে ধরে তাঁর হাত, মাথা, মুখে ও কাঁধে চুম দিতে থাকেন। প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিতা-পুত্রের এ মিলন দৃশ্য অবলোকন করে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে চলে গেল।

রাবী'আর মা নীচে নেমে আসলেন এবং স্বামীকে সালাম করলেন। তিরিশ বছর যাবত যাঁর সংগে কোন যোগাযোগ নেই, তাঁর সাথে যে এই পৃথিবীতে আবার দেখা হবে তা তিনি কখনো ধারণাই করতে পারেননি।

ফাররূখ তাঁর স্ত্রীর পাশে বসলেন। নিজের কথা বলতে লাগলেন, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু স্ত্রী সেসব কথা শোনার দিকে তেমন মন নেই। স্বামীকে ফিরে পাওয়া ও ছেলের সাথে পিতার সাক্ষাতের সব আনন্দ একটা ভয় ম্লান করে দিচ্ছে। তাঁর ভয় হচ্ছে, কখন না জানি তিনি তাঁর রেখে যাওয়া বিপুল অঙ্কের অর্থের কথা জিজ্ঞেস করে বসেন এবং কোথায় কিভাবে তা খরচ করা হয়েছে তা জানতে চান!

যাবার সময় তিনি বলে যান, হিসেব করে প্রয়োজন মত খরচ করবে। এখন তো সেই অর্থের কিছুই অবশিষ্ট নেই। একথা শোনার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হবে এবং তিনি কি তাঁর কথা বিশ্বাস করবেন? তিনি তো সে অর্থ তাঁর ছেলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করেছেন। ছেলের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ কি তিরিশ হাজার দীনারে পৌঁছবে? তিনি কি বিশ্বাস করবেন তাঁর ছেলের হাত বর্ষণরত মেঘের চেয়েও উদার? তাঁর ছেলের হাতে একটি দীনার ও দিরহামও থাকে না? গোটা মদীনা জানে, সে তাঁর বন্ধুদের জন্য হাজার হাজার দিরহাম খরচ করে।

রাবী'আর মা যখন এসব চিন্তায় নিমগ্ন তখন পাশে বসা তাঁর স্বামী বললেন : রাবী'আর মা! আমি তোমার জন্য আরো চার হাজার দীনার নিয়ে এসেছি। এখন পূর্বে রেখে যাওয়া দীনারগুলো বের কর এবং তার সাথে এগুলো মিলিয়ে রেখে দাও। তারপর এ অর্থ দিয়ে আমরা একটি বাগিচা অথবা ভূমি ক্রয় করবো। তাতে উৎপাদিত ফসল দ্বারা আমরা আমাদের বাকী জীবন স্বাচ্ছন্দে কাটিয়ে দেব।

রাবী'আর মা কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। স্বামী আবার তাগাদা দিয়ে বললেন : ওঠো তো, দেখি সেই অর্থ কোথায় রেখেছো? তার সাথে এইগুলো মিলিয়ে রাখি। তিনি বললেন : দীনারগুলো যেখানে রাখা উচিত সেখানেই রেখেছি। অল্প কিছুদিন পরেই আমি তা বের করবো ইনশাআল্লাহ।

মুআয্যিনের আযান ধ্বনি স্বামী-স্ত্রীর কথা বন্ধ করে দিল। ফাররূখ ওযু করার জন্য উঠে গেলেন। ওযু শেষ করে দ্রুত দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন : রাবী'আ কোথায়? বাড়ীর সবাই বলে উঠলো : আযানের প্রথম তাকবীর শোনা মাত্র সে মসজিদে চলে গেছে। আপনি জামা'আত পাবেন বলে আমাদের মনে হয় না।

ফাররূখ মসজিদে পৌঁছে দেখলেন, ইমাম সাহেব এই মাত্র নামায শেষ করেছেন। তিনি একাকী নামায আদায় করেন। তারপর এক পা, দু'পা করে রাসূলে কারীমের (সা) কবর শরীফের দিকে এগিয়ে যান এবং সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দুরূদ ও সালাম পেশ করেন। সেখান থেকে পবিত্র 'রাওজা'র'[২] দিকে যান দু'রাক'আত নামায আদায়ের জন্য। এ বাসনা তিনি দীর্ঘকাল চেপে রেখেছেন নিজের অন্তর মাঝে। একটি স্থান বেছে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন, তারপর অন্তর খুলে হাত উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন।

তিনি মসজিদ থেকে বের হতে যাবেন, তখন দেখলেন মসজিদের আঙ্গিনায় বিশাল এক 'ইল্‌মী মজলিস (জ্ঞান চর্চার আসর)। জ্ঞান চর্চার এমন আসর তিনি জীবনে আর কোন দিন দেখেননি। মানুষ শায়খকে কেন্দ্র করে একের পর এক সারি দিয়ে গোলাকৃতিতে বসে আছে। আঙ্গিনায় পা ফেলার জায়গা নেই। চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখেন, সেখানে পাগড়ী পরিহিত অনেক বয়স্ক শায়খ ও বহু সম্মানিত ব্যক্তিও বসে আছেন। তাঁদের

---

২. রাসূলুল্লাহর (সা) কবর ও তাঁর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান। (সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৪৯)

পোশাক দেখেই বুঝা যাচ্ছে তাঁরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ। বহু যুবক হাঁটু গেড়ে বসে আছে, হাতে তাদের কলম। শায়খের মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি কথা এমনভাবে লিখে নিচ্ছে যেন ছড়ানো মুক্তো তারা কুড়াচ্ছে। অতি মূল্যবান জিনিস যেভাবে সংরক্ষণ করা হয় সেভাবে তারা তাদের দফতরসমূহে শায়খের বাণী সংরক্ষণ করছে। শায়খ যেখানে বসে আছেন মানুষের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ। তারা সকলে নিরব-নিথর। শায়খের থেকে যারা দূরে তাদের নিকট শায়খের বাণী পৌঁছে দিচ্ছে একটু দূরে দূরে দাঁড়ানো একদল মুবাল্লিগ। তাঁরা শায়খের প্রতিটি কথা ধীরে ধীরে একটি একটি করে বাক্য জোরে জোরে উচ্চারণ করে দূরবর্তীদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে। ফাররূখ শায়খকে দেখার জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু সক্ষম হলেন না। কারণ, তাঁর অবস্থান তো মজলিসের শেষ প্রান্তে।

শায়খের চমৎকার বাচনভঙ্গি, অগাধ জ্ঞান ও বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি দেখে তিনি ভীষণ মুগ্ধ। তিনি আরো বিস্মিত তাঁর প্রতি মানুষের বিনয় ও ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখে।

অল্প কিছুক্ষণ পর শায়খ তাঁর মজলিস ভেঙ্গে দিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। শ্রোতারাও উঠে দাঁড়িয়ে হুড়মুড় করে তার দিকে এগিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরলো। তারপর তারা সকলে শায়খের পিছে পিছে গিয়ে তাঁকে মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

ফাররূখ তাঁর পাশে বসা লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো : অনুগ্রহ করে বলুন তো এ শায়খের পরিচয় কি? লোকটি বিস্ময়ের সুরে বললো : কি ব্যাপার, আপনি কি মদীনায় থাকেন না? বললেন : হাঁ, আমি মদীনায় থাকি। লোকটি বললো : মদীনায় এমন একজনও কি আছে যে, এই শায়খকে চেনে না? ফাররূখ বললেন : আমি যে তাঁকে চিনিনে এজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি প্রায় তিরিশ বছর মদীনার বাইরে ছিলাম। এই গতকাল মাত্র ফিরেছি। লোকটি বললো : ঠিক আছে, আমার কাছে কিছুক্ষণ বসুন, আমি আপনাকে শায়খ সম্পর্কে বলছি। তারপর লোকটি বললো : এই মাত্র যে শায়খের কথা শুনেছেন তিনি নেতৃস্থানীয় তাবি'ঈদের একজন এবং মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম। তিনি মদীনার মুহাদ্দিছ, ফকীহ এবং ইমাম। যদিও তিনি বয়সে একজন তরুণ।

ফাররূখ বললেন : মাশাআল্লাহ! লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

লোকটা বলতে লাগলো : আপনি তো দেখেছেন, তাঁর মজলিসে সমাবেশ ঘটে মালিক ইবন আনাস, আবূ হানীফা আন-নু'মান, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, 'আবদুর রহমান ইবন 'আমর আল-আওযা'ঈ, আল-লায়ছ ইবন সা'দ (রহ) ও আরো অনেকের।

ফাররূখ কিছু বলতে চাইলেন। তবে লোকটি তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে আবার বলতে লাগলেন : উপরন্তু তিনি একজন উন্নত চরিত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। দারুণ বিনয়ী ও দানশীল। মদীনাবাসীরা এমন উদার দানশীল মানুষ খুব কমই দেখেছে। দুনিয়ার ভোগ-ঐশ্বর্যের প্রতি উদাসীনতা এবং পরম আল্লাহ নির্ভরতা তাঁর চরিত্রের একান্ত বৈশিষ্ট্য।

ফাররূখ বললেন : কিন্তু তাঁর নামটি তো বললেন না। লোকটি বললো : ও, হ্যাঁ, তাঁর নাম রাবী'আতুর রা'য়।

ফাররূখ উচ্চারণ করলেন : রাবী'আতুর রা'য়!

লোকটি বললো : হ্যাঁ, তাঁর নাম রাবী'আ। তবে মদীনার 'আলিম ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ তাঁর নামের সাথে আর-রা'য় যোগ করে রাবী'আতুর রা'য় বলে থাকেন। কারণ, কোন মাসয়ালায় যখন তারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে সরাসরি কোন সমাধান খুঁজে পান না তখন তাঁরা রাবী'আর শরণাপন্ন হন। তিনি কিয়াসের মাধ্যমে এমন চমৎকার সমাধান দেন যে, সকল শ্রেণীর মানুষ সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

ফাররূখ বললেন : কিন্তু আপনি তো তাঁর পিতার নাম বললেন না।

লোকটি বললো : তিনি রাবী'আ ইবন ফাররূখ।

অর্থাৎ তাঁর পিতার নাম ফাররূখ। তবে তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম আবূ 'আবদির রহমান।

তাঁর পিতা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগের পর তাঁর জন্ম হয়। মা-ই তাঁকে লালন-পালন ও লেখাপড়া শেখান। নামাযের কিছুক্ষণ আগে আমি মানুষের মুখে শুনেছি গত রাতে তিনি বাড়ী ফিরেছেন।

এতটুকু শোনার পর ফাররূখের দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। লোকটি এর কারণ বুঝতে পারলো না। ফাররূখ বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। বাড়ীতে পৌঁছার পর রাবী'আর মা তাঁর চোখে পানি দেখে জিজ্ঞেস করেন : রাবী'আর আব্বা! আপনার কী হয়েছে?

বললেন : আমার কিছুই হয়নি, আমি ভালো আছি। মসজিদে আমার ছেলেকে জ্ঞান ও মর্যাদার যে আসনে আমি দেখেছি, এর আগে তেমন আর কাউকে দেখিনি।

সুযোগ বুঝে এবার রাবী'আর মা বললেন : সেই তিরিশ হাজার দীনার এবং আপনার ছেলের জ্ঞান ও মর্যাদার এই উচ্চাসন লাভ-এর কোনটি আপনার বেশি প্রিয়?

ফাররূখ বললেন : আল্লাহর কসম! দুনিয়ার সকল সম্পদ আমার হাতে থাকার চেয়ে ছেলের এই অবস্থানই আমার বেশি প্রিয়।

রাবী'আর মা বললেন : যে অর্থ আপনি রেখে গিয়েছিলেন তা সবই আমি আপনার এই ছেলের পিছনে ব্যয় করেছি। আমি যা করেছি তাতে কি আপনি খুশী?

বললেন : হ্যাঁ, আমি দারুণ খুশী।[৩]

রাবী'আর পরিচয়

রাবী'আর ডাকনাম আবূ 'উছমান, উপাধি আর-রায়। পিতা আবূ 'আবদির রহমান ফাররূখ। তিনি বানূ তাইম ইবন আল-জাররাহ-এর দাস ছিলেন। এই দাসের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে রাবী'আ পরবর্তীকালে জ্ঞানের জগতের উচ্চাসন অলঙ্কৃত করেন। একটি বর্ণনা মতে তাঁর পিতা বানূ মাররা গোত্রের আল-হুদাইর শাখার দাস ছিলেন।[৪]

---

৩. প্রাগুক্ত-১৩৫-১৫৪; তাহ্‌যীব আল-কামাল-৬/১৬৪-১৬৫

৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৬/১৬৬

তিনি ছিলেন মদীনার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম তাবি'ঈ। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা 'আলিম-মুহাদ্দিছগণ কর্তৃক স্বীকৃত ছিল। ইমাম নাওবী (রহ) লিখেছেন, তাঁর মহত্ত্ব, মর্যাদা, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠতার ব্যাপারে 'আলিম ও মুহাদ্দিছগণ একমত।[৫] ইমাম আয-যাহাবী (রহ) বলেন :[৬]

كان إماما حافظا فقيها مجتهدا بصيرا بالرأى ولذلك يقال له ربيعة الرأى.

"তিনি ছিলেন একাধারে হাদীছের হাফিজ, ফকীহ, মুজতাহিদ এবং বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। আর এ কারণে তাঁকে রাবী'আতুর রায় বা যুক্তিবাদী রাবী'আ বলা হয়। খতীব আল-বাগদাদী বলেন :[৭]

كان فقيها عالما حافظا للفقه والحديث.

"তিনি ছিলেন একজন ফকীহ, 'আলিম এবং ফিক্হ ও হাদীছের হাফিজ।" ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, 'আবদুল্লাহ আল-'ইজলী, আবূ হাতিম ও আন-নাসাঈ তাঁকে "ছিকা" বা বিশ্বস্ত বলেছেন। আর ইয়া'কূব ইবন শায়বা তাঁকে মদীনার মুফতী ও অত্যন্ত দৃঢ়পদ ব্যক্তি বলেছেন।[৮]

শিক্ষা

পিতার রেখে যাওয়া তিরিশ হাজার দীনার রাবী'আর মা তাঁর ছেলের শিক্ষার পিছনে ব্যয় করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। এ কারণে খুব দ্রুত শিক্ষা জীবন শেষ করেন। যৌবনের সূচনাতেই সেকালে প্রচলিত সকল শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। মাত্র ছাব্বিশ/সাতাশ বছর বয়সে তাঁর খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মানুষের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের উৎসে পরিণত হন।

হাদীছ

হযরত রাবী'আর (রহ) যে খ্যাতি তা প্রধানতঃ তাঁর ফিকহ্ শাস্ত্রে অতুলনীয় দক্ষতার কারণে। তবে তিনি হাদীছেরও একজন প্রথম শ্রেণীর হাফিজ ছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে হাদীছ ধারণের ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। আল্লামা ইবন সা'দ তাঁকে বিশ্বস্ত ও বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী বলেছেন। খতীব আল-বাগদাদী তাঁকে ফিকহ্ ও হাদীছের হাফিজ বলেছেন। আল্লামা যাহাবী বলেছেন, তিনি একজন ইমাম ও হাফিজে হাদীছ ছিলেন।[৯] হাদীছ বিষয়ে তাঁর অসামান্য দক্ষতা তার সমকালীনদের নিকট স্বীকৃত ছিল। একবার 'আবদুল 'আযীয ইবন আবী সালামা ইরাক গেলেন। ইরাকীরা তাঁকে বললো,

---

৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/১৫৯

৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৭

৭. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২১; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৭

৮. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৪

৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/২৫৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৭

আপনি কি রাবী'আ আর-রায় বা যুক্তিবাদী রাবী'আর হাদীছসমূহ শুনেছেন? তিনি বললেন, তোমরা যাঁকে যুক্তিবাদী রাবী'আ বলছো, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর চেয়ে সুন্নাহ বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ আর কাউকে দেখিনি।[১০] ইবনুল মাজেশূন বলেন :[১১]

ما رأيت أحدًا أحفظ لسنة من ربيعة.

'আমি রাবী'আর চেয়ে সুন্নাহ অধিক স্মৃতিতে ধারণকারী আর কাউকে দেখিনি।' বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ছিলেন রাবী'আর বিশেষ ছাত্র। তিনি তাঁর উস্তাদ রাবী'আর জীবদ্দশায়ই একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি স্বীয় উস্তাদের অনুপস্থিতিতে হাদীছের দারস দিতেন।[১২] এ দ্বারাও অনুমান করা যায় হাদীছ শাস্ত্রে হযরত রাবী'আর (রহ) স্থান কী ছিল।

সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে হযরত আনাস ইবন মালিক ও সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা) এবং তাবি'ঈদের মধ্যে হানজালা ইবন কায়স, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, ইবন আবী লায়লা, আ'রাজ, মাকহূল, 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (রহ) প্রমুখ মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন।

অন্যদিকে ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ, তাঁর ভাই ইবন 'আবদি রাব্বিহি, সুলায়মান আত-তায়মী, মালিক, শু'বা, সুফইয়ান ছাওরী, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনা, হাম্মাদ ইবন সালামা, লাইছ আওযা'ঈ, সুলায়মান ইবন বিলাল, ইসমা'ঈল ইবন জা'ফার, আনাস ইবন দামরা (রহ) প্রমুখের মত বড় বড় মুহাদ্দিছ তাঁর ছাত্র ছিলেন।[১৩]

ফিক্হ

ফিক্হ শাস্ত্রে ছিল হযরত রাবী'আর (রহ) বিশেষ ব্যুৎপত্তি। তিনি ছিলেন এ শাস্ত্রের একজন ইমাম ও মুজতাহিদ এবং খ্যাতিতে তাঁর সমকালীন অন্য সকলকে অতিক্রম করে যান। তাঁর ফিক্হ বিষয়ে দক্ষতার ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাবগত যোগ্যতা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তিনি দারুণ মেধাবী ও প্রতিভাবান ছিলেন। ইয়াহইয়া সা'ঈদ বলেন, আমি তাঁর চেয়ে বেশি সঠিক বুদ্ধির মানুষ আর দেখিনি।[১৪] এই অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তা তাঁর মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা সৃষ্টি করে দেয়। সুতরাং কিয়াস ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান বের করতে পারঙ্গম ছিলেন। এ কারণে তাঁকে যুক্তি ও বুদ্ধিবাদী অভিধায় ভূষিত করা হয়।[১৫]

ফিক্হ শাস্ত্রে এমন দক্ষতার কারণে তৎকালীন জ্ঞানের নগরী মদীনার ইফতার মসনদে আসীন হন। মুস'আব আয-যুবায়রী বলেন :

---

১০. তারীখু বাগদাদ/৮/৪২৪; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬

১১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৮; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৩৫

১২. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৩

১৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/২৫৮; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬

১৪. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৩; তাবি'ঈন-১২০

১৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৭

هو صاحب الفتوى بالمدينة. كان يجلس إليه وجوه الناس.

"তিনি মদীনার একজন মুফতী ছিলেন। বহু সম্মানীয় ব্যক্তি তাঁর ফাতওয়ার মজলিসে বসতেন।"[১৬]

আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর প্রথম খলীফা আবুল 'আব্বাস আস-সাফ্ফাহ্ তাঁকে ডেকে নিয়ে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন। ইমাম মালিক (রহ) ছিলেন তাঁর বিশেষ ছাত্র। প্রিয় উস্তাদের ইনতিকালের পর তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় :[১৭]

ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن أبى عبد الرحمن.

"এখন ফিক্হর মিষ্ট-মাধুর্য চলে গেল।" ইমাম আ'জম আবূ হানীফার (রহ) মত শ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং যুক্তি ও কিয়াস প্রয়োগকারী ব্যক্তিও রাবী'আর মজলিসে হাজির হতেন এবং তাঁর কথা ও সিদ্ধান্তসমূহ বুঝার চেষ্টা করতেন।[১৮]

ফাতওয়া দানে তাঁর সতর্কতা

ইজতিহাদ, যুক্তি ও কিয়াস প্রয়োগে এত ক্ষমতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কোন মাসয়ালায় যুক্তি ও কিয়াস প্রয়োগের ক্ষেত্রে দারুণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোন হাদীছের ভিত্তিতে ছাড়া জবাব দেওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না। 'আবদুল 'আযীয ইবন আবী সালামা বলেন, তিনি যখন অন্তিম রোগ শয্যায় তখন আমি একদিন তাঁকে বললাম আমরা আপনার নিকট থেকে বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান পেয়ে থাকি। অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ এমন সব মাসয়ালা জিজ্ঞেস করে যে বিষয়ে আমাদের নিকট কোন হাদীছ থাকে না, আর আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, উক্ত মাসয়ালায় আমাদের সিদ্ধান্ত তাদের সিদ্ধান্ত থেকে উত্তম হবে, এমন অবস্থায় আমরা কি আমাদের বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতে ফাতওয়া দিয়ে দেব? আমার কথা শুনে তিনি অন্যের সাহায্য নিয়ে উঠে বসলেন, তারপর বললেন : 'আবদুল 'আযীয, তোমাদের জন্য আফসোস! কোন মাসয়ালায় জ্ঞান ছাড়া জবাব দানের চেয়ে এটাই উত্তম যে তোমরা মূর্খ অবস্থায় মৃত্যু বরণ কর। কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন।[১৯]

তাঁর সমকালীন মনীষীদের মূল্যায়ন

হযরত রাবী'আর (রহ) সমকালীনদের মধ্যে তাঁর জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ছিল। 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার বলতেন : هو صاحب معضلاتنا وعالمنا وأفضلنا. "রাবী'আ ছিলেন আমাদের সকল জট উন্মোচনকারী, আমাদের 'আলিম এবং আমাদের সবার চেয়ে

---

১৬. প্রাগুক্ত-১/১৫৮; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬

১৭. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৬; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৭

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. তাহ্যীব আত-তাহযীব-৩/২৫৯; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৪, টীকা-১

উত্তম।"[২০] মু'আয ইবন মু'আয বলেন, সাওয়ার ইবন 'আবদিল্লাহ বলতেন, আমি রাবী'আর চেয়ে বড় কোন 'আলিমকে দেখিনি। আমি বললাম : হাসান 'আল-বসরী ও ইবন সীরীনকেও দেখেননি? বললেন : হাসান ও ইবন সীরীনকেও না।[২১] ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ বলতেন :[২২]

ما رأيت أحدًا أفطن من ربيعة بن عبد الرحمن.

"আমি রাবী'আ ইবন 'আবদির রহমানের চাইতে বেশি তীক্ষ্মধী আর কাউকে দেখিনি।"

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ যদিও তাঁর অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন, তবে বয়সে উভয়ে সমান ছিলেন। তিনিও দারস (পাঠ দান) ও ফাতওয়া দিতেন। তবে রাবী'আর (রহ) উপস্থিতিতে কখনো দারস দিতেন না।[২৩] সমকালীনদের মধ্যে তাঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গও ছিলেন। তাঁর শায়খগণও তাঁর অগাধ জ্ঞানের কথা অকপটে স্বীকার করতেন। তাঁর শায়খ কাসিম ইবন মুহাম্মাদ; যখন তাঁকে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হতো তখন যদি কুরআন ও হাদীছে তার জবাব পেয়ে যেতেন, নিজেই বলে দিতেন। অন্যথায় প্রশ্নকারীকে রাবী'আর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, তিনি ছিলেন একজন "ছিকা" বা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী।[২৪] ইমাম মালিক বলেন : কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ও সালিম ইবন 'আবদিল্লাহর (রহ) মৃত্যুর পর তাঁদের দু'জনের কাজের দায়িত্ব রাবী'আর উপর অর্পিত হয়।[২৫]

তাঁর দারসের মজলিস

তাঁর দারসের মজলিসে অসংখ্য মানুষের সমাগম হতো। মজলিসটি অত্যন্ত প্রশস্ত হতো। তাতে মদীনার বড় বড় 'আলিম, সরকারী কর্মকর্তা ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও শরীক হতেন। ইমাম মালিক, ইয়াহইয়া আনসারী, ইমাম আওযা'ঈ, শু'বা (রহ) প্রমুখের মত ব্যক্তিবর্গও সেখান থেকে ফায়দা হাসিল করতেন। খতীব আল-বাগদাদী বলেন, একবার গুনে দেখা গেল চল্লিশজন বড় বড় পাগড়ীধারী ব্যক্তি তার দারসের মজলিসে উপস্থিত আছেন।[২৬]

তাঁর ভোগ-বিলাস বিমুখ জীবন ও ইবাদাত-বন্দেগী

এত জ্ঞান ও বুদ্ধির সাথে সাথে তিনি একজন বড় 'আবিদ ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'আবদুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলাম বলেন :[২৭]

---

২০. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৩; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬
২১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৭
২২. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬
২৩. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৩; তাবি'ঈন-১২২
২৪. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬
২৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৮
২৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/২৫৯
২৭. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৭

مكث ربيعة دهرا طويلا عابدا يصلى الليل والنهار صاحب عبادة ثم نزع ذلك إلى أن جالس القوم فجالس القاسم فنطق بلب وعقل. وكان القاسم إذ سئل عن شئ، قال : سلوا هذا ـ لربيعة ـ قال : فان كان شيئا فى كتاب الله أخبرهم به القاسم أوفى سنة نبيه وإلا قال : سلوا هذا لربيعة ـ أو سالم.

"রাবী'আ একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইবাদাত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকেন। রাত-দিন নামায পড়তেন। কিন্তু পরে যখন দারসের মজলিসে, বিশেষতঃ কাসিম ইবন মুহাম্মাদের মজলিসে বসতে লাগলেন তখন যুক্তি ও বুদ্ধির সাথে কথা বলা আরম্ভ করলেন। কাসিমকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, এটা রাবী'আকে জিজ্ঞেস কর। প্রশ্নের জবাবটি যদি কিতাবুল্লাহ অথবা নবীর সুন্নাহ্তে পাওয়া যেত তাহলে তিনি বলে দিতেন, অন্যথায় বলতেন, রাবী'আ অথবা সালিমকে জিজ্ঞেস কর।"

ধন-সম্পদের প্রতি নির্মোহ ভাব

তিনি ধন-সম্পদ ও অর্থ-বিত্তের প্রতি দারুণ নির্মোহ স্বভাবের ছিলেন। খলীফা ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের কোন প্রকার দান-অনুগ্রহ গ্রহণ করাও পছন্দ করতেন না। একবার সম্ভবতঃ বিচারকের দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় খলীফা আবুল 'আব্বাস আস-সাফ্ফাহ-এর নিকট যান। তিনি তাঁকে সম্মানী হিসেবে কিছু অর্থ দিতে চান। তিনি বিনয়ের সাথে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর সাফ্ফাহ্ তাঁকে দাসী ক্রয় করার নাম করে পাঁচ হাজার দিরহাম দিতে চান, তিনি তাও গ্রহণ করেননি।[২৮] অপরদিকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। উদার হস্তে দান করতেন। বন্ধু-বান্ধব, তাদের ছেলে-মেয়ে এবং সাধারণ প্রার্থীদের জন্য তাঁর অর্থ-সম্পদ ছিল নিবেদিত।[২৯] ইবন ওয়াহাব বলেন :[৩০]

إن ربيعة كان من الأجواد أنفق على إخوانه أربعين ألف دينار.

'রাবী'আ ছিলেন একজন অন্যতম দানশীল ব্যক্তি। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য তিনি চল্লিশ হাজার দীনার ব্যয় করেন।'

বাগ্মিতা

রাবী'আ ছিলেন একজন বাগ্মী ব্যক্তি। চমৎকার প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতেন। তিনি যখন কথা বলতেন শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনতো। কথাও বলতেন বেশি। তিনি বলতেন :[৩১]

---

২৮. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৫; ইবন কুতায়বা : আল-মা'আরিফ-২১৭

২৯. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৭; তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৪

৩০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৭

৩১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১০২

السا كت بين النائم والأخرس.

"চুপচাপ ব্যক্তির অবস্থান ঘুমন্ত ও বোবা ব্যক্তির মধ্যবর্তী স্থানে।"

তিনি সব সময় কথা বলতেন। একদিন নিজের মজলিসে বসে কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় একজন মরুবাসী বেদুঈন এসে বসে এবং দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ তাঁর মিষ্টি-মধুর কথা শুনতে থাকে। রাবী'আ বুঝলেন, লোকটি তাঁর বাগ্মিতায় জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সেকালে বেদুঈনদের অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষা- বিশুদ্ধতা সর্বজন স্বীকৃত ছিল। সম্ভবতঃ রাবী'আ তার মুখ থেকে নিজের ভাষার প্রশংসা শোনার জন্য তাকে প্রশ্ন করেন : তোমাদের নিকট ভাষা-অলঙ্কারের সংজ্ঞা কি? সে জবাব দেয় : অল্প কথায় ভাব প্রকাশ করা। রাবী'আ আবার তাকে প্রশ্ন করেন : বাগ্মিতার অক্ষমতা কাকে বলে? বেদুঈন জবাব দেয় : যাতে আপনি নিজে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তার এমন চমৎকার জবাব শুনে রাবী'আ লজ্জা পেলেন।[৩২]

আল্লাহ বলেন :[৩৩]

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ.

'আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি 'আরশে সমাসীন হন।'

সেকালে আল্লাহর 'আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি নিয়ে দার্শনিক বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়। যেমন, তিনি তাঁর সৃষ্টির মত মুজাস্‌সাম বা দেহ বিশিষ্ট কিনা, তিনি স্থান-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ কিনা ইত্যাদি। এ বিতর্ক পরবর্তীতে অনেক দিন পর্যন্ত চলে। একবার রাবী'আর (রহ) নিকট আল্লাহর 'আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টির ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তিনি বলেন :[৩৪]

الإستواء غير مجهول وللكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق.

"সমাসীন হওয়ার বিষয়টি অজানা নয়, তবে তার প্রকৃতিটা বোধগম্য নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকেই রিসালাত হয় এবং রাসূলের দায়িত্ব পৌঁছানো, আর আমাদের কর্তব্য বিশ্বাস করা।"

---

৩২. প্রাগুক্ত; ওয়াফায়াত আল-আ'য়ান-১/১৮৩

৩৩. সূরা আস-সাজদা-৪; আল-ফুরকান-৫৯

৩৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৫৮

মৃত্যু

তাঁর মৃত্যু সন ও স্থান নিয়ে একটু মত পার্থক্য আছে। হাফিজ আবূ বাকর ইবন ছাবিত বলেন, প্রথম আব্বাসীয় খলীফা আবুল 'আব্বাস আস-সাফ্ফাহ্ তাঁকে কাজী হিসেবে নিয়োগ দানের জন্য আল-আনবারে ডেকে পাঠান। তিনি সেখানে যান। তাই বলা হয় তিনি সেখানে মৃত্যু বরণ করেন। ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন ও আবূ দাঊদ আল-আনবারে তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছেন। ইবন সা'দ বলেন, আল-ওয়াকিদী আমাকে যে তথ্য দিয়েছেন সে মতে তিনি হিজরী ১৩৬ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন। আর তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে এরূপ কথাই বলেছেন ইবরাহীম ইবন আল-মুনযির, ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন ও আরো অনেকে। তবে ইবন হিব্বান তাঁর 'আছ্-ছিকাত' গ্রন্থে হিজরী ১৩৩ এবং আল-রাজী ইমাম আল-বুখারীর সূত্রে হিজরী ১৪২ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছেন।[৩৫]

---

৩৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/২২৪; সাফওয়াতুস সাফওয়া-২/৮৩-৮৬; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৭; আল-মা'আরিফ-২১৭

ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'ঈদ (রহ)

ইয়াহ্ইয়ার (রহ) পিতার নাম সা'ঈদ এবং দাদা কায়স (রা) ইবন 'আমর আল-আনসারী। ডাকনাম আবূ সা'ঈদ।[১] মদীনার বিখ্যাত আনসার গোত্র বানূ নাজ্জারের সন্তান। ইবন আল-মাদীনী তাঁর ডাকনাম আবূ নাসর বলেছেন।[২] তাঁর দাদা কায়স (রা) ছিলেন একজন বদরী সাহাবী।[৩] ইবন সা'দ বলেন, তাঁর মা ছিলেন 'উম্মু ওয়ালদ'।[৪] উল্লেখ্য যে, মনীবের সন্তান জন্মদাত্রী দাসীকে বলে 'উম্মু ওয়ালাদ' বা সন্তানের মা। ইসলামী বিধান মতে এরূপ দাসীকে বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যায় না।

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান ও মনীষায় তিনি ছিলেন সমকালীন বিশিষ্ট তাবি'ঈদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জ্ঞানের প্রগাঢ়তার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা, শ্রেষ্ঠতা এবং ইমাম হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে সকলের ইজমা' বা ঐকমত্য আছে।[৫] ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে হাদীছের হাফিজ ও শায়খুল ইসলাম বলে উল্লেখ করেছেন।[৬]

হাদীছ

ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'ঈদ (রহ) সেই যুগের একজন মহান ব্যক্তিত্ব যখন সাহাবায়ে কিরামের (রা) পুণ্যময় যুগ শেষ হতে চলেছিল। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা তখনো জীবিত ছিলেন তাঁদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ গ্রহণে কোন রকম ত্রুটি করেননি। সাহাবা ও উঁচু স্তরের তাবি'ঈন কিরামের মধ্যে যাঁদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন ও যাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেন তাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন : আনাস ইবন মালিক (রা), সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন রাবী'আ, আবূ উমামা সাহল ইবন হুনায়ফ, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর আস-সিদ্দীক (রা), আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র (রা) সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহ) প্রমুখ।[৭]

---

১. আল-বুখারী, আত-তারীখ আল-কাবীর-৮/২৯৮

২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৭; তাহ্যীব আল-কামাল-১১/১৯৪

৩. আত-তারীখ আল-কাবীর-৮/২৯৮

৪. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/১০৬

৫. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৫৪

৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩৬

৭. তাহ্যীব আল-কামাল-১১/১৯৪; ২০/১০৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৬৮

উল্লেখিত মহান ব্যক্তিদের উদারতা ইয়াহইয়াকে হাদীছের একজন শ্রেষ্ঠ হাফিজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইবন সা'দ বলেন :

كان ثقة كثير الحديث حجة ثبتا.

"তিনি ছিলেন অতি বিশ্বস্ত বহু হাদীছের ধারক-বাহক, হুজ্জাত (দলীল-প্রমাণ) ও দৃঢ়পদ।"[৮] 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক (রহ) তাঁকে হাদীছের শ্রেষ্ঠ হাফিজদের মধ্যে গণ্য করতেন। মদীনার দু'ব্যক্তি এমন ছিলেন, যাঁদের দ্বারা মাদীনাতুর রাসূল (রাসূলের নগরী)-এর সকল সুন্নাহ্ সংরক্ষিত হয়। তাঁদের একজন আয-যুহরী ও অন্যজন ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ। সে সময় যদি এ দু'মনীষীর জন্ম না হতো তাহলে হয়তো বহু সুন্নাহ্ হারিয়ে যেত।[৯] ইবন 'উয়ায়না (রহ) বলেন :[১০]

كان محدثوا الحجاز : ابن شهاب ويحيى بن سعيد وابن جريج يجيئون بالحديث على وجهه.

"হিজাযের মুহাদ্দিছ ছিলেন ইবন শিহাব, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ও ইবন জুরায়জ। তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে হাদীছ সংগ্রহ করতেন।" আবদুর রহমান ইবন আবী হাতিম তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ইমাম আয-যুহ্রীর সমকক্ষ মনে করতেন।[১১] সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) বলেন : মদীনাবাসীদের নিকট ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদের স্থান ছিল আয-যুহ্রীর উপরে।[১২] ইয়াহইয়া আল-কাত্তান বলতেন :[১৩]

هو مقدم على الزهرى، أختلف على الزهرى ولم يختلف عليه.

"তিনি (ইয়াহইয়া) আয-যুহ্রীর উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কারণ, আয-যুহ্রীর ব্যাপারে মানুষের মতপার্থক্য আছে, কিন্তু তাঁর ব্যাপারে নেই।"

'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক (রহ) বলেন, সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) বলতেন :[১৪]

حفاظ الناس أربعة : إسماعيل بن أبى خالد وعاصم الأحول ويحيى بن سعيد الأنصارى وعبد الملك بن أبى سليمان.

"মানুষের মধ্যে হাদীছের হাফিজ চারজন : ইসমা'ঈল ইবন আবী খালিদ, 'আসিম আল-আহওয়াল, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী ও 'আবদুল মালিক ইবন আবী সুলায়মান।" অপর একটি বর্ণনায় তিনজনের কথা এসেছে। তাতে 'আসিম আল-

---

৮. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/১৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৭

৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৭৪

১০. আত-তারীখ আল-কাবীর-৮/২৯৮; তাহ্যীব আল-আসমা'-২/১৭

১১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৭

১২. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/১০৭

১৩. প্রাগুক্ত-২০/১০৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৭

১৪. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/১০৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৭২

আহওয়ালের নামটি নেই। 'আলী আল-মাদীনী বলেন : উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের পরে মদীনায় ইবন শিহাব, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ, আবুয যানাদ ও বুকাইর ইবন 'আবদি'র চেয়ে বেশি জানা ব্যক্তি কেউ নেই।[১৫]

জারীর ইবন 'আবদিল হামীদ বলেন : আমি তাঁর চেয়ে বেশি ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষ আর দেখিনি।[১৬]

ইসমা'ঈল ইবন ইসহাক আল-কাজী বলেন, আমি 'আলী ইবন আল-মাদীনীকে একথা বলতে শুনেছি যে, যাঁরা সাহীহ হাদীছের ধারক-বাহক, অতিশয় বিশ্বস্ত এবং যাঁদের বর্ণিত হাদীছ দোষ-ত্রুটিমুক্ত তাঁরা হলেন : বসরার আইউব, কূফার মানসূর, মদীনার ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ এবং মক্কার 'আমর ইবন দীনার।[১৭]

ইমাম আল-বুখারী (রহ) 'আলী ইবন আল-মাদীনীর সূত্রে বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা প্রায় তিনশো (৩০০)।[১৮] তবে ইয়াযীদ ইবন হারূন বলেন :[১৯]

حفظت ليحيى بن سعيد ثلاثة آلاف حديث فمرضت فنسيت نصفها.

"আমি ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদের তিন হাজার হাদীছ মুখস্থ করি। তারপর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে অর্ধেক ভুলে যাই।"

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) বলতেন :[২০]

يحيى بن سعيد أثبت الناس. - "ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দৃঢ়পদ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।"

ছাত্র-শিষ্যবৃন্দ

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন : হিশাম ইবন 'উরওয়া, হুমায়দ আত-তাবীল, ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন উসামা, ইবন জুরায়জ, আল-আওযা'ঈ, মালিক ইবন আনাস, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, হাম্মাদ, লাইছ, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক, শু'বা, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-উমাবী (রহ) প্রমুখ হাদীছ বিশারদ। সকলে তাঁর বিশ্বস্ততা, মনীষা ও জ্ঞানের জগতে নেতৃত্বের কথা বলেছেন।[২১] ইমাম আয-যুহ্‌রী, ইবন আবী যি'ব, শু'বা, মালিক ইবন আনাস, হাম্মাদ,

---

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-২/১৭

১৭. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২/১০৮

১৮. প্রাগুক্ত-২০/১০৬

১৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৭৪

২০. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-২/১৭

২১. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২০/১০০-১০৬

সুফইয়ান আছ-ছাওরী, 'আবদুল 'আযীয আল-মাজিশূন, লাইছ ইবন সা'দ, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না প্রমুখের মত সর্বজন স্বীকৃত হাদীছ বিশারদ তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২২]

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, একবার মদীনা থেকে আমাদের নিকট আইউব আস-সাখতিয়ানী আসলেন। আমরা বললাম, মদীনায় আপনি কাকে স্থলাভিষিক্ত করে এসেছেন? বললেন :[২৩]

ما خلفت بها أحدا أفقه من يحيى بن سعيد الأنصارى.

"ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারীর চেয়ে বড় কোন ফকীহকে আমি মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে আসিনি।"

ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের বড় সনদ এই যে, তিনি মাদীনাতুর রাসূলের, যা সেই সময়ে ফকীহ্‌দের আকর বলে খ্যাত ছিল, কাজী ছিলেন।[২৪] মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের সময়ে হজ্জ মওসুমে মক্কার মাসজিদুল হারামে ঘোষক চিৎকার করে ঘোষণা করতো :[২৫]

لايفتى الحاج فى المسجد إلا يحيى بن سعيد وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس.

"ইয়াহইয়া সা'ঈদ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ও মালিক ইবন আনাস– এ তিনজন ছাড়া আর কেউ হাজীদেরকে ফাতওয়া দিতে পারবে না।" হাম্মাদ আল-'আজলী বলেন :[২৬]

كان يحيى بن سعيد رجلا صالحا فقيها ثقة.

"ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ, ফকীহ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি।"

কাজীর পদে

প্রথমে তিনি মদীনার কাজী ছিলেন।[২৭] আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর তাঁকে 'কাজী আল-কুজাত' তথা প্রধান কাজীর সুউচ্চ পদে নিয়োগ দান করেন। মতান্তরে তাঁকে হাশিমিয়ার কাজী নিয়োগ করা হয়। একথাও বর্ণিত আছে যে, বাগদাদের কাজীর পদেও তিনি নিয়োগ লাভ করেন।[২৮]

বিভিন্ন বিষয়ে মুফতী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতপার্থক্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সহনশীল। তিনি বলতেন :[২৯]

---

২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৬৯

২৩. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২০/১০৭; তাহ্‌যীব আল-আসমা'-২/১৭

২৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৩৭

২৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৭৪

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. আত-তারীখ আল-কাবীর-৮/২৯৮

২৮. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২০/১০২; তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/১৫৩

২৯. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৩৯

أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا ويحرِّم هذا، فلايعيب على هذا ولاهذا على هذا.

"জ্ঞানী ব্যক্তিরা অত্যন্ত উদার ও প্রশস্ত মনের মানুষ। বিভিন্ন মাসয়ালায় মুফতীদের সব সময় মতপার্থক্য হয়ে থাকে। একজন এটাকে হালাল বললে অন্যজন হারাম বলেন। তবে কেউ কারো প্রতি কখনো দোষারোপ করেন না।" বর্তমানকালে ইসলামী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে যখন একজন আরেকজনকে হেয় ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যান তখন ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদের উপরোক্ত কথাটি সকলের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে।

আর্থিক অবস্থা

মদীনায় অবস্থানকালে তাঁর আর্থিক অবস্থা দারুণ অসচ্ছল হয়ে পড়েছিল। ভীষণ টানাটানির মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছিলেন। ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, জীবনের এমন একটি সংকীর্ণ পর্যায়ে খলীফা মানসূর তাঁকে কাজী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। অতঃপর তাঁর অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয়। তিনি ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হন।[৩০] তবে মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী বলেন ভিন্ন কথা। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। খলীফা মানসূর তাকে কাজী নিয়োগ করলেন। তারপরেও তাঁর অবস্থার কোন পরিবর্তন হলো না। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন : যার এ 'নাফ্স' বা আত্মা একটি, অর্থবিত্ত তার অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে না।[৩১]

মালিক ইবন আনাস বলতেন, একমাত্র ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ছাড়া আমাদের এখান থেকে যিনিই ইরাক গেছেন তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কেবল তিনি যে অবস্থায় গেছেন সেই অবস্থায় ফিরে এসেছেন।

তিনি অত্যন্ত আল্লাহ নির্ভর মানুষ ছিলেন। পার্থিব কোন প্রয়োজনে মানুষের নিকট চাওয়ার মানসিকতা তাঁর মোটেই ছিল না। তিনি নিজের জীবনের একটি ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, একবার আমি আফ্রিকা থাকাকালে পার্থিব কিছু প্রয়োজন অনুভব করলাম এবং তা পূরণের জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম। তারপর আমি আমার এ কাজের জন্য লজ্জিত হলাম। মনে মনে বললাম : আমার এ দু'আ যদি আখিরাতের কোন প্রয়োজনের জন্য হতো তাহলে কতনা সুন্দর হতো! বিষয়টি আমি আমার এক বন্ধুকে বললাম। তিনি বললেন : তোমার এ কাজকে খারাপ মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ, দু'আর অসীলায় আল্লাহ তাঁর কোন বান্দার প্রয়োজন পূরণ করে দিতে পারেন। আর এ দু'আর অনুমতি তাকে দান করা হয়েছে।[৩২]

---

৩০. প্রাগুক্ত-১/১৩৮

৩১. সিয়ারু আ'লাম আনু-নুবালা'-৫/৪৭৫

৩২. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/১১০

জারীর ইবন 'আবদিল হামীদ বলেন : একবার আমি ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনি যে সকল সাহাবী ও তাবি'ঈর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, আবূ বাকর, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা) সম্পর্কে তাঁদের মতামত কী ছিল? বললেন : আবূ বাকর ও 'উমারের (রা) মর্যাদার ব্যাপারে তাঁদের কোন মতপার্থক্য ছিল না। তাঁদের মতের ভিন্নতা ছিল 'উছমান ও 'আলীর (রা) ব্যাপারে।[৩৩]

সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হিজরী ১৪৩ সনে তিনি হাশিমিয়ায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল সত্তরের উর্ধ্বে।[৩৪]

---

৩৩. প্রাগুক্ত-২০/১০৭

৩৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৭৫; আত-তারীখ আল-কাবীর-৮/২৯৮; তাহ্যীব আল-কামাল-২০/১০০

ইসমা'ঈল ইবন আবী খালিদ আল-আহমাসী (রহ)

ইসমা'ঈলের ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। পিতার ডাকনাম আবূ খালিদ, তবে তাঁর আসল নামের ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। যেমন : সা'দ, হুরমুয ও কাছীর। তিনি কূফার আল-বাজালা গোত্রের আল-আহমাস শাখার দাস ছিলেন, তাই তাঁকে 'আল-আহমাসী আল-কূফী' বলা হয়। ইসমা'ঈলের চার ভাই হলেন : আশ'আছ, খালিদ, সা'ঈদ ও আন-নু'মান।[১] ইবন সা'দের বর্ণনামতে তিনি মোট ছয়জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনাও করেছেন। সেই মহান সাহাবীগণ হলেন : তাঁর পিতা আবূ খালিদ, আনাস ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা, আবূ কাবিল, আবূ জুহায়ফা ও 'আমর ইবন আল-হুওয়ায়রিছ (রা)।[২] তবে আবূ নু'আঈমের বর্ণনামতে তিনি বারো জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন।[৩] 'আলী আল-মাদানী বলেন :

رأى أنسًا روية ولم يسمع منه.

"তিনি আনাসকে একবার দেখেন, তবে তাঁর মুখ থেকে কোন হাদীছ শোনেননি।"[৪] তিনি পেশায় ছিলেন 'طَحَّان'- শস্য চূর্ণকারী বা পেষণকারী।[৫]

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি একজন উঁচু স্তরের তাবি'ঈ ছিলেন। ইমাম আশ-শা'বী (রহ) বলেন :

إسماعيل هذا يزد رد العلم ازد رادا.

"এই ইসমা'ঈল জ্ঞান একবারেই গিলে ফেলেন।" অপর একটি বর্ণনামতে তিনি বলেন : ابن أبى خالد يشرب العلم شربًا. - "ইবন আবী খালিদ (ইসমা'ঈল) জ্ঞান একবারেই পান করেন।"[৬] ইমাম আন-নাওবী (রহ) বলেন : তাঁর শ্রেষ্ঠতা, মর্যাদা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে।"[৭]

হাদীছ

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) বলেন : كان حجة

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-২/১৫৬

২. আত-তাবাকাত-২/২৪০

৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/২৯২

৪. আত-তাহ্যীব-১/২৫৫

৫. তাহ্যীব আল-কামাল-২/১৫৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৩

৬. প্রাগুক্ত

৭. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১২১

متقنا مكثرا عالما. –"তিনি ছিলেন (হাদীছ শাস্ত্রের) একজন হুজ্জাত বা দলীল-প্রমাণতুল্য, দারুণ দক্ষ ও বহু হাদীছ ধারণ ও বর্ণনাকারী 'আলিম।"[৮] ইমাম সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) বলেন : হাফিজে হাদীছ মাত্র চারজন। ইসমা'ঈল তাঁদের একজন। অন্যরা হলেন : 'আবদুল মালিক ইবন আবী সুলায়মান, 'আসিম আল-আহওয়াল ও ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী।[৯] অপর একটি বর্ণনায় তিনজনের কথা এসেছে। তাতে 'আসিম আল-আলওয়াল বাদ পড়েছেন।[১০] আবু হাতিম আস-সিজিস্তানী ইমাম আশ-শা'বীর (রহ) সংগী-সাথীদের কাউকে ইসমা'ঈলের উপর প্রাধান্য দিতেন না।[১১] তাঁর সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, লোকে তাঁকে "মীযান" (তুলাদণ্ড) বলতো।[১২] আহমাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-'ইজলী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন :[১৩]

"كوفى،تابعِيٌ، ثقة، وكان رجلا صالحا، وسمع من خمسة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، وكان طحانا."

"তিনি কূফার অধিবাসী, একজন তাবি'ঈ ও অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন সৎকর্মশীল মানুষ। রাসূলুল্লাহর (সা) পাঁচজন সাহাবীর মুখ থেকে হাদীছ শুনেছেন। পেশায় তিনি একজন "তাহ্হান" বা শস্য চূর্ণকারী।" মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-মাসিলী বলেন :[১৪]

"حجة إذا لم يكن اسماعيل حجّةً فمن يكون حجة."

"তিনি একজন হুজ্জাত তথা দলীল-প্রমাণতুল্য মানুষ। তিনি যদি হুজ্জাত না হন, তবে হুজ্জাত হবে কে?"

সাহাবী ছাড়া অন্য যাঁদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং যাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্য থেকে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো :

ইসমা'ঈল ইবন 'আবদির রহমান আস-সুদ্দী, ভাই আশ'আছ ইবন আবী খালিদ, 'আমর ইবন হুরায়ছ-এর দাস আসবাগ, আল-হারিছ ইবন শুবায়ল আল-আহমাসী, হাকীম ইবন জাবির আল-আহমাসী, ভাই খালিদ ইবন আবী খালিদ, যাকওয়ান ইবন আবী সালিহ আস-সাম্মান, যুবায়র ইবন 'আদী, যির্রু ইবন হুবায়শ আল-আসাদী, যায়দ ইবন

---

৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৩
৯. আত-তাবাকাত-২/২৪০
১০. তাহ্যীব আল-কামাল-২/১৫৮
১১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/২৯১
১২. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/১২১
১৩. তাহ্যীব আল-কামাল-২/১৫৮, ১৫৯
১৪. প্রাগুক্ত

ওয়াহাব আল-জুহানী, ভাই সা'ঈদ ইবন আবী খালিদ, সালামা ইবন কুহায়ল, শুবায়ল ইবন 'আওফ আল-আহমাসী, তালহা ইবন আল-'আলা' আল-আহমাসী, তালহা ইবন মুসার্‌রিফ, 'আমির আশ-শা'বী, 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবী আওফা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'ঈসা, 'আবদুল্লাহ আল-বাহী, 'আবদুর রহমান ইবন 'আয়িয, 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, 'আতা' ইবন আস-সায়িব, 'আমর ইবন হুরায়ছ আল-মাখযূমী, আবূ ইসহাক 'আমর ইবন 'আবদিল্লাহ আস-সুবা'ঈ, কায়স ইবন আবী হাযিম, মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্‌কাস (রা), আবূ দাউদ আল-আ'মা, আবূ বাকর ইবন 'উমারা, পিতা আবূ খালিদ আল-আহমাসী ও আরো অনেকে।

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাঁর সনদে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন :

ইবরাহীম ইবন হুমায়দ আর-রুআসী, জারীর ইবন 'আবদিল হামীদ, জা'ফার ইবন 'আওন, হাফ্‌স ইবন গিয়াছ, আল-হাকাম ইবন 'উতায়বা, আবূ উসামা হাম্মাদ ইবন উসামা, খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-ওয়াসিতী, যায়িদা ইবন কুদামা, যুহায়র ইবন মু'আবিয়া, সা'দান ইবন ইয়াহইয়া আল-লাখমী, সা'ঈদ ইবন আন-নাদর আল-কূফী, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, শুরাইক ইবন 'আবদিল্লাহ আন-নাখা'ঈ, শু'বা ইবন আল্‌-হাজ্জাজ, 'আব্‌বাদ ইবন আল-'আওয়াম, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক, 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, 'উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা, 'ঈসা ইবন ইউনুস, মালিক ইবন মিগওয়াল, মুহাম্মাদ ইবন বিশর আল-'আবদী, আবূ মু'আবিয়া মুহাম্মাদ ইবন খাযিম আদ-দারীর, মুহাম্মাদ ইবন খালিদ আল-ওয়াহ্‌বী, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ আল-ওয়াসিতী, মারওয়ান ইবন মু'আবিয়া আল-ফাযারী, মু'তামির ইবন সুলায়মান, হুশায়ম ইবন বাশীর, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, ইয়াযীদ ইবন হারূন (রহ) ও আরো অনেকে।[১৫]

ইবন আল-মাদানীর মতে ইসমা'ঈলের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা তিনশো– একথা ইমাম আল-বুখারী বলেছেন।[১৬] তবে আল-'ইজলীর বর্ণনামতে পাঁচশো'র কাছাকাছি।[১৭]

'ইলমের সাথে তাঁর মধ্যে 'আমলও ছিল। ইমাম আয-যাহাবী বলেন :[১৮]

وكان من العلماء العاملين.

'তিনি ছিলেন বা-'আমল তথা আমলকারী 'আলিমদের একজন।' ইবন হিব্বান বলেন : তিনি ছিলেন একজন সৎকর্মশীল ও সত্যনিষ্ঠ শায়খ বা জ্ঞানী ব্যক্তি।[১৯]

---

১৫. প্রাগুক্ত-২/১৫৭-১৫৮; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/২৯১

১৬. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২/১৫৯; তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/১৩১

১৭. তাহ্‌যীব আত-তাহযীব-১/২৯৩

১৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৫৪

১৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/২৯২

ইসলামের ইতিহাসে আলিমদের এ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, তাঁরা তাঁদের জ্ঞানকে জীবিকা ও অর্থ উপার্জনের উপায় ও উপকরণে পরিণত করেননি। ইসমা'ঈলও তাঁর অর্জিত জ্ঞান কোন পেশায় পরিণত করেননি। আটা পেষার চাক্কি ঘুরিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।[২০]

হিজরী ১৪৫, মতান্তরে ১৪৬ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[২১]

---

২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৩; তাহ্যীব আল-কামাল-২/১৫৯

২১. প্রাগুক্ত; আল-[illegible] ওয়াত তাবয়ীন-৩/১২৯, টীকা-৭।

'ইকরিমা মাওলা 'আবদিল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা)

হযরত 'ইকরিমা (রহ) মরক্কোর বারবার বংশোদ্ভূত এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) একজন প্রতিভাবান দাস। প্রথমে তিনি হুসায়ন ইবন আল-হুর আল-'আনবারীর দাসত্বে ছিলেন এবং হুসায়ন তাঁকে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসকে (রা) দান করেন। 'ইকরিমার বয়স তখন অল্প। এ কারণে তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন এবং তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কল্যাণে এত উঁচু মানে উন্নীত হন যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব অনেক বড় বড় মুক্ত-স্বাধীন 'আলিমের জন্য ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'ইকরিমার ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ।[১]

শিক্ষা

হযরত 'ইকরিমার মধ্যে স্বভাবগতভাবে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা ও আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিল। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তিনি বলেন, যখন আমি বাজারে যেতাম এবং কোন কথা শুনতাম তখন আমার জন্য জ্ঞানের পঞ্চাশটি দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেত।[২] এমন উপযুক্ত স্বভাব-প্রকৃতির সাথে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) মত জ্ঞানের সাগর ও স্নেহশীল মনিবও তিনি পেয়ে যান। তিনি অত্যধিক শ্রম ও সাধনা ব্যয় করে তাঁকে শিক্ষা দেন।[৩] জ্ঞানের প্রতি 'ইকরিমার পিপাসা এত তীব্র ছিল যে, সারা জীবনেও পরিতৃপ্ত হননি। একাধারে চল্লিশ বছর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন।[৪] তিনি বলতেন ঃ

طلبت العلم أربعين سنة، وكنت أفتى بالباب وابن عباس فى الدار.

'আমি চল্লিশ বছর জ্ঞান অর্জন করেছি। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) গৃহে অবস্থান কালেও আমি দরজায় বসে ফাতওয়া দিতাম।'[৫]

জ্ঞান ও মনীষা

তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ-উদ্যোগ এবং মনিব হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) তদারকিতে তিনি জ্ঞানের সাগরে পরিণত হন। ইবন সা'দ লিখেছেন : তিনি জ্ঞানের সমুদ্রসমূহের মধ্যে একটি সমুদ্র ছিলেন।[৬] ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে حَبْرُ الْعَالَمِ তথা বিশ্বের তত্ত্বজ্ঞানীর

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৩/১৬৩

২. তাবাকাত-৫/২১৩

৩. প্রাগুক্ত; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৩১৯

৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৪

৫. তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৬৬

৬. তাবাকাত-৫/২১৬

উপাধিতে উল্লেখ করেছেন।[৭] তাঁর সময়ে কোন দাস তো দূরের কথা অভিজাত ঘরের সন্তানদেরও কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তাফসীর, হাদীছ, ফিক্‌হ তথা সকল ইসলামী জ্ঞানে তিনি ইমাম পদ-মর্যাদা লাভ করেন।

তাফসীর

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা) তাফসীরের এত বড় 'আলিম ছিলেন যে, খুব কম সংখ্যক সাহাবীই এ ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষতা দাবী করতে পারতেন। তিনি ছিলেন 'রঈসুল মুফাস্‌সিরীন বা মুফাস্‌সিরগণের নেতা। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ ও শ্রম দিয়ে 'ইকরিমাকে তাফসীরের জ্ঞান দান করেন।[৮] নিজের সীনা থেকে সকল জ্ঞান তাঁর সীনায় স্থানান্তর করেন। হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাসের (রা) ছাত্রদের মধ্যে তাফসীরের জ্ঞানে একজনও তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। 'আব্বাস ইবন মুস'আব আল-মারূযী বলেন, ইবন 'আব্বাসের ছাত্রদের মধ্যে তাফসীরে 'ইকরিমা সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন।[৯] কাতাদা (রহ) বলতেন, সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী তাবি'ঈ হলেন চারজন। তাঁদের মধ্যে 'ইকরিমা তাফসীরের সবচেয়ে বড় 'আলিম। ইমাম শা'বী (রহ) বলতেন, 'ইকরিমার চেয়ে কিতাবুল্লাহর (কুরআন) বেশি জ্ঞান রাখে এখন তেমন কেউ বিদ্যমান নেই। 'ইকরিমা যতক্ষণ বসরায় থাকতেন, ততক্ষণ হাসান আল-বসরী (রহ) তাফসীর বর্ণনা করতেন না।[১০]

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাসের (রা) জীবদ্দশাতেই 'ইকরিমা একজন বড় মুফাস্‌সির হয়ে যান। ইবন 'আব্বাস (রা) মাঝে মাঝে তাঁর পরীক্ষাও নিতেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাব শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। একবার তিনি নিম্নের এ আয়াতটি পাঠ করেন :[১১]

لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا.

'আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন অথবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন?'

তারপর বলেন, এই আয়াতে যে লোকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আমাদের জানা নেই তারা মুক্তি পেয়েছে না ধ্বংস হয়েছে। 'ইকরিমা অতি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করে দেন যে, তারা মুক্তি পেয়েছে। ইবন 'আব্বাস (রা) এত খুশী হন যে, তাঁকে একটি চাদর পরিয়ে দেন।[১২]

---

৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮৩

৮. তাবাকাত-৫/২১২

৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/২৬৫; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৩/১৬৭

১০. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/২৬৬

১১. সূরা আল-আ'রাফ-১৬৪

১২. তাবাকাত-৫/২১৪; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৩/১৬৮

তাফসীরের দারস

হযরত মুজাহিদ ও সা'ঈদ ইবন জুবায়রের মত বিদ্যান ব্যক্তিগণ তাঁর থেকে তাফসীর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতেন। তাঁরা দু'জন তাঁকে প্রশ্ন করতেন, 'ইকরিমা তার জবাব দিতেন।

তাঁদের প্রশ্ন শেষ হওয়ার পর নিজের পক্ষ থেকে তিনি আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করতেন।[১৩] তারই অনুগ্রহ ও কল্যাণে মুজাহিদ তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হয়ে যান। আবূ হাতিমকে 'ইকরিমা ও সা'ঈদ জুবায়র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এঁদের মধ্যে তাফসীর বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? তিনি বলেন, ইবন 'আব্বাসের (রা) ছাত্ররা সকলে 'ইকরিমার মুখাপেক্ষী।[১৪]

হাদীছ

তাঁর বিশেষ অধীত বিষয় ছিল হাদীছ। এ বিষয়ে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। এ শাস্ত্রের বেশিরভাগ জ্ঞান তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে লাভ করেন। তাছাড়া আরো অনেক সাহাবীর নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন। যেমন : হযরত 'আলী, আবূ হুরায়রা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, 'উকবা ইবন 'আমির, হাজ্জাজ ইবন 'আমর ইবন গারমিয়া, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, ইয়া'লা ইবন উমাইয়্যা, জাবির, আবূ কাতাদা, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকা, হামনা বিনত জাহাশ (রা) ও আরো অনেকে।[১৫]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) বর্ণিত হাদীছ যা প্রায় কয়েক হাজার অতিক্রম করেছে, তার অধিকাংশ 'ইকরিমার সূত্রে পাওয়া। এর দ্বারা এ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা অনুমান করা যায়। ইবন সা'দ তাঁকে "كثير الحديث" তথা বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী বলেছেন।[১৬] শাহ্‌র ইবন হাওশাব বলতেন, প্রত্যেক জাতির একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি (حَبْر) থাকেন, আর এই উম্মাতের সেই বিদগ্ধ ব্যক্তি হলেন ইবন 'আব্বাসের দাস 'ইকরিমা।[১৭]

হাদীছ অন্বেষণকারীদের কাঙ্খিত ব্যক্তি

তাঁর ব্যক্তি সত্তাটি ছিল অসংখ্য মানুষের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে তারা সমবেত হতো। হাদীছ অন্বেষণকারীরা দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর থেকে উপকার লাভের আশায় সেখানে ভীড় জমাতো। কোথাও ভ্রমণের সময় যে পথে তিনি যেতেন, আশে-পাশে উৎসাহী ছাত্র-

---

১৩. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/২৬৬; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৩/১৬৯

১৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৩/১৭৯

১৫. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/২৬৬; তাবি'ঈন-২৮২

১৬. তাবাকাত-৭/২১৬

১৭. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/২৬৫

জনতার ভীড় জমে যেত। আইউব বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম 'ইকরিমা পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর সাথে আমি সাক্ষাৎ করবো। ঘটনাক্রমে একদিন বসরার বাজারে পেয়ে গেলাম। তাঁর চারপাশে মানুষের প্রচণ্ড ভীড়। আমি ভীড় ঠেলে নিকটে গেলাম। কিন্তু ভীড়ের কারণে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। এমতাবস্থায় আমি তাঁর বাহনের পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। মানুষ যা কিছু জিজ্ঞেস করছিল তিনি তাঁর জবাব দিচ্ছিলেন, আর আমি তা স্মৃতিতে ধারণ করছিলাম। আইউব আরো বলেন, একবার 'ইকরিমা আমাদের এখানে আসলেন। মানুষের এত ভীড় জমে গেল যে, বাধ্য হয়ে তাঁকে ঘরের ছাদে নিয়ে বসাতে হলো।[১৮]

'ইকরিমার সমালোচনা

তাঁর মনীষা ও মহত্ত্বের এ সকল বর্ণনার পাশাপাশি 'আসমা' আর-রিজাল' (চরিত-অভিধান)-এর গ্রন্থাবলীতে তাঁর সম্পর্কে সমালোচনামূলক এমন কিছু মন্তব্য দেখা যায় যাতে তাঁর বর্ণিত হাদীছের যথার্থতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হয়। সেই মন্তব্যগুলো নিম্নরূপ :

১. আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়াঈলী বলতেন, 'ইকরিমার মধ্যে বোধ-বুদ্ধি একটু কম ছিল। যখন তাঁর নিকট এমন কোন হাদীছ জিজ্ঞেস করা হতো যা তিনি দু'ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছেন, তখন তা এক ব্যক্তির দিকে আরোপ করতেন, আবার অন্য সময় আরেক ব্যক্তির দিকে। কিন্তু এ কোন দোষের বিষয় নয়, কারণ একটি বর্ণনা দু'জন রাবীর নিকট থেকে শুনে থাকলে যে কোন একজনের প্রতি অথবা উভয়ের প্রতি আরোপ করে বর্ণনা করার স্বাধীনতা তাঁর আছে। এতে তাঁর বোধ-বুদ্ধির স্বল্পতা প্রমাণ হয় কিভাবে?

২. আবূ খালাফ আল-খারারীজী আল-বাক্কারী বর্ণনা করেন, তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন যে, তিনি তাঁর দাস নাফি'কে বলতেন : নাফি'! আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার প্রতি এমন মিথ্যা আরোপ করবে না যেমন 'ইকরিমা 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের প্রতি করে থাকে।[১৯]

৩. জারীর ইবন 'আবদিল হামীদ ইয়াযীদ ইবন আবী যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের পুত্র 'ইকরিমাকে তাঁর পিতার প্রতি মিথ্যা আরোপ করার অপরাধে শাস্তি দিতেন।

৪. হিশাম ইবন সা'দ 'আতা' খুরাসানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবকে বললাম, 'ইকরিমার ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহরাম অবস্থায় হযরত মায়মূনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি বললেন, তিনি মিথ্যা বলেছেন।

৫. কাতার ইবন খলীফা বলেন, আমি 'আতা'কে বললাম, 'ইকরিমা বলে থাকেন যে, মোজার উপর মাসেহ করার নিয়মকে কুরআনের হুকুম বাতিল ও রহিত করেছে। 'আতা'

---

১৮. তাবাকাত-৫/২১৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৭০

১৯. তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৭৩

বললেন, তিনি মিথ্যা বলেছেন। আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন, তোমরা মোজার উপর মাসেহ কর, তা তোমরা পায়খানা থেকে বের হও না কেন।

৬. ইসরাঈল 'আবদুল করীম আল-জাযারী থেকে বর্ণনা করেছেন। 'ইকরিমা ভূমি ইজারা দেওয়াকে মাকরূহ বলেন। তিনি সা'ঈদ ইবন জুবায়রের সংগে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। সা'ঈদ বললেন, 'ইকরিমা মিথ্যা বলেছে।[২০]

৭. উহাইব ইবন খালিদ ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'ইকরিমাকে মিথ্যাবাদী বলতেন।

৮. ইবরাহীম ইবন মুনযির মা'আন ইবন 'ঈসা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইমাম মালিক (রহ) 'ইকরিমাকে বিশ্বস্ত মনে করতেন না। তিনি তাঁর সূত্রে কোন কিছু বর্ণনা করতে নিষেধ করতেন। এ ধরনের আরো কিছু বর্ণনা তাঁর সম্পর্কে পাওয়া যায়।[২১]

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের পর্যালোচনা

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের একটিও নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, প্রথমত সনদের ধারাবাহিকতা নেই, দ্বিতীয়ত বর্ণনাসমূহের রাবীগণও নির্ভরযোগ্য নয়।

আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়াঈলীর মধ্যে ছিল শী'আ 'আকীদা-বিশ্বাসের প্রভাব।[২২] যদিও শী'আ হওয়া অগ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ নয়। কিন্তু খারিজীদের কিছু চিন্তা-বিশ্বাস 'ইকরিমার প্রতি আরোপিত ছিল। এমতাবস্থায় 'ইকরিমা সম্পর্কে একজন শী'আর বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।

দ্বিতীয় বর্ণনার রাবী আবূ খালাফ ইয়াহইয়া ইবন আল-বাক্কার রিজাল শাস্ত্রবিদদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে একজন অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।[২৩] তৃতীয় বর্ণনার একজন রাবী ইয়াযীদ এবং তিনি শী'আ। তাছাড়া তিনি নিজেই 'ইকরিমার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[২৪] এমতাবস্থায় তাঁর বর্ণনা তাঁর কাজের পরিপন্থী হয়ে যায়। তৃতীয় বর্ণনার রাবী জারীর ইবন 'আবদিল হামীদও খুব বেশি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি নন।[২৫] চতুর্থ বর্ণনার রাবী হিশাম ইবন সা'দের বর্ণনাসমূহ গ্রহণযোগ্যতার মান পর্যন্ত পৌঁছে না। সতর্ক মুহাদ্দিছগণ তাঁর কোন বর্ণনা গ্রহণ করতেন না।[২৬]

পঞ্চম বর্ণনায় কাতার ইবন খলীফা অনেক বিশেষজ্ঞের মতে নির্ভরযোগ্য নন।[২৭] ষষ্ঠ

---

২০. প্রাগুক্ত-১৩/১৭৪

২১. উল্লেখিত বর্ণনাগুলো 'তাহযীব আত-তাহযীব' গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে 'ইকরিমার জীবনীতে দ্রষ্টব্য।

২২. তাহযীব আত-তাহযীব-১২/১১

২৩. প্রাগুক্ত-১১/২৭৯

২৪. প্রাগুক্ত-১১/৩২৯

২৫. প্রাগুক্ত-২/৭৬

২৬. প্রাগুক্ত-৭/২১৩

২৭. প্রাগুক্ত-৮/৩০২

বর্ণনার রাবী ইসরাঈল একেবারেই একজন অখ্যাত মানুষ। তাছাড়া তাঁর বর্ণনায় যে ভিত্তিতে 'ইকরিমাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে তার অবস্থা এই যে, যদিও সহীহ বর্ণনায় এসেছে যে রাসূলুল্লাহর (সা) সময়কালে ভূমির ইজারাপ্রথা ছিল, কিন্তু অনেক সাহাবীর তা জানা না থাকার কারণে তা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) যদিও জানতেন যে, রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় ভূমির ইজারা চালু ছিল, কিন্তু কোন কোন সাহাবীর তা না জানা থাকার কারণে জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল; এ কারণে তিনিও এই ধারণায় ইজারা গ্রহণ ছেড়ে দেন যে, হয়তো এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) নিষেধের কথা তিনি শোনেননি। এমতাবস্থায় 'ইকরিমার ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। সপ্তম বর্ণনায় উহাইব ইবন খালিদ একজন দুর্বল (ضعيف) রাবী। আর অষ্টম বর্ণনায় ইবরাহীম ইবন মুনযিলের বর্ণনা বিতর্কিত।[২৮]

মোটকথা 'ইকরিমার প্রতি অভিযোগ সম্বলিত এ সকল বর্ণনার কোনটাই গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাছাড়া এ সকল বর্ণনার বিপরীতে এত বেশি বর্ণনা আছে যে, তা থাকতে 'ইকরিমাকে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

'আলিম ও মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্য

ইসহাক ইবন 'ঈসা আত-তাব্বা' বর্ণনা করেন। আমি মালিক ইবন আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) এই কথাটি জানা আছে– "আমার প্রতি সেই রকম মিথ্যা আরোপ করবে না যে রকম 'ইকরিমা ইবন 'আব্বাসের প্রতি আরোপ করে থাকে?" মালিক বললেন, না। এ ব্যাপারে কিছু জানা নেই। অবশ্য সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব তাঁর দাস বুরদকে এমন বলতেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, সা'ঈদ ইবন জুবায়র অন্যদের মুখে শোনা 'ইকরিমার কিছু বর্ণনায় সন্দেহ প্রকাশ করতেন। কিন্তু যখন খোদ তাঁর মুখে বর্ণনাটি শুনতেন তখন তাঁর সেই সন্দেহ দূর হয়ে যেত। আবূ ইসহাক বলেন, আমি একবার সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে একথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা 'ইকরিমার এমন সব হাদীছ বর্ণনা কর, যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম তাহলে সম্ভবতঃ তা বর্ণনা করতেন না। ঘটনাক্রমে কিছুক্ষণ পরে সেখানে 'ইকরিমা এসে উপস্থিত হন এবং তিনি সেই হাদীছগুলো বর্ণনা করেন। উপস্থিত সকলে চুপ করে শোনেন। সা'ঈদও কিছু বললেন না। 'ইকরিমা চলে যাওয়ার পর লোকেরা সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে জিজ্ঞেস করে : আবূ 'আবদিল্লাহ! কী ব্যাপার, আপনি চুপ থাকলেন কেন? বললেন : 'ইকরিমা সঠিক বর্ণনা করেছেন। সকল মুহাদ্দিছ তাঁর সত্যবাদিতা ও অগাধ জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করেছেন। হযরত 'আতা' ও সা'ঈদ ইবন জুবায়র উভয়ে বিনা দ্বিধায় তাঁর সকল হাদীছ গ্রহণ করতেন। হাবীব আবী ছাবিত বলেন, একবার 'ইকরিমা ও 'আতা' গেলেন সা'ঈদের নিকট এবং তাঁকে হাদীছ শোনালেন। যখন 'ইকরিমা হাদীছ শুনিয়ে উঠে গেলেন তখন আমি তাঁদের দু'জনকে প্রশ্ন

---

২৮. প্রাগুক্ত-১১/১৭০; ১/১৬৭

করলাম : 'ইকরিমা যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার কোন অংশে আপনাদের অস্বীকৃতি আছে? তাঁরা বললেন : না।[২৯]

হযরত সা'ঈদ ইবন জুবায়র (রহ) যিনি নিজেই একজন বড় 'আলিম ছিলেন, 'ইকরিমাকে নিজের চেয়েও বড় 'আলিম বলে মানতেন। তাবি' তাবি'ঈনের মধ্যে ইবন জুরায়জ ছিলেন একজন অতি উঁচু স্তরের মুহাদ্দিছ। তিনি 'ইকরিমার এত গুণমুগ্ধ ছিলেন যে, একবার ইয়াহইয়া ইবন আইউব আল-মিসরীকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি 'ইকরিমা থেকে কিছু লিখেছো? তাঁরা বললেন : না। ইবন জুরায়জ বললেন, তাহলে তো তোমরা দুই তৃতীয়াংশ 'ইলম (জ্ঞান) বিনষ্ট করে ফেলেছো।[৩০] কাতাদা (রহ) চার ব্যক্তিকে বড় 'আলিম বলে মানতেন, তাঁদের মধ্যে একজন 'ইকরিমা। মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (রহ) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) সকল হাদীছ 'ইকরিমার সূত্রে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল 'ইকরিমার বর্ণনাসমূহকে দলীল-প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন। ইবন মা'ঈন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে 'ইকরিমাকে সা'ঈদ ইবন জুবায়রের সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর প্রতি ইবন মা'ঈনের এত প্রবল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর সম্পর্কে কোন রকম খারাপ ধারণা পোষণ করা মোটেই সহ্য করতেন না। তিনি বলতেন, যখন আমি কোন ব্যক্তিকে 'ইকরিমা ও হাম্মাদ ইবন সালামার দোষ-ক্রটি আলোচনা করতে দেখি তখন তার মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে আমার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ইবন আল-মাদীনী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) দাসদের মধ্যে 'ইকরিমার চেয়ে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। 'ইকরিমা জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন। ইমাম বুখারী বলতেন, আমাদের সকল সংগী-সাথী 'ইকরিমার বর্ণনা দ্বারা দলীল-প্রমাণ গ্রহণ করেন। ইমাম নাসাঈ তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। ইবন আবী হাতিম বলেন, আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম : 'ইকরিমা কেমন? জবাব দিলেন : ছিকা বা বিশ্বস্ত। আবার প্রশ্ন করলাম! তাঁর হাদীছসমূহ কি দলীল-প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য? বললেন : হাঁ, যখন তিনি বিশ্বস্ত রাবীদের থেকে বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ও ইমাম মালিক (রহ) তাঁর হাদীছসমূহ নয়, বরং তাঁর নিজের মতামতকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁদেরকে প্রশ্ন করা হয় : 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) অন্য দাসদের অবস্থা কি? তাঁরা বলেন : 'ইকরিমা তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার অধিকারী। এই স্থানে তাঁর কোন হাদীছ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। বিশ্বস্ত রাবীগণ তাঁর থেকে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা সবই সহীহ বা সঠিক। হাদীছের ইমামগণ তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করতে নিষেধ করেননি। সহীহ হাদীছের সংকলনকারীগণ তাঁর বর্ণনাসমূহকে তাঁদের সহীহ গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশ করেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব এর চেয়েও উন্নত যে, আমি তাঁর হাদীছসমূহ প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করি।[৩১]

---

২৯. তাবাকাত-৫/২১৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৭০

৩০. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/২৬৬

৩১. প্রাগুক্ত-৭/২৬৬-২৭০

ইবন মুন্দাহ বলেন, শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের বিশাল একটি সংখ্যা এবং তাবি' তাবি'ঈগণ 'ইকরিমাকে ন্যায়নিষ্ঠ বলেছেন, তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তার একক বর্ণনা দ্বারা আল্লাহর সিফাত, সুন্নাহ ও বিভিন্ন আহকামের দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর থেকে তিনশো'র অধিক মানুষ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাদের সত্তর (৭০) জনের অধিক উঁচু পর্যায়ের তাবি'ঈ। এ এমন মর্যাদা যা অন্য কোন তাবি'ঈ অর্জন করতে পারেননি। যে সকল ইমাম তাঁর সমালোচনা করেছেন তাঁরাও তাঁর থেকে হাদীছ গ্রহণ এড়াতে পারেননি। তাবি'ঈদের যুগ থেকে নিয়ে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসা'ঈর যুগ পর্যন্ত সকল ইমাম তাঁর সহীহ বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করে তা ছাবিত, সাকীম ও সাহীহ (سقيم، ثابتٌ ও صحيح) তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যুগের পর যুগ ধরে ইমামের পর ইমামগণ তাঁর বর্ণিত হাদীছসমূহকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বিখ্যাত চার মাযহাবের মহান ইমামগণ তাঁর হাদীছসমূহ দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁর সম্পর্কে সুধারণা রাখতেন না, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর হাদীছ গ্রহণ করেছেন। চুলচেরা সমালোচনার পর তাঁর মূল্যায়ন করে তাঁকে ন্যায়নিষ্ঠ বলেছেন।[৩২]

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মুরূযী বলেন, 'ইকরিমার হাদীছসমূহ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণের ব্যাপারে হাদীছের সকল 'আলিমের ইজমা' আছে। আমাদের যুগের সকল শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ, যেমন : আহমাদ ইবন হাম্বল, ইবন রাহুওয়াইহ, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন, আবূ ছাওর প্রমুখের এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে। আমি তাঁর বর্ণনাসমূহ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে ইবন রাহুওয়াইহ-এর নিকট জিজ্ঞেস করি। তিনি আমার প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আমাদের মতে 'ইকরিমা সারা পৃথিবীর ইমাম। কিছু লোক ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈনকে একই প্রশ্ন করে। তিনিও এমন প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করেন।[৩৩]

জাবির ইবন যায়দ বলতেন, 'ইকরিমা হলেন মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি। যার মধ্যে জ্ঞানের সুগন্ধি অনুভব করার সামান্যতম শক্তি আছে তার ইয়াযীদ ইবন আবী যিয়াদের কথার (পূর্বে উল্লেখিত) উপর নির্ভর করা উচিত নয়। ইয়াযীদ ইবন আবী যিয়াদ এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নন। আর একজন সমালোচিত ব্যক্তির কথা দ্বারা একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি সমালোচিত ও দোষী হতে পারেন না। 'ইকরিমা এমন ব্যক্তি যাঁর জ্ঞানের ঝর্ণাধারা থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরিতৃপ্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে হাদীছ ও ফিক্‌হের প্রসার ঘটিয়েছেন। তাঁর মধ্যে কিছু কৌতুকপ্রিয়তা ছাড়া মন্দ কোন কিছুর কথা আমার জানা নেই।

মোটকথা, পূর্বে আলোচিত কিছু দুর্বল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা ছাড়া সকল 'আলিম ও মুহাদ্দিছ 'ইকরিমার মহত্ত্ব, মনীষা ও সত্যবাদিতার ব্যাপারে এ রকম মত পোষণ করেছেন। তাঁর সত্যবাদিতার অনস্বীকার্য সাক্ষ্য এই যে, খোদ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা),

---

৩২. প্রাগুক্ত-৭/৫২

৩৩. প্রাগুক্ত-৭/২৭২-২৭৩

যাঁর আশ্রয়ে তিনি বেড়ে ওঠেন, তাঁর জ্ঞানের উপর এতখানি আস্থা ছিল যে, তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন, 'ইকরিমা আমার সূত্রে যা বর্ণনা করবে তোমরা তা সত্য বলে জানবে।[৩৪] সে আমার নামে মিথ্যা বলবে না। এখানে যে পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো তাতে জ্ঞানের জগতে হযরত 'ইকরিমার (রহ) সুউচ্চ আসন ও মর্যাদার ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

তাঁর ছাত্র

জ্ঞানের জগতে তাঁর যে সুউচ্চ আসন ছিল তা তাঁর ছাত্র সংখ্যা দ্বারা বুঝা যায়। অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ইমাম পর্যায়ের। ছাত্রদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে, তাই কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্রের নাম এখানে উপস্থাপন করা হলো :

ইবরাহীম নাখা'ঈ, জাবির ইবন যায়দ, ইমাম শা'বী, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, আবুয যুবায়র, কাতাদা, সাম্মাক ইবন হারব, 'আসিম আল-আহওয়াল, হুসায়ন ইবন 'আবদির রহমান, আইউব, খালিদ, দাউদ ইবন আবী হিন্দ, 'আসিম ইবন বাহদালা, 'আবদুল কারীম আল-জাযারী, হুমায়দ আত-তাবীল, মূসা ইবন 'উকবা, 'আমর ইবন দীনার, 'আতা' ইবন সায়িব, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব, আবূ ইসহাক আশ-শায়বানী, হিশাম ইবন হাস্‌সান, ইয়াহইয়া ইবন কাছীর, হাকাম ইবন 'উয়ায়না, খাসীফ আল-জাযারী, দাউদ ইবন আল-হুসায়ন, 'আতা' আল-খুরাসানী, 'আতা' ইবন আস-সায়িব, 'আতা' আল-'আওফী, 'আবদুল কারীম আবূ উমাইয়্যা আল-বাসরী, 'আবদুল মালিক ইবন আবী বাশীর আল-মাদায়িনী, 'উছমান ইবন সা'দ আল-কাতিব, 'উছমান ইবন গিয়াছ আল-বাসরী (রহ) ও আরো অনেকে।[৩৫]

ফিক্‌হ

হযরত 'ইকরিমার (রহ) মূল বিষয় ছিল হাদীছ। তবে তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রেও সুদক্ষ ছিলেন। ইবন হিব্বান বলেন, 'ইকরিমা তাঁর সময়ে ফিক্‌হ ও কুরআনের অন্যতম বড় 'আলিম ছিলেন।[৩৬] ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতার বড় সনদ এই যে, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁকে ফাতওয়া দানের অনুমতি দান করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, ইবন 'আব্বাস (রা) আমাকে ফাতওয়া দিতে বলেন। আমি দু'বার অপারগতা প্রকাশ করে বলি যে, যদি এ যুগের মানুষ পূর্ববর্তী যুগের সত্যনিষ্ঠ মানুষদের মত হতো তাহলে আমার কোন আপত্তি থাকতো না। আমার এ আপত্তির কথা শুনেও তিনি জোর দিয়ে বলেন, কোন ব্যক্তি জরুরী কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তা বলে দেবে। আর কেউ অহেতুক প্রশ্ন করলে তার জবাব দেবে না। এই কর্ম-পদ্ধতিতে তোমার

---

৩৪. প্রাগুক্ত-৭/২৬৫; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৩/১৬৮

৩৫. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/২৬৪; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৩/১৬৪

৩৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/২৭১

দুই-তৃতীয়াংশ বোঝা হালকা হয়ে যাবে।[৩৭] ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর মনীষা ও পাণ্ডিত্য এতখানি স্বীকৃত ছিল যে, যখন তিনি বসরায় যেতেন এবং যতদিন সেখানে অবস্থান করতেন ততদিন পর্যন্ত হাসান আল-বসরী (রহ) ফাতওয়া দিতেন না।[৩৮] তাঁর ইনতিকালের পর মানুষের মুখে মুখে একথাটি উচ্চারিত হতো : ফিক্হ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।[৩৯]

তাঁর সমকালীন জ্ঞানী-গুণীরা বিভিন্ন মাসয়ালার ক্ষেত্রে তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করে তাঁর কাছেই জানতে চাইতেন। 'আমর ইবন দীনার বলেন, জাবির ইবন যায়দ কয়েকটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার জন্য আমাকে 'ইকরিমার নিকট পাঠালেন এবং আমাকে একথাও বললেন যে, ইবন 'আব্বাসের (রা) এ দাস জ্ঞানের সাগর। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করবে।[৪০]

মাগাযী

মাগাযী হলো হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবন-ইতিহাস। বিশেষত তাঁর সময়ের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস। হাদীছ ও ফিক্হ ছাড়াও ইতিহাসেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। মাগাযী শাস্ত্রে একজন বিশিষ্ট 'আলিম ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর এত জ্ঞান ছিল যে, যখন মাগাযীর বর্ণনা দিতেন তখন সাবলীল ভাষায় শ্রোতাদেরকে যেন যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে উপস্থিত করতেন। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না বলেন, 'ইকরিমা যখন মাগাযী বর্ণনা করতেন তখন শ্রোতাদের মনে হতো তারা যেন মুজাহিদদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁদেরকে দেখছে।[৪১]

কাতাদা (রহ) বলতেন :[৪২]

كان أعلم التابعين أربعة : كان عطاء بن أبى رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام.

'তাবি'ঈদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি চারজন : হজ্জের আহকাম ও 'ইবাদাত বিষয়ক জ্ঞানে 'আতা' ইবন আবী রাবাহ; তাফসীর বিষয়ক জ্ঞানে সা'ঈদ ইবন জুবায়র, সীরাতুন নবী (সা) বিষয়ক জ্ঞানে 'ইকরিমা এবং হালাল-হারাম বিষয়ক জ্ঞানে আল-হাসান সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।'

---

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৪

৩৯. তাবাকাত-৫/২১৬

৪০. প্রাগুক্ত-৫/২১৩

৪১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/২৬৬; তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৬৮

৪২. তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৬৮

ওফাত

হিজরী ১০৫, মতান্তরে ১০৬ অথবা ১০৭ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম যাহাবীর মতে হিজরী ১০৭ সনে মদীনায় তাঁর মৃত্যু হয়। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি আফ্রিকার কায়রোয়ানে ইনতিকাল করেন। তবে এ বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়।[৪৩]

কিছু সন্দেহের অপনোদন

কিছু বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত 'ইকরিমার একটু ঝোঁক ছিল খারিজীদের সাফরিয়্যা ও 'ইবাদিয়্যা সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি এবং নাজদা খারিজীর সাথে তার গভীর সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। এমনকি নাজদা তাঁর নিকট ছয় মাস পর্যন্ত অবস্থানও করেছিল। মরক্কোর খারিজীরা তাঁর নিকট জ্ঞান অর্জন করেছে।[৪৪] তবে এ সকল বর্ণনার সবই সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ।

তাবাকাতে ইবন সা'দ, যেটি সবচেয়ে প্রাচীন সূত্র বলে স্বীকৃত, তাতে শুধু এ বাক্যটি পাওয়া যায় :[৪৫]

يظن أنه يرى رأى الخوارج – 'ধারণা করা হয় যে, তিনি খারিজীদের মত পোষণ করতেন।' এ বর্ণনার ভিত্তি যে কতটুকু শক্ত তা "يظن" অর্থাৎ ধারণা ও অনুমান শব্দ প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায়। কিছু মানুষ তো এ বর্ণনাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই 'আজলী বলেন, তিনি একজন মাক্কী তাবি'ঈ, বিশ্বাসযোগ্য এবং খারিজী মত পোষণের যে অভিযোগ তার প্রতি আরোপ করা হয় তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[৪৬]

এ সকল বর্ণনা ছাড়া যুক্তি দ্বারাও প্রমাণ করা যায় যে, খারিজীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক থাকতে পারে না। কারণ, তিনি লালিত-পালিত হন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, আর তিনি ছিলেন খারিজীদের প্রবল প্রতিপক্ষ। 'ইকরিমার প্রথম মনিব হুসায়ন ইবন আল-হুর আল-আম্বরও ছিলেন আহলি বায়ত তথা নবী-পরিবারের ভক্ত। এমতাবস্থায় খারিজী চিন্তা-বিশ্বাসের দিকে তাঁর ঝোঁক থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। অপর দিকে শী'আ মত-বিশ্বাসের দিকে ঝোঁক প্রবণতার কথা যদি তাঁর সূত্রে বর্ণিত হতো তাহলে তা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারতো।

বিভিন্ন বর্ণনা পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, হযরত 'ইকরিমা মুসলিম জনসাধারণের মত খারিজীদের ব্যাপারে কঠোর মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি তাদের সাথে লৌকিক ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতেন। যেহেতু এ কাজ মুসলিম জনসাধারণের কর্ম-পদ্ধতির বিপরীতে ছিল এবং জনগণ তা পছন্দ করতোনা, এ কারণে তাঁর খারিজী হওয়ার কথাটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটাও হতে পারে যে, বিশেষ কোন

---

৪৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৪; তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৮১

৪৪. তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৭৮

৪৫. প্রাগুক্ত-১৩/১৮০; তাবাকাত-৫/২১৬

৪৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/২৭০

মাসয়ালায় তাঁর মতামত খারিজীদের মতামতের সাথে মিলে যায়, এ কারণে তিনি খারিজী হিসেবে প্রসিদ্ধি পান। অন্যথায় এই গোমরাহ্ দলের সাথে তাঁর কোন রকম সম্পর্ক ছিল না।

দেশ ভ্রমণে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। সারা জীবনই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করেছেন। পূর্বে সমরকন্দ থেকে পশ্চিমে মিসর তথা আফ্রিকার প্রান্তসীমা পর্যন্ত ছিল তাঁর ভ্রমণের পরিধি।[৪৭]

তাঁর আল-মাগরিব তথা মরক্কো সফরের কারণ সম্পর্কে আবুল আসওয়াদ বলেছেন এভাবে :[৪৮]

كنت أول من سَبَّب لعكرمة الخـــروج إلى المغـرب، وذلـك أنـى قدمـت مـن مصـر إلى المدنيـة، فلقيـنـى عكرمـة وسـألنى عـن أهـل المغـرب فاخبرتـــه بغفلتـــهم، قـــال : فخرج إليهم.

"ইকরিমার আল-মাগরিব যাত্রার প্রথম কারণ আমি। আর তা হলো আমি মিসর থেকে মদীনায় আসি এবং 'ইকরিমা আমার সাথে দেখা করেন। তিনি আল-মাগরিববাসীদের সম্পর্কে আমার নিকট জানতে চাইলেন। আমি তাদের অমনোযোগিতা ও গাফলতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। অতঃপর তিনি (মদীনা থেকে) আল-মাগরিববাসীদের দিকে বেরিয়ে পড়লেন।'

ইবন বুকাইর বলেন, 'ইকরিমা আল-মাগরিব যাওয়ার পথে মিসর আসেন। তিনি নিজের বাড়ির পাশে একটি বাড়ি দেখিয়ে বলতেন, 'ইকরিমা এই বাড়িতে অবস্থান করেন এবং এখান থেকে আল-মাগরিবের দিকে বেরিয়ে পড়েন।[৪৯]

তাঁর বসরা গমনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন আইউব এভাবে : 'আমি 'ইকরিমার খ্যাতির কথা শুনে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর কাছে যাওয়ার ইরাদা করছিলাম। একদিন আমি বসরার বাজারে বসে আছি, এমন সময় এক ব্যক্তি গাধায় চড়ে সেখানে আসলেন। লোকেরা আমাকে বললো, ইনিই 'ইকরিমা। লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরলো। আমিও উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারলাম না। আমার সব প্রশ্ন যেন ভুলে গেলাম। আমি তাঁর গাধার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের সকল প্রশ্ন ও তাঁর উত্তর শুনতে ও মুখস্থ করতে লাগলাম। আইউব আরো বলেন, তাঁর পাশে মানুষের এত ভীড় হয় যে, তা সামলাতে তাঁকে একটি ঘরের ছাদের উপর বসানো হয়। এই বসরা ভ্রমণকালে সেখানে আইউব, সুলায়মান আত-তায়মী, ইউনুস ইবন 'উবায়দ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন।[৫০]

---

৪৭. প্রাগুক্ত

৪৮. তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৭২

৪৯. প্রাগুক্ত

৫০. প্রাগুক্ত

তিনি খুরাসান ও সমরকন্দেও যান। আল-মুগীরা ইবন মুসলিম বলেন, খুরাসানে তাঁর হজ্জ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করা হয়। আবুত তায়্যিব মূসা ইবন ইয়াসার বলেন, আমি 'ইকরিমাকে গাধায় চড়ে সমরকন্দ থেকে আসতে দেখেছি। সেই গাধার পিঠে ঝোলানো রেশমভরা দু'টি বস্তা ছিল, যা সমরকন্দের শাসক তাঁকে দিয়েছিলেন। সংগে একটি দাসও ছিল। আবুত তায়্যিব আরো বলেন, আমি এই সমরকন্দেই তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছি। এখানে একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি হারামাইন (মক্কা-মদীনা) ছেড়ে এই খুরাসান-সমরকন্দে এসেছেন কেন? তিনি বলেন, প্রয়োজনই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।[৫১]

আসলে তিনি সাধারণ মানুষের দান-উপহার গ্রহণ করতেন না, বরং আমীর-উমারাদের থেকেই গ্রহণ করতেন। একবার তাঁর মাথায় একটি পুরাতন জীর্ণ পাগড়ী দেখে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, আপনি এই পাগড়ীটি বাদ দিন, আমাদের অনেক পাগড়ী আছে, তার থেকে একটি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি সেটা পরবেন। বললেন :

أنا لا أخذ من الناس شيئًا إنما اخذ من الأمراء.

'আমি সাধারণ মানুষের নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করিনে। গ্রহণ করি কেবল আমীর-উমারাদের থেকে।'

ইবরাহীম ইবন ইয়া'কূব বলেন, আমি আহমাদ ইবন হাম্বলের নিকট জানতে চাইলাম যে, 'ইকরিমা কি আল-মাগারিবের 'বারবার' সম্প্রদায়ের নিকট গিয়েছিলেন? বললেন : হাঁ। তিনি খুরাসানের আমীর-উমারাদের নিকট গিয়ে তাঁদের দান-অনুগ্রহ গ্রহণ করতেন।[৫২]

খালিদ ইবন আবী 'ইমরান বলেন, ইবন 'আব্বাসের (রা) দাস 'ইকরিমা একটা মেলার মৌসুমে আমাদের আফ্রিকাতে আসেন এবং একটি বল্লম হাতে নিয়ে বলেন, আমি মেলায় যাব, ডানে-বামে যাকে পাব এই বল্লম দিয়ে পেটাবো। তিনি মেলায় যান এবং মেলায় অংশ গ্রহণকারীদের প্রতিরোধের মুখে পড়েন।[৫৩]

---

৫১. প্রাগুক্ত-১৩/১৭৬

৫২. প্রাগুক্ত-১৩/১৭২, ১৭৬

৫৩. প্রাগুক্ত-১৩/১৭২

'আবদুল্লাহ ইবন 'আওন (রহ)

হযরত 'আবদুল্লাহর ডাকনাম আবূ 'আওন। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন দুর্‌রা আল-মুযানীর দাস ছিলেন। জারিফ প্লাবনের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি কূফার শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে ছিলেন। ইমাম আছ-ছাওরী বলতেন, আমি আইউব, ইউনুস, তায়মী এবং 'আওনের মত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের একটি শহরে একত্রে আর কোথাও দেখিনি।[২]

হাদীছ

হযরত 'আবদুল্লাহ সকল ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তবে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাদীছের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ এবং তাতে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেন। ইবন সা'দ বলেন :[৩]

كان ثقة كثير الحديث.

"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, বহু হাদীছের ধারক-বাহক ও বর্ণনাকারী।" তিনি তাঁর যুগের সকল বড় মুহাদ্দিছের জ্ঞান আত্মস্থ করেন। ইবন 'আদী বলেন, ইবন 'আওন এমন সব সনদবিশিষ্ট হাদীছ সংরক্ষণ করেন যা তাঁর অন্য কোন সঙ্গী-সাথী করতে পারেননি। মদীনার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের মধ্যে তিনি হযরত সালিম, কাসিম; বসরার মুহাদ্দিছগণের মধ্যে হযরত হাসান আল-বাসরী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন; কূফার মুহাদ্দিছগণের মধ্যে ইমাম শা'বী, ইমাম নাখা'ঈ; মক্কার মুহাদ্দিছগণের মধ্যে হযরত 'আতা', মুজাহিদ; শামের মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মাকহূল ও রাজা' ইবন হায়ওয়া (রহ) থেকে হাদীছ শোনেন।[৪] এভাবে তিনি তৎকালীন সকল হাদীছ চর্চার কেন্দ্রগুলোর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের হাদীছসমূহ লাভ করেন। এছাড়া আরো বহু 'আলিমের নিকট থেকে ফায়দা হাসিল করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন : ছুমামা ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আনাস, আনাস ইবন সীরীন, যিয়াদ ইবন যুবায়র, 'আবদুর রহমান ইবন আবী বাকরা, মূসা ইবন আনাস ইবনে মালিক, হিশাম ইবন যায়দ ইবন আনাস, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, নাফি' (রহ) প্রমুখ।[৫] এ সকল মহান ব্যক্তির সাহচর্য ও উদারতায় তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেন তার পরিধি অত্যন্ত

---

১. তাবাকাত ইবন সা'দ-৭/২৫

২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৭

৩. তাবাকাত-৭/২৪

৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৭' তাহ্যীব আল-কামাল-১০/৩৯৬

৫. প্রাগুক্ত

বিস্তৃত। ইবন মাহদী বলেন, ইরাকে ইবন 'আওনের চেয়ে সুন্নাহ্র বড় 'আলিম আর কেউ ছিলেন না।[৬] 'উছমান আল-বাত্তী বলতেন, আমার এ দুচোখ 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আওনের মত আর কাউকে দেখেনি।[৭]

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন আল-মুবারক (রহ) বলতেন, আমি সাক্ষাতের পূর্বে যে সকল ব্যক্তির কথা শুনেছিলাম তাঁদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আওন, রাজা' ইবন হায়ওয়া ও সুফইয়ান ছাড়া অবশিষ্ট সকলকে সাক্ষাতের পর নিম্নমানের পেয়েছি। তবে ইবন 'আওনের সাথে সাক্ষাতের পর মন চাইতো, চিরদিনের জন্য তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই এবং মরণ পর্যন্ত পৃথক না হই।[৮] একবার হিশাম ইবন হাস্সান একটি হাদীছ বর্ণনা করেন। একজন জিজ্ঞেস করলো : হাদীছটি আপনি কার নিকট থেকে শুনেছেন? জবাব দিলেন : এমন ব্যক্তির নিকট থেকে যার সমকক্ষ আর কাউকে আমার চোখ দেখেনি। তিনি হাসান আল-বাসরী ও মুহাম্মাদ ইবন সীরীনকেও ব্যতিক্রম বলেননি।[৯]

হাদীছ বর্ণনায় ভীতি ও সতর্কতা

এত গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাদীছ বর্ণনায় দারুণ সতর্ক ছিলেন। মানুষকে হাদীছ শোনাতে হবে এই ভয়ে রাস্তা-ঘাটে বের হওয়া বন্ধ করে দেন। বাক্কার ইবন মুহাম্মাদ বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আওন আমাকে বললেন : ভাতিজা! মানুষ আমার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এখন আমি প্রয়োজনেও ঘর থেকে বের হতে পারিনে। বাক্কার বলেন, তাঁর এ কথার অর্থ এই ছিল যে, মানুষ তাঁর কাছে হাদীছ জিজ্ঞেস করতো।[১০] তা সত্ত্বেও তিনি হাদীছ বর্ণনার দ্বার একেবারে রুদ্ধ করে দেননি। আলিমগণের স্বীকৃত ও সত্যায়িত হাদীছ তিনি বর্ণনা করতেন। বাক্কার বলেন, ইবন 'আওন কুফাতেই সর্বাধিক জ্ঞান অর্জন করেন এবং তা মুহাম্মাদের সামনে উপস্থাপন করেন। মুহাম্মাদ তা শুনে যে হাদীছের ব্যাপারে একমত ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, ইবন 'আওন তাই বর্ণনা করেন এবং অবশিষ্টগুলো বাদ দেন।[১১]

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বড় বড় ইমামও আছেন। যেমন : আ'মাশ, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, শু'বা (রহ) প্রমুখ। সাধারণ ছাত্রদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : দাঊদ ইবন আবী হিন্দ, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, 'আব্বাদ ইবন আল-'আওয়াম, হাশীম, ইয়াযীদ ইবন যুরায়'ই, ইবন 'আলিয়্যা, বিশর

---

৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৮
৭. তাহ্যীব আল-কামার-১০/৩৯৬
৮. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৮
৯. তাবাকাত-৭/২৭
১০. প্রাগুক্ত-৭/২৫
১১. প্রাগুক্ত-৭/২৭

ইবন মুফাদ্দাল, মু'আয, ইয়াযীদ ইবন হারুন, আবূ 'আসিম, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-আনসারী (রহ) ও আরো অনেকে।[১২]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

জ্ঞানের চেয়েও তিনি তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে বেশি দীপ্তিমান ছিলেন। ইবন হিব্বান বলেন, ইবাদত-বন্দেগী, তাক্ওয়া-পরহেযগারী, সুন্নাতের অনুসরণ এবং বিদ'আতীদের প্রতি কঠোরতার ব্যাপারে তিনি সমকালীনদের মধ্যে অন্যতম নেতা ছিলেন।[১৩]

'আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে কঠোরতা

'আকীদার ব্যাপারে তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রা) পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন 'আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কম-বেশি করাকে দারুণ অপছন্দ করতেন। আর যারা এমন করতো তাদের তিনি সালামও করতেন না।[১৪] একবার তাঁর সামনে 'কদর' বিষয়ে আলোচনা হলে তিনি বললেন, এই 'আকীদার বয়সের চেয়ে আমার বয়স বেশি। আমি সা'ঈদ আল-জুহানী ও সানওয়াইহ ব্যতীত পূর্ববর্তীদের কেউ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন বলে শুনিনি মূলত এ একটি মন্দ চিন্তা।[১৫]

'ইবাদত

তাঁর তাক্ওয়া-পরহেযগারী ও ইবাদত-বন্দেগীর মাত্রা মুহাম্মাদ ইবন সীরীনকেও হার মানিয়ে দেয়। কুররা বলেন, আমরা মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের আল্লাহ-ভীতি দেখে অবাক হতাম, কিন্তু 'আবদুল্লাহ ইবন আওন তাঁকেও হার মানান।[১৬] তাঁর প্রতিদিনের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল 'ইবাদত। ফজরের নামাযের পর কিবলামুখী হয়ে বসে যিকর করতেন। সূর্যোদয়ের পর ইশরাকের নামায আদায় করে মানুষের সামনে আসতেন। প্রত্যেক রাতে কয়েক শো রাক'আত নফল নামায পড়তেন। কোন কারণে কোন রাতে যদি তা আদায় করতে না পারতেন তাহলে দিনে তা পূরণ করতেন।[১৭] বাড়ীর সীমানার মধ্যে একটি বিশেষ মসজিদ ছিল। মাগরিব ও 'ঈশা ছাড়া বাকী তিন ওয়াকতের নামায নিজের ছেলে, ভাই এবং উপস্থিত লোকদের নিয়ে এই মসজিদে পড়তেন। জুম'আ ও দু'ঈদের নামাযকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। গোসল করে সুন্দর রুচিসম্মত পোশাক পরে খোশবু লাগাতেন। কখনো বাহনে চড়ে, আবার কখনো পায়ে হেঁটে মসজিদে যেতেন। জুম'আর নামায আদায় করার পরই ঘরে ফিরে যেতেন এবং সুন্নাত-নফল নামায ঘরেই আদায়

---

১২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৭' তাহ্যীব আল-কামাল-১০/৩৯৬

১৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৮

১৪. তাবাকাত-৭/২৫

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. শাযারাত আয-যাহাব-১/২৩০; তাহযীব আল-কামাল-১০/৩৯৮

১৭. তাবাকাত-৭/২৫

করতেন। রমযান মাসে 'ইবাদতের মাত্রা অনেক বেড়ে যেত। ফরয নামায জামা'আতের সাথে আদায়ের পর ঘরে ফিরতেন। নির্জনে ইবাদত করতেন এবং নির্জনে বসে বসে- الْحَمْدُ لله رَبَّنَا এই যিকরে মশগুল থাকতেন।[১৮] একদিন পর একদিন করে সারা বছর রোযা রাখতেন এবং আমরণ এই নিয়মের ভিন্নতা হয়নি।[১৯]

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর (আল্লাহর পথে জিহাদ) উদ্দেশ্যে বিশেষ যত্নে একটি উষ্ট্রী পালতেন এবং সেটাকে খুবই ভালোবাসতেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে তাঁর অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমানদের সাথে কোন একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং একজন রোমান সৈনিকের সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করেন।[২০]

আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধি ব্যতীত দুনিয়ার আর কোন কিছুর প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। বাক্কার ইবন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, ইবন 'আওন না কারো সাথে রসিকতা করতেন, আর না করতেন কারো সাথে তর্ক-বিতর্ক। কবিতা আবৃত্তিও করতেন না। তিনি কেবল আত্মপরিশুদ্ধির কাজেই নিয়োজিত থাকতেন।[২১]

উপকার করে গোপন রাখা

কারো কোন উপকার করে তা প্রকাশ করা খারাপ মনে করতেন। বাক্কার ইবন মুহাম্মাদ বলেন, ইবন 'আওন কারো প্রতি অনুগ্রহ বা সদাচরণ করলে এত গোপনে করতেন যে, কেউ জানতে পারতো না। অন্যের নিকট তা প্রকাশ করা খুবই খারাপ বলে বিশ্বাস করতেন।[২২]

কসম পরিহার

তিনি কসম খাওয়া ভালো কাজ বলে মনে করতেন না। কখনো সত্য কসমও খেতেন না। বাক্কার ইবন মুহাম্মাদ বলেন, আমি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একটা দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে কখনো তাঁকে সত্য-মিথ্যা কোন রকম কসম খেতে দেখিনি।[২৩]

নৈতিক চরিত্র

তিনি অত্যন্ত বিনম্র, বিনয়ী ও উত্তম চরিত্রের মানুষ ছিলেন। কোন অবস্থাতে তাঁর মুখ থেকে কোন অশালীন কথা বের হতো না। বাক্কার বলেন, আমি ইবন 'আওনের চেয়ে বেশি জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এমন কোন মানুষ দেখিনি। তিনি নিজের দাস-দাসী, এমন

---

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৮

২০. তাবাকাত-৫/২৮

২১. প্রাগুক্ত

২২. প্রাগুক্ত

২৩. প্রাগুক্ত

কি ছাগল-মুরগীকে পর্যন্ত কখনো গালি দিতেন না। জিহাদের যে উষ্ট্রীকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন তার পিঠে একবার পানি বোঝাই করে আনার জন্য দাসকে নির্দেশ দেন। সে নির্দয়ভাবে উষ্ট্রীর মুখে পেটায় এবং তাতে চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোকেরা ধারণা করলো যে, দাসের এ আচরণে তিনি অবশ্যই ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু যখন উষ্ট্রীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়লো তখন দাসকে শুধু এতটুকু বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। তুমি পেটানোর জন্য উষ্ট্রীর মুখমণ্ডল ছাড়া দেহের আর কোন অংশ কি পাওনি? তারপর তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেন।[২৪] দারুণ সহনশীল ছিলেন। যাদের হাতে তিনি দৈহিকভাবে নির্যাতিত হতেন তাদেরকেও নিন্দা মন্দ করতেন না। একবার তিনি একজন আরব মহিলাকে বিয়ে করলেন। বিলাল ইবন আবী বুরদা তাঁকে এ জন্য চাবুক মারে যে, দাস হয়ে আরব মহিলাকে বিয়ে করেছে। বাক্কার বলেন, আমি এ ঘটনার পরেও ইবন 'আওনের মুখে বিলাল সম্পর্কে একটি কথাও শুনিনি। একবার কিছু লোক বললো, বিলাল আপনার সঙ্গে দারুণ অসদাচরণ করেছে। জবাবে বললেন ঃ একজন মানুষ মজলুম হয়, কিন্তু সেই ঐ যুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নিজেই শেষে জালিম হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যে কেউই আমার চেয়ে বেশি বিলালের প্রতি কঠোর নও। কিন্তু আমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নিজেই জালিম হতে পারবো না।[২৫]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি ভালোবাসা

হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) তিনি সীমাহীন ভালোবাসতেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আশা ছিল স্বপ্নে অন্তত একবার তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা। আল্লাহ তাঁর এ নেক আশা পূর্ণ করেন। মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পূর্বে স্বপ্নের মধ্যে এই দীদার সম্পন্ন হয়। এই ঘটনায় তিনি এতই আবেগ আপ্লুত হন যে, ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে যান এবং খুশীর আতিশয্যে মাটিতে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পান। কিন্তু একটি মহা সৌভাগ্যের স্মৃতিকে ধরে রাখার মানসে সেই আঘাতের কোন চিকিৎসা করাননি।[২৬]

ওফাত

অবশেষে এই আঘাত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে এই রোগের সকল কষ্ট সহ্য করেন। বাক্কার ইবন মুহাম্মাদ বলেন, রোগগ্রস্ত অবস্থায় তিনি বাঘের চেয়েও বেশি ধৈর্য ও সহনশীল ছিলেন। এ সময় মুখ থেকে একটি অভিযোগমূলক শব্দও উচ্চারিত হয়নি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত তিনি সচেতন ছিলেন। আমার ফুফু উম্মু মুহাম্মাদ বিন্ত আবদিল্লাহর কথামত আমি ইবন 'আওনের অন্তিম মুহূর্তে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে তাঁকে শুনিয়েছিলাম। আমি মৃত্যুর সময় তাঁর চেয়ে বেশি

---

২৪. প্রাগুক্ত-৭/২৮

২৫. প্রাগুক্ত-৭/২৫; তাহযীব আত-তাহযীব-৫/৩৪৮

২৬. তাবাকাত-৭/২৫

বুদ্ধিমান আর কাউকে দেখিনি। যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল ততক্ষণ কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর যিক্র করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সকল সমস্যার সমাধান করে দেন। হিজরী ১৫১ সনের রজব মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।[২৭] জানাযায় এত বেশি লোকের সমাগম হয় যে, মসজিদের মূল ভবনসহ গোটা আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। মিহরাবে খাটিয়ায় লাশ রেখে সালাতুল জানাযা আদায় করা হয়। জানাযার নামায পড়ান জামীল ইবন মাহফূজ আল-আযদী।[২৮]

উত্তরাধিকার

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আওনের (রহ) কোন নগদ অর্থ ছিল না। দু'টি বাড়ী ছিল যার এক-পঞ্চমাংশ নিকটতম আত্মীয়-বন্ধুদের অনুকূলে অসীয়াত করে যান। দশ হাজারের কিছু বেশি দিরহামের ঋণ ছিল। তা পরিশোধ করার পর তার অসীয়াত পূরণ করা হয়।[২৯]

অত্যন্ত সুদর্শন মানুষ ছিলেন। মোঁচ এত ঘন ছিল না। তবে ছাঁটতেন। পরিচ্ছন্ন রুচি ও মেজাজের ছিলেন। কোমল ও পাতলা কাপড়ের সুন্দর পোশাক পরতেন। খুব বেশি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। পূর্ণ পোশাকে ঘর থেকে বের হতেন। ওজু ও আহারের সময় খাদিম রুমাল এগিয়ে দিত, তা দিয়ে তিনি হাত-মুখ মুছে ফেলতেন। রসুনসহ দুর্গন্ধ জাতীয় খাবার খুবই অপছন্দ করতেন। যে খাবারে রসুন থাকতো তা স্পর্শ করতেন না। একবার দাসী খাবার তৈরি করে সামনে আনে। তিনি রসুনের গন্ধ পেয়ে দাসীকে জিজ্ঞেস করেন। সে স্বীকার করে। অত্যন্ত সহনশীল প্রকৃতির ছিলেন তাই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শুধু এতটুকু বলেন যে, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন! এ খাবার আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও।[৩০]

---

২৭. তাহযীব আল-কামাল-১০/৩৯৭-৩৯৮

২৮. প্রাগুক্ত; তাবাকাত-৭/২৯-৩০; তাবি'ঈন-২৪৬

২৯. তাবাকাত-৭/৩০

৩০. প্রাগুক্ত-৭/৩৬; তাবি'ঈন-২৪৬

ইয়াস ইবন মু'আবিয়া (রহ)

বর্তমান সৌদি আরবের নাজদ-এর অন্তর্গত আল-ইয়ামামা প্রদেশে হিজরী ৪৬ সনে ইয়াস ইবন মু'আবিয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে পরিবারের সাথে বসরায় চলে যান এবং সেখানে বেড়ে ওঠেন ও শিক্ষা লাভ করেন। জীবনের প্রথম ভাগে মাঝে মাঝে দিমাশকে গেছেন। তাঁর সময়ে জীবিত মহান সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। শৈশবেই তাঁর মধ্যে প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও সৌভাগ্যের লক্ষণ দেখা যায়। তখনই তাঁর মেধা ও মননের কথা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।[১]

ইয়াস-এর ডাকনাম আবূ ওয়াছিলা এবং পিতার নাম মু'আবিয়া ইবন কুবরা। ইয়াস তাঁর যুগের একজন বিখ্যাত কাজী ছিলেন।

হাদীছ ও ফিক্‌হ

হাদীছ বর্ণনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। তার অর্থ এ নয় যে, এ ক্ষেত্রে তাঁর কোন অবদান নেই। ইবন সা'দ বলেছেন, তিনি অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২] তিনি পিতা মু'আবিয়া, আনাস ইবন মালিক, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, আবূ মিযলায (রহ) প্রমুখের নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। আইয়ূব, দাউদ ইবন আবী হিন্দ, হুমাইদ আত-তাবীল, হাম্মাদ শা'বান, শু'বা, মু'আবি ইবন 'আবদিল কারীম (রহ) প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁর ছাত্র। ফিক্‌হ ছিল তাঁর বিশেষ অধীত বিষয়। এ শাস্ত্রে তাঁর ছিল বিশেষ অবস্থান। তাঁর জীবনীকারগণ তাঁকে ফকীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন

ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অত্যধিক যোগ্যতার কারণে উমাইয়্যা শাসনামলে বসরার কাজী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তাঁর নিয়োগ লাভের পর হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। হযরত হাসানকে (রহ) দেখে তিনি কাঁদতে শুরু করেন।[৪] উল্লেখ্য যে, হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) তাঁকে বসরার কাজী নিয়োগ করেন।[৫]

তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধা, বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। ইবন সা'দ লিখেছেন ঃ

---

১. সুওয়ারুল মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৬৮-৬৯

২. আত-তাবাকাত-৭/৫

৩. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব–১/৩৯০

৪. আত-তাবাকাত–৭/৫

৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন–১/৯৮, টীকা নং-১

كان عاقلا من الرجال فطنا ؟ –তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মানুষ। প্রখ্যাত তাবি'ঈ হযরত ইবন সীরীনের (রহ) সামনে তাঁর প্রসঙ্গে কোন কথা উঠলে বলতেন, তিনি তো একজন বাস্তব বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর সমকালীন লোকেরা বলতো, প্রত্যেক শতকে একজন অতি বড় বুদ্ধিমান মানুষের জন্ম হয়। এই শতকের সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি হলেন ইয়াস ইবন মু'আবিয়া (রহ)।[৬] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন, তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রবাদে পরিণত হয়। যেমন বিখ্যাত কবি আবূ তাম্মামের একটি শ্লোকে এসেছে।[৭]

إقدام عمرو في شجاعة عنتر + في حلم أحنف في ذكاء إياس

'(প্রশংসিত ব্যক্তি আহমাদ ইবন আল-মু'তাসিম) ছিলেন, সাহসী পদক্ষেপে 'আমর ইবন মা'দিকারিব, বীরত্ব-সাহসিকতায় গানতার, ধৈর্য-সহনশীলতায় আহনাফ ইবন কায়স ও বুদ্ধি-বিচক্ষণতায় ইয়াস। অন্য একটি বর্ণনায় في سماحة حاتم (বদান্যতায় হাতিম তাঈ) এসেছে।

বিচার কাজের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনেকটা নির্ভর করে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার উপর। এ কারণে ইয়াস ছিলেন উমাইয়্যা যুগের শ্রেষ্ঠ ও সফল বিচারকদের একজন। তাঁর প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বহু চমকপ্রদ ঘটনা সীরাতের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার বুদ্ধিমত্তার কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

একবার এক বিচার কাজের প্রয়োজনে চারজন মহিলা তাঁর আদালতে উপস্থিত হয়। তিনি তাদেরকে দেখামাত্র বলে দেন, এই চারজনের একজন গর্ভবতী, একজন তাঁর শিশু-সন্তানকে দুধ পান করায়, একজন বিবাহিত এবং একজন কুমারী। উপস্থিত লোকেরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেল, তাঁর ধারণা সঠিক। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কিসের ভিত্তিতে এ অনুমান করলেন? বললেন, গর্ভবতী মহিলাটি যখন কথা বলছিল তখন তার কাপড় পেট থেকে উঠে যাচ্ছিল, যে শিশুকে দুধ পান করায় তার বুক দুলছিল, বিবাহিত যে, সে চোখে চোখ রেখে কথা বলছিল এবং কুমারী চোখ নীচু করে কথা বলছিল, আর আমি এসব আলামত দ্বারাই তাদের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলাম।[৮]

একবার এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির নিকট কিছু অর্থ গচ্ছিত রাখে। যখন সে তার অর্থ ফেরত চায়, সে গচ্ছিত রাখার কথা অস্বীকার করে। অর্থের মালিক ইয়াসের আদালতে মামলা দায়ের করে। ইয়াস লোকটিকে বলেন, তুমি এখন চলে যাও এবং বিষয়টি গোপন রাখ। বিবাদী যেন বিষয়টি কোনভাবে জানতে না পারে যে, তুমি আমার নিকট এসেছিলে। দুদিন পরে আবার আসবে। এভাবে বাদীকে ফিরিয়ে দিয়ে ইয়াস বিবাদীকে

---

৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৯০

৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৪/৭৯; শাযারাত আয যাহাব-১/১৬০

৮. ইবন আল-জাওযী, আত-তুরুক আল-হিকমিয়্যা-২৮-২৯; তাবি'ঈন-৫০

ডেকে পাঠান। সে উপস্থিত হলে তাকে বলেন, আমার নিকট অনেক অর্থ এসে গেছে, তোমার ঘরটি বেশ মজবুত। তাই আমি আমার কিছু অর্থ তোমার নিকট আমানত রাখতে চাই। সে বলে, ঠিক আছে রাখুন। ইয়াস বললেন, এত অর্থ রাখার জন্য কোন স্থান নির্ধারণ করে বহন করার জন্য লোক সঙ্গে করে আবার এসো। লোকটি চলে গেলে ইয়াস বাদীকে ডেকে এনে বললেন, এবার তুমি তোমার আমানতদারের নিকট যেয়ে তোমার অর্থ ফেরত চাও। যদি দেয় তাহলে তো ভালো, অন্যথায় বলবে, আমার সম্পদ ফিরিয়ে দাও, নইলে আমি কাজী ইয়াসকে বলবো। একথার পর লোকটি তার অর্থ ফিরিয়ে দেয়। এরপর পূর্বের কথামতো লোকটি ইয়াসের নিকট আসে অর্থ নেওয়ার জন্য। কাজী ইয়াস তাঁকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে বিদায় দেন।[৯]

যৌবনে ইয়াস একাগ্রচিত্তে জ্ঞান ও গবেষণায় মেতে ওঠেন এবং অল্প কালের মধ্যে এতখানি পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন যে, অনেক বড় বড় শায়খ তাঁর নিকট এসে তাঁর ছাত্রের খাতায় নাম লেখাতে শুরু করেন। তখনও কিন্তু তিনি একজন তরুণ।

একবার 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান বসরা ভ্রমণে গেলেন। তখনও তিনি খলীফা হননি। ইয়াসের তখন দাড়ি-গোঁফ গজায়নি। একদিন 'আবদুল মালিক দেখেন, তরুণ ইয়াস আগে আগে চলছেন, আর পিছনে পিছনে তাঁকে অনুসরণ করছেন সবুজ জোব্বা-পাগড়ী পরিহিত লম্বা দাড়িওয়ালা চারজন কারী। এ দৃশ্য দেখে 'আবদুল মালিক বললেন, আফসোস এই লম্বা দাড়িওয়ালা লোকদের জন্য! তাদের কেউ একজন সামনে না গিয়ে এই যুবককে সামনে দিয়েছে? তারপর তিনি ইয়াসকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ওহে নও-জোয়ান! তোমার বয়স কত?

ইয়াস বললেন ঃ আল্লাহ আমীরকে দীর্ঘজীবি করুন! আমার বয়স উসামা ইবন যায়দের (রা) সেই বয়সের সমান যখন রাসূল (সা) তাঁকে একটি বাহিনীর অধিনায়ক করেন, আর সেই বাহিনীতে ছিলেন আবু বাকর ও উমার (রা)।

জবাব শুনে 'আবদুল মালিক বলেন ঃ ওহে নও-জোয়ান! তুমি সামনে চল, তুমি সামনে চল। আল্লাহ তোমাকে আরো বরকত, আরো সমৃদ্ধি দান করুন![১০]

একবার মানুষ রমযানের চাঁদ দেখার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে ফাঁকা ময়দানে গেছে। তাঁদের মধ্যে মহান সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকও (রা) আছেন। তখন তিনি বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত। বয়স প্রায় একশো বছরের কাছাকাছি। মানুষ আকাশে তন্ন তন্ন করে কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু আনাস (রা) আকাশের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থেকে এক সময় বলতে লাগলেন! আমি নতুন চাঁদ দেখেছি। এই যে এখানে। হাত দিয়ে ইশারা করেও দেখাতে লাগলেন। কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পেল না। পাশেই ইয়াস ছিলেন। তিনি হযরত আনাসের (রা) দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাঁর ভ্রূর একটি লম্বা পশম

---

৯. প্রাগুক্ত-২৯

১০. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৭১

তাঁর চোখের উপর ঝুলে পড়েছে। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অনুমতি নিয়ে হাত দিয়ে সেই পশমটি সরিয়ে ভ্রূটি সমান করে দেন। তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন! এখন কি চাঁদ দেখতে পাচ্ছেন, হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী? আনাস (রা) আবার আকাশের দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন ঃ না, আমি তো চাঁদ দেখছি না, আমি তো দেখছি না।[১১]

হযরত ইয়াসের জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ মেধার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাঁর নিকট ছুটে আসতে থাকে ইল্‌ম ও দীন (জ্ঞান ও ধর্ম) বিষয়ে তাদের নানা প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান জানার উদ্দেশ্যে। অনেকে আবার আসে কুট-বিতর্কে জড়িয়ে তাঁকে অক্ষম করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বর্ণিত হয়েছে, একবার এক আঞ্চলিক নেতা তাঁর মজলিসে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে ঃ আবূ ওয়াছিলা! নেশা উদ্রেককারী বস্তু সম্পর্কে আপনার মত কি? বললেন ঃ সবই হারাম।

লোকটি বললো ঃ হারাম হওয়ার কারণ কি? কিছু খোরমায় পানি ঢেলে তা গরম করা ছাড়া তো তাতে আর কিছু মেশানো হয়নি। পানি ও খোরমা দুটি জিনিসই তো হালাল। তাহলে তা হারাম হবে কেন?

ইয়াস বললেন ঃ ওহে নেতাজি! আপনার বক্তব্য কি শেষ হয়েছে?

লোকটি বলল ঃ হয়েছে।

ইয়াস বললো ঃ যদি আমি এক অঞ্জলী পানি আপনার শরীরে ছুড়ে মারি তাতে কি আপনি কষ্ট পাবেন?

নেতা বললেন ঃ না।

ইয়াস বললেন ঃ যদি আমি এক মুট ধূলি আপনার দেহে ছুড়ে মারি তাতে কি আপনি কষ্ট পাবেন?

নেতা বললেন ঃ না।

ইয়াস বললেন ঃ যদি এক মুট ভূষি ছুড়ে মারি?

নেতা বললেন ঃ তাতেও আমি কষ্ট পাব না।

ইয়াস বললেন ঃ যদি আমি এই জিনিসগুলো ভালো করে এক সাথে মিশিয়ে রোদে শুকিয়ে শক্ত করে নেই এবং আপনার দেহে ছুড়ে মারি তাতে কি আপনি কষ্ট পাবেন?

নেতা বললেন ঃ হাঁ, কষ্ট পাব। আপনি আমাকে শেষ করে দিলেন।

ইয়াস বললেন ঃ মদের বিষয়টিও এমন।

যখন তার বিভিন্ন উপাদান বিশেষ প্রক্রিয়ায় একত্র করা হয়েছে তখন তা নেশা উদ্রেককারী বস্তুতে পরিণত হয়ে হারাম হয়ে গেছে।[১২]

---

১১. প্রাগুক্তি-৭২

১২. প্রাগুক্তি-৭৩-৭৪; তাহযীব আল-কামাল-২/৩৭২

ছোট বেলায় তিনি একটি মকতবে এক ইয়াহূদী শিক্ষকের নিকট অংক শিখতেন। একদিন ইয়াসের উপস্থিতিতে সেই শিক্ষকের নিকট তার কয়েকজন ইয়াহূদী বন্ধু আসলো। তারা বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। ইয়াস চুপ করে এমনভাবে শুনলেন যেন তিনি কিছুই বোঝেন না, কিছুই জানেন না। আলোচনার এক পর্যায়ে শিক্ষক তার বন্ধুদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা কি মুসলমানদের এই বিশ্বাসের ব্যাপারে অবাক হবে না যে, তারা জান্নাতে পানাহার করবে কিন্তু মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না? কথাটি শোনামাত্র ইয়াস আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ উস্তাদ! আপনারা যে বিষয়ে আলোচনা করছেন সে সম্পর্কে আমাকে কিছু কথা বলার অনুমতি দেবেন কি?

উস্তাদ বললেন ঃ হাঁ, বল।

ইয়াস বললেন ঃ এ পৃথিবীতে আমরা যা কিছু পানাহার করি তা সবই কি মল-মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়?

উস্তাদ বললেন ঃ না।

ইয়াস প্রশ্ন করলেন ঃ তাহলে যা বের হয় না তা কোথায় যায়?

উস্তাদ বললেন ঃ দেহের খাদ্য হিসেবে ক্ষয় হয়ে যায়।

ইয়াস বললেন ঃ পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু খায় তার কিছু অংশ যদি দেহের খাদ্য হিসেবে ক্ষয় হয়ে যেতে পারে তাহলে জান্নাতে সব কিছু খাদ্য হিসেবে ক্ষয় হলে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?

উস্তাদ তাঁর হাতটি ইয়াসের পিঠের উপর রেখে বললেন ঃ বালক! আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। মতান্তরে উস্তাদ তাঁকে বলেন, তুমি একটা শয়তান।[১৩]

হযরত ইয়াস ইবন মু'আবিয়া (রহ) কাজী হওয়ার পর মাঝে মধ্যে এমন সব পরিবেশ-পরিস্থিতির মুখোমুখী হন যেখানে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও অভিনব কর্মপন্থার প্রকাশ ঘটে। তিনি তাঁর অতুলনীয় মেধা ও কর্মকৌশলের সাহায্যে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করেন। একবার দুব্যক্তি একটি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তাঁর নিকট এলো। একজন দাবী করলো সে অন্যজনের নিকট কিছু অর্থ গচ্ছিত রেখেছিল। কিন্তু যখন সে তার অর্থ ফেরৎ চায় সে তা দিতে অস্বীকার করে।

ইয়াস বিবাদীর নিকট গচ্ছিত রাখার বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে, যদি আমার প্রতিপক্ষের কোন প্রমাণ থাকে, সে যেন তা উপস্থাপন করে। তা না হলে আমাকে কসম করে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। লোকটির ভাবগতিক দেখে ইয়াস শঙ্কিত হলো এই ভেবে যে, সে গচ্ছিত অর্থের পুরোটাই হজম করে ফেলতে চাচ্ছে। এজন্য তিনি বাদীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ কোন্ জায়গায় বসে তার কাছে অর্থ আমানত রেখেছিলে?

---

১৩. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৬৯-৭০ তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৭৩

বললো ঃ অমুক জায়গায়।

ইয়াস ঃ সেখানে কি কি আছে?

বললো ঃ একটি বড় গাছ আছে। তার নিচে বসে আমরা কিছু খাবার খাই, তারপর যাওয়ার সময় আমি আমার অর্থ তার হাতে তুলে দিই।

ইয়াস ঃ তুমি সেই গাছের নিচে যাও। হতে পারে সেখানে গেলে তোমার মনে পড়বে তোমার অর্থ তুমি কোথায় রেখেছো বা ফেলে এসেছো। তারপর ফিরে এসে সেখানে কি দেখলে তা আমাকে জানাবে।

লোকটি চলে গেল। ইয়াস বিবাদীকে বললেন ঃ তোমার বন্ধু ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি আমার এখানে বস। তারপর তিনি অন্য দুজন বাদী-বিবাদীর দিকে মনোযোগী হলেন এবং তাদের বক্তব্য শুনতে লাগলেন। তবে ফাঁকে ফাঁকে আড় চোখে পাশে বসা পূর্বের বিবাদীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। যখন তিনি বুঝলেন লোকটি নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গেছে তখন হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করেন ঃ যেখানে সে তোমার হাতে তার অর্থ তুলে দিয়েছিল তুমি কি মনে কর এতক্ষণে সে সেখানে পৌঁছে গেছে? লোকটি কোন রকম ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই বলে উঠলো ঃ অসম্ভব। জায়গাটি বহু দূরে।

সাথে সাথে ইয়াস বলে উঠলেন ঃ ওরে আল্লাহর দুশমন! অর্থ গ্রহণের কথা অস্বীকার করছো, অথচ যেখান থেকে তা গ্রহণ করেছো সে স্থানটি চেন? আল্লাহর কসম! তুমি একজন মিথ্যাবাদী, গাদ্দার।

ঘটনার আকস্মিকতায় লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল এবং অর্থ আত্মসাতের কথা স্বীকার করলো। ইয়াস তাকে কারারুদ্ধ করেন এবং তার নিকট থেকে সকল অর্থ আদায় করে বাদীকে ফেরত দেন।[১৪]

আরেকবার একই ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটে। বিবাদমান দুব্যক্তি তাঁর নিকট আসে বিচারের জন্য। তিনি তখন কাজী। ঘটনাটি হলো দুটি 'কাতীফা' নিয়ে। 'কাতীফা' হলো মখমলের রুমাল যা আরবরা মাথার উপর রেখে দুদিক দুকাঁধের উপর ছেড়ে দেয়। তার মধ্যে একটি হলো সবুজ রংয়ের, নতুন ও দামী। আর অন্যটি ছিল লাল রংয়ের পুরানো ও কম মূল্যের।

বাদী বললো ঃ আমি একটি হাউজে গোসলের জন্য গেলাম। আমার অন্য কাপড়-চোপড়ের সাথে সবুজ রুমালটিও হাউজের পাশে রেখে হাউজে নামলাম। আমার প্রতিপক্ষ আমার পরে আসলেন এবং তিনিও তার একটি লাল রুমাল ও অন্য কাপড়-চোপড় আমার কাপড়ের পাশে রেখে হাউজে নামলেন। কিন্তু তিনি গোসল সেরে আমার আগে হাউজ থেকে উঠে গেলেন। তিনি তাঁর কাপড় পরলেন এবং আমার সবুজ রুমালটি মাথায় ফেলে দুকাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আমি তাঁর পরই হাউজ থেকে উঠলাম এবং আমার রুমালটি না দেখে পিছু ধাওয়া করে তাঁকে ধরলাম এবং রুমালটি ফেরৎ চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন ঃ রুমালটি তার। আমি আমার রুমালটি ফেরৎ চাই।

---

১৪. আত-তুরুক আল-হিকমিয়্যা-২৯; তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৭৯

ইয়াস বিবাদীকে বললেন ঃ তোমার বক্তব্য কি? লোকটি বললো ঃ এটি আমার রুমাল এবং আমার হাতেই আছে।

ইয়াস বাদীকে বললেন ঃ তোমার কি কোন সাক্ষী-প্রমাণ আছে?

লোকটি বললো ঃ না। কোন সাক্ষী প্রমাণ নেই।

এবার ইয়াস তাঁর দারোয়ানকে একটি চিরুনী আনতে বললেন। চিরুনী আনলে তিনি বাদী-বিবাদী উভয়ের মাথায় ভালো করে চিরুনী করলেন। তাতে একজনের মাথা থেকে লাল পশমী রুমালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বের হলো এবং অন্যজনের মাথা থেকে বের হলো সবুজ পশমের অংশ। বিষয়টি তিনি বুঝে ফেললেন এবং নতুন সবুজ রুমালটি বাদীকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।[১৫]

তবে ইয়াসের এত মেধা, চিন্তাশক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা থাকা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে অন্যের যুক্তির কাছে হেরে গেছেন। এ রকম একটি ঘটনার কথা তিনি নিজেই এভাবে বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ কখনো আমার উপর বিজয়ী হতে পারেনি। আর তা হলো আমি যখন বসরার কাজী তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক বাগানটির মালিক অমুক। তারপর সে বাগানটির চৌহদ্দি বর্ণনা করলো।

আমি তার কাছে জানতে চাইলাম ঃ বাগানে গাছের সংখ্যা কত?

সে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবলো। তারপর মাথা সোজা করে আমাকে প্রশ্ন করলো ঃ আমাদের মাননীয় কাজী সাহেব এই এজলাসে কত বছর ধরে বসেন?

বললাম ঃ এত বছর।

সে বললো ঃ যে ঘরে আপনার এজলাস হয় সে ঘরের ছাদের কড়িকাঠের সংখ্যা কত?

বললাম ঃ আমার তো তা জানা নেই। আমি তার যুক্তির কাছে হেরে গেলাম। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম।[১৬]

ইয়াস বলতেন ঃ [১৭]

لو جلست علي باب واسط لم يمربي أحد إلا أخبرتكم

"আমি যদি ওয়াসিত নগরের প্রধান প্রবেশ দ্বারে বসি তাহলে আমার পাশ দিয়ে যেই অতিক্রম করুক আমি তার কাজ ও পেশা কি তা তোমাদেরকে বলতে পারবো।"

আবুল হাসান আল-মাদায়িনী বলেন, একদিন ইয়াস কোন কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত তিন মহিলাকে দেখলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন ঃ এদের মধ্যে এটি গর্ভবতী, এটি স্তন্যদানকারিণী এবং এটি কুমারী, একথা শুনে এক ব্যক্তি মহিলা তিনজনের নিকট গেল এবং তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে ইয়াসের কথার সত্যতা পেল। তখন ইয়াসকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ এ কথা আপনি কীভাবে জানলেন? বললেন ঃ তারা যখন ভয় পেয়েছে তখন

---

১৫. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৭৯

১৬. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৭৬

১৭. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৮৬

অতি স্বাভাবিকভাবে তাদের নিজ নিজ হাত তাদের দেহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে পৌঁছে গেছে, আর আমি তা দেখেই তাদেরকে চিনে ফেলেছি। স্তন্যদানকারী তার হাত তার দু'স্তনের উপর রেখেছে, গর্ভবতী তার পেটের উপর এবং কুমারী তার তল পেটের নীচে রেখেছে।[১৮]

আল-আসমা'ঈ বলেন, ইয়াস একদিন একজন অপরিচিত লোককে দেখে ডাক দেন ঃ ওহে ইয়ামামার অধিবাসী ব্যক্তি! সে বললো ঃ আমি ইয়ামামার লোক নই। তিনি এবার ডাকলেন ঃ ওহে আল-আদাখার অধিবাসী! লোকটি বললো ঃ আমি আদাখার লোক নই। এবার তিনি ডাকলেন ঃ ওহে দারিয়্যার অধিবাসী! লোকটি তাঁর নিকট এগিয়ে গেল। তিনি তার পরিচয় জানতে চাইলেন। সে বললো ঃ আমার জন্ম ইয়ামামায়, বড় হয়েছি আদাখায় এবং পরে দারিয়্যায় চলে গিয়েছি।[১৯]

হুমাইদ আত-তাবীল বলেন, ইয়াস ইবন মু'আবিয়া কাজীর দায়িত্ব গ্রহণের পর হাসান আল-বাসরী (রহ) সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাঁকে দেখে ইয়াস কাঁদতে শুরু করেন। হাসান জিজ্ঞেস করেন ঃ কাঁদছেন কেন? ইয়াস এই হাদীছটি উল্লেখ করেন ঃ[২০]

القضاة ثلاثة، إثنان في النار وواحد في الجنة

–"কাজী তিন প্রকার ঃ দুই প্রকার জাহান্নামী এবং এক প্রকার জান্নাতী হবে।" হাসান বলেন ঃ আল্লাহ দাউদ ও সুলায়মানের (আ) বিচার কাজের বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দাউদের ভুলের জন্য তিরস্কার তো করেননি। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন এ আয়াত ঃ[২১]

وَدَاوِدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْث إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، وَكُلاًّ اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا.

"এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত সম্পর্কে; তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল সম্প্রদায়ের কোন মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার।

অতঃপর আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।"

এ আয়াতে আল্লাহ সুলায়মানের প্রশংসা করেছেন, তবে দাউদের নিন্দা করেননি।[২২]

---

১৮. প্রাগুক্ত-২/৩৮৩

১৯. প্রাগুক্ত-২/৩৮৪

২০. আবূ দাউদ, কিতাব আল-আকাদিয়্যাতি, বাব ঃ আল-কাদী ইউখতিউ, হাদীছ নং ৩৫৭৩; আত-তিরমিযী, কিতাব আল-আহকাম (১৩২২); ইবন মাজা, কিতাব আল-আহকাম (২৩১৫)

২১. সূরা আল-আম্বিয়া'-৭৮-৭৯

২২. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৭৬

কাজীদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা

কোন বিভাগ বা শাখার লোকের তার নিজের বিভাগ বা শাখার সমপেশার লোকদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা বিশেষ যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়। ইয়াস তাঁর সমকালীন সকল মুফতী ও কাজীর দোষ-ত্রুটি ও উত্তম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। হাবীব ইবন শুহাইদ বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি ইয়াসের নিকট আসে এবং তার একটি মামলার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য কার কাছে যাবে সে ব্যাপারে তাঁর মতামত চায়। তিনি বলেন, তুমি যদি এর সঠিক ফয়সালা চাও তাহলে 'আবদুল মালিক ইবন ইয়া'লার নিকট যাও। সঠিক অর্থে তিনি একজন কাজী। আর যদি শুধু ফাতওয়া নিতে চাও তাহলে হাসান আল-বাসরীর নিকট যাও। তিনি আমার পিতার ও আমার উসতাদ। আর যদি সন্ধি ও চুক্তি করতে চাও তাহলে হুমাইদ আত-তাবীলের নিকট যাও। তাঁর সন্ধির পদ্ধতি এ রকম যে, তিনি তোমাকে বলবেন, তুমি তোমার অধিকার কিছু নিয়ে কিছু ছেড়ে দাও। আর যদি মামলাবাজি করতে চাও তাহলে সালিহ্ আদ-দাওসীর নিকট যাও। তিনি তোমাকে বলবেন, প্রতিপক্ষের অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার কর এবং নিজের যতটুকু অধিকার তার চেয়ে বেশি দাবী কর। আর যারা উপস্থিত ছিল না তাদেরকে সাক্ষী মান।[২৩]

পরিচ্ছন্ন 'আকীদা-বিশ্বাস এবং বিদ'আতীদের সাথে তর্ক-বাহাছ

এত প্রখর মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আকীদার ক্ষেত্রে কোন রকম নতুনত্ব ও সংযোজন-বিয়োজন ভীষণ অপছন্দ করতেন। যারা এমন করতো তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান করতেন। তিনি বিদ'আতী, বিশেষ করে কাদরিয়্যাদের সাথে তর্ক-বাহাছ করতেন। কাদরিয়্যাদের 'আকীদা হলো, আল্লাহ আদিল বা ন্যায়বিচারক। এতটুকু পরিমাণ তো সঠিক ছিল। তবে এই মূলনীতির ভিত্তিতে যে সকল কর্ম দৃশ্যতঃ যুল্ম ও অন্যায় বলে মনে হয় তা আল্লাহর প্রতি আরোপ করতো না। এ ব্যাপারে তারা এত বাড়াবাড়ি করতো যে, আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতাও অস্বীকার করা হতো। একবার কাদরিয়্যাদের সাথে তাঁর তর্ক-বাহাছ হয়। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, যুল্ম কাকে বলে? তারা বলে, কারো এমন কোন জিনিস নিয়ে নেওয়া যা তার নেওয়ার অধিকার নেই। তিনি বললেন, সব জিনিসই তো আল্লাহর, অর্থাৎ সব জিনিসই যখন আল্লাহর তখন তার কোন কাজকে যুল্ম বলা সঠিক নয়।[২৪]

তাঁর কিছু বাণী খুবই মনোমুগ্ধকর। তিনি বলতেন ঃ যার মধ্যে কোন দোষ নেই সে নির্বোধ। একজন জিজ্ঞেস করে ঃ আপনার মধ্যে কি দোষ আছে? বললেন ঃ অতিরিক্ত কথা বলা।[২৫] তিনি বলতেন, আমি মানুষের সকল গুণ পরীক্ষা করেছি। তার মধ্যে সত্য কথা বলাকে শ্রেষ্ঠ গুণ হিসেবে পেয়েছি।[২৬]

---

২৩. প্রাগুক্তি-২/৩৭৫; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৯০

২৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৯২

২৫. আত-তাবাকাত-৭/৫

২৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৯১

যে সকল বাগ্মী, খতীব, ফকীহ্ ও আমীর উমারা অনর্গল কথা বলতেন; কিন্তু খুব কমই ভুল করতেন তাঁদের একটি বর্ণনা আল-জাহিজ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইয়াসের নামটিও তিনি উল্লেখ করেছেন। কূফার কাজী 'আবদুল্লাহ ইবন শুবরামা (মৃত্যু-১৪৪ হি.) একবার হযরত ইয়াসের অতি কথনের কারণে বলেন ঃ[২৭]

أنا أنت لا نتفق، أنت لا تشتهي أن تسكت وأنا لا أشتهي أن أسمع.

"আমি ও আপনি একমতে পৌঁছাতে পারবো না। আপনি চুপ করতে চান না, আর আমি শুনতে চাই না।'

একবার তিনি অতি সাধারণ বেশ-ভূষায় দিমাশকের মসজিদে কুরায়শদের একটি আসরে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে চিনতে না পেরে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভাব দেখালো। যখন তারা চিনতে পারলো তখন ক্ষমা চাওয়ার সুরে তাঁকে বললো! অপরাধ আমাদের ও আপনার উভয়ের সমান। কারণ, আপনি এসেছেন একজন রিক্ত-নিঃস্ব দরিদ্রের পোশাক পরে। তবে আমাদের সাথে কথা বলেছেন একেবারে রাজা-বাদশাদের ভাষায়।[২৮]

আল-জাহিজ বলেন, আমি দেখেছি মানুষ ইয়াস ইবন মু'আবিয়ার একটি জবাব খুবই পছন্দ করে। আর তা হলো, একবার তাঁকে বলা হলো, আপনি আপনার কথার কারণে নিজেই একটা বিস্ময় হয়ে গেছেন, এছাড়া আপনার মধ্যে আর কোন দোষ নেই। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ আমার কথা আপনাদেরকে বিস্মিত করে? লোকেরা বললো ঃ হাঁ, বিস্মিত করে। তিনি বললেন ঃ আমি যা বলি এবং আমার কথা শুনে আপনারা যে বিস্মিত হন সে জন্য আমি নিজেই সর্বাধিক বিস্মিত হওয়ার উপযুক্ত।[২৯] লোকেরা একদিন তাঁকে বললো ঃ মানুষ আপনার বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত। তিনি বললেন ঃ মানুষ বিস্মিত না হলে আমি তার দ্বারা বিচার কাজ করতাম না।[৩০]

একবার তাকে বলা হলো, বেশি কথা বলা ছাড়া আপনার মধ্যে আর কোন দোষ নেই। তিনি জানতে চাইলেন, আমার যেসব কথা আপনারা শোনেন তা কি সঠিক না ভুল? বলা হলো ঃ সঠিক। তখন তিনি বলেন ঃ فالزيادة من الخير خير. ভালোর আধিক্য তো ভালো।[৩১]

ইমাম আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন, 'উমার ইবন হুবায়রা যখন ইয়াসকে কাজী হিসেবে নিয়োগ দিতে চাইলেন তখন ইয়াস বললেন : আমি এ পদের যোগ্য নই। প্রশ্ন করা হলো : কেন? বললেন ঃ প্রথমত: আমার ভাষার জড়তা, দ্বিতীয়ত: আমি দেখতে অসুন্দর, কুৎসিত এবং তৃতীয়ত: লোহার মত শক্ত প্রকৃতির। ইবন হুবায়রা বললেন : কঠোরতা চাবুক সোজা করে দেবে। আর আপনি যে অসুন্দর, তাতে কি হয়েছে, আমি

---

২৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৯৮, ২/৩১৫

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৮৮

৩১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৯৯

তো আপনার দ্বারা কাউকে সুন্দর করতে চাচ্ছিনা। আর ভাষার যে জড়তার কথা বলছেন, তা আপনি তো আপনার মনের কথা প্রকাশ করছেন।

আল-জাহিজ বলেন : আসলে ইয়াসের যদি জড়তা থাকতো তাহলে তিনি বেশি কথা বলা পরিহার করতেন। আর একারণে আমরা এমন কাউকে জানি না যিনি ইয়াসের ভাষা জড়তার কথা বলেছেন। বরং এর বিপরীতটি দেখা যায়। তাঁর প্রতি বেশি কথা বলার দোষারোপ করা হয়।[৩২] 'উতবা ইবন 'উমার বলেছেন, আমি বহু মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি যে, তা প্রায় একে অপরের কাছাকাছি। ব্যতিক্রম দেখেছি কেবল হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ও ইয়াস ইবন মু'আবিয়ার ক্ষেত্রে। অন্যদের তুলনায় তাঁদের দু'জনের বুদ্ধির পাল্লা ভারী পেয়েছি।[৩৩]

একবার এক ব্যক্তি ইয়াসকে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি বিচার কাজে দ্রুততা করেন কেন? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন ঃ তোমার একটি হাতে আঙ্গুল কয়টি? বললো ঃ পাঁচটি। ইয়াস বললেন ঃ খুব দ্রুত জবাব দিয়েছো। লোকটি বললো ঃ যে জেনে বুঝে হত্যা করে সে তো দ্রুত স্বীকার করে না।

ইয়াস বললেন ঃ তোমার প্রশ্নের এটাই আমার জবাব।[৩৪]

তিনি প্রায়ই জাহিলী ও ইসলামী যুগের বিখ্যাত কবি আন-নাবিগা আল-জা'দীর (রা) নিম্নের শ্লোকটি আওড়াতেন ঃ[৩৫]

أبى لى البلاءُ وأنى امرؤ إذا ما تَبَيَّنْتُ لم أرتب.

'বিপদ-আপদ আমাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমি এমন একজন পুরুষ, যখন তা পরীক্ষা করেছি, ভীত-কম্পিত হইনি।

ইয়াস ইবন মু'আবিয়া বলেছেন ঃ আমি প্রতারক নই এবং কোন প্রতারক আমার সাথে প্রতারণা করতে পারবে না।[৩৬]

তিনি যখন অল্প বয়সী একজন তরুণ তখন একবার শামে যান। সেখানে তাঁর একজন অতি বৃদ্ধ শত্রুর দেখা পান এবং তাকে নিয়ে খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের একজন কাজীর দরবারে হাজির হন। কাজী তাঁকে বললেন ঃ আপনি এই বৃদ্ধকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন, লজ্জা করে না? ইয়াস বললেন ঃ সত্য এই বৃদ্ধের চেয়েও বড়। কাজী ধমকের সুরে বললেন ঃ চুপ করুন। ইয়াস বললেন ঃ তাহলে আমার যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরবে কে? কাজী বললেন ঃ আমার মনে হয় না আপনি সত্য বলেছেন। এই এজলাসে উপস্থিত হওয়ার পর থেকে অসত্য বলে যাচ্ছেন। ইয়াস বললেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এ কি সত্য, না অসত্য? কাজী বললেন ঃ সত্য, কা'বার প্রভুর শপথ! সত্য। কাজী বললেন ঃ আমার ধারণা আপনি একজন যালিম। ইয়াস বললেন ঃ কাজীর ধারণা

---

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. প্রাগুক্ত-১/১০০, ২৭৫

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. কিতাব আল-হাওয়ান-৩/৪৯৫

৩৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১০১

সত্য হলে আমি ঘর থেকে বের হতাম না। এরপর কাজী উঠে খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে ঢুকলেন এবং সব ঘটনা খুলে বললেন। 'আবদুল মালিক বললেনঃ তার বিষয়টি এখনই নিষ্পত্তি করে তাকে শাম থেকে বের করে দিন। অন্যথায় সে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।[৩৭] আল-জাহিজ বলেন, খলীফা আবদুল মালিক ইয়াসের তরুণ বয়সে যখন তাঁকে নিয়ে এত ভীত ছিলেন তখন তার পরিণত বয়সের অবস্থা কেমন ছিল।[৩৮]

সর্বশেষ আল-জাহিজ তাঁর সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে ঃ[৩৯]

وجمله القول فـي إيـاس أنـه كـان مـن مفـاخر مضـر، ومـن مقدمـى القضـاة، وكـان فقيه البدن، دقيق المسلك فى الفطـن، وكـان صـادق الحـرس نقابًـا، وكـان عجيـب الفراسة ملهمًا، وكان عفيف الطعم، كريم المداخـل والشـيم، وجيـها عنـد الخلفـاء، مقدمًا عند الأكفاء.

"ইয়াস সম্পর্কে সার্বিক কথা হলো, তিনি মুদার গোত্রের অন্যতম গৌরব ও অগ্রবর্তী কাজী। তিনি ছিলেন দৈহিক গঠন তথা প্রকৃতিগতভাবে ফকীহ্ ও সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর আন্দাজ-অনুমান সত্যে পরিণত হতো, দূরদর্শিতাও ছিল বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বস্তু আহারকারী উত্তম স্বভাব ও চরিত্রের মানুষ। খলীফাদের নিকট সম্মানীয় ও সমকক্ষদের নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত।"

ইয়াস বলেছেন ঃ[৪০]

البخل قيد والغضب جنون والسكر مفتاح الشر.

"কার্পণ্য একটি বন্ধন, ক্রোধ একটি পাগলামি এবং মদমত্ততা সকল অপকর্মের চাবিকাঠি।"

একবার আবান ইবন আল-ওয়ালীদ-ইয়াসকে বললেন ঃ আমি আপনার চেয়ে বেশি ধনী। ইয়াস বললেন ঃ না, আপনার চেয়ে আমি বেশি ধনী। আবান বললেন ঃ তা কিভাবে হয়। আমার এত এত সম্পদ আছে। আপনার তো তা নেই। ইয়াস বললেন ঃ তাহলে কি হবে। আপনার আয় আপনার ব্যয়ের অতিরিক্ত নয়। কিন্তু আমার ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি।[৪১]

একদিন খলীফা উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করলেন। সারা রাত চোখের পাতা বুজলো না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটালেন। দিমাশকের তীব্র ঠাণ্ডার সেই রাতটি কাটালেন বসরায় একজন কাজী নিয়োগের চিন্তায়। সেই কাজী

---

৩৭. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৭২-৩৭৩; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৭০

৩৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১০১

৩৯. প্রাগুক্তি

৪০. প্রাগুক্তি-১/১৯৫

৪১. প্রাগুক্তি-৪/৯১; তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৮৫

এমন হবেন যিনি আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআনের বিধান অনুযায়ী মানুষের মাঝে 'আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন এবং সত্যের ব্যাপারে কারো রাগ-বিরাগের পরোয়া করবেন না।

কাজী নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'উমারের দৃষ্টি দু'ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ হল, যারা সব দিক দিয়ে সমতায় দৌড় প্রতিযোগী দু'অশ্বের মত ছিলেন। দীনের তত্ত্ব জ্ঞানে, সত্যের উপর দৃঢ়তায়, চিন্তার ঔজ্জ্বল্যে এবং দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতায় উভয়ে ছিলেন সমান সমান। যখনই তিনি একজনকে কোন একটি বৈশিষ্ট্যের দরুন প্রাধান্য দিচ্ছিলেন তখনই অন্যজন তাঁর একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য বলে মনে করছিলেন।

এভাবে রাত কেটে গেল। সকালে তিনি ইরাকের ওয়ালী 'আদী ইবন আরতাতকে ডেকে পাঠালেন। 'আদী তখন দারুল খিলাফা দিমাশকে অবস্থান করছিলেন। তিনি 'আদীকে বললেন ঃ আপনি ইয়াস ইবন মু'আবিয়্যা আল-মুযানী ও কাসিম ইবন রাবী'আ আল-হারিছী, মতান্তরে বাকর ইবন 'আবদিল্লাহকে ডেকে তাদের সঙ্গে বসরার বিচার বিষয়ে কথা বলুন এবং তাঁদের একজনকে তথাকার কাজী নিয়োগ করুন।

আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ মত 'আদী ইবন আরতাত ইয়াস ও কাসিমকে ডেকে বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশমত আমি আপনাদের দু'জনের যে কোন একজনকে বসরার কাজী নিয়োগ করতে চাই। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? তখন দু'জনের প্রত্যেকে অপরজন সম্পর্কে বললেন ঃ এ পদের জন্য আমার চেয়ে তিনি বেশি উপযুক্ত। এরপর তাঁর মহত্ত্ব, মর্যাদা, জ্ঞান ও ফিক্‌হ বিষয়ে পারদর্শিতার কথা তুলে ধরেন।

'আদী বললেন ঃ এ ব্যাপারে আপনারা নিজেরা একটি সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত আমার এ সভা থেকে উঠতে পারবেন না।

ইয়াস বললেন ঃ মাননীয় আমীর! আপনি কাসিম ও আমার সম্পর্কে ইরাকের দু'জন সর্বজন মান্য ফকীহ হাসান আল-বাসরী ও মুহাম্মাদ ইবন সীরীনকে (রহ) জিজ্ঞেস করুন। আমাদের দু'জনের মূল্যায়নের ব্যাপারে তাঁরাই যোগ্যতম ব্যক্তি।

আসলে কাসিম ও তাঁদের দু'জনের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তাঁদের সাথে ইয়াসের তেমন যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল না। তাই কাসিম মনে করলেন, ইয়াসের এ প্রস্তাব নিজেকে বাঁচানোর একটি কৌশলমাত্র। কারণ আমীর হাসান আল-বাসরী ও মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের সাথে পরামর্শ করলে তাঁরা অবশ্যই তাঁর নামটিই সমর্থন করবেন। তাই মোটেই দেরী না করে তিনি আমীরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ মাননীয় আমীর! আমার ও তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। সেই আল্লাহর নামের কসম যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, ইয়াস আল্লাহর দীনের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি পারদর্শী ও বিচার বিষয়ে অধিক জ্ঞানী। আমার এ কথায় আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তাহলে একজন মিথ্যাবাদীকে বিচারকের পদে নিয়োগ দেওয়া আপনার জন্য বৈধ হবে না। আর আমি সত্যবাদী হলে যোগ্যতম ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া সঙ্গত হবে না।

এবার ইয়াস আমীরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ জনাব, আপনি এক ব্যক্তিকে কাজীর পদে নিয়োগদানের জন্য ডেকে এনেছেন এবং তাঁকে যেন জাহান্নামের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি মিথ্যা শপথ করে তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিলেন। একটু পরেই আবার তাওবা করে নিবেন। কিন্তু তিনি তো মুক্তি পেয়ে গেলেন।

জবাবে 'আদী ইবন আরতাত তাঁকে বললেন ঃ আপনার মত যিনি এ কথাটি বুঝতে পারেন তিনিই কাজী হওয়ার উপযুক্ত। অতঃপর তিনি ইয়াসকে বসরার কাজী নিয়োগ করেন।[৪২]

মৃত্যু

ইয়াস ইবন মু'আবিয়ার (রহ) বয়স যখন ৭৬ (ছিয়াত্তর) বছরে পৌঁছালো তখন একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি ও তাঁর পিতা দু'জন দু'টি ঘোড়ার পিঠে আরোহী হয়েছেন এবং উভয়ে নিজ নিজ ঘোড়া দাবড়ান। কিন্তু কেউ কাউকে পিছনে ফেলতে পারলেন না; বরং দু'জনই পাশাপাশি থাকেন। তাঁর পিতা মু'আবিয়া ৭৬ (ছিয়াত্তর) বছর বয়সে মারা যান।

এ ঘটনার পর একদিন রাতে ইয়াস ঘুমানোর জন্য বিছানায় শুয়ে পরিবারের লোকদের ডেকে বলেন ঃ তোমরা কি জান এটা কোন্ রাত?

তারা বললো ঃ না, জানি না।

তিনি বললেন ঃ এ রাতে আমার পিতা তাঁর জীবনপূর্ণ করেন।

রাত পোহালে সকাল বেলায় পরিবারের লোকেরা বিছানায় তাঁকে মৃত দেখতে পান।

হিজরী ১২২ সনে তিনি বসরায়, মতান্তরে ওয়াসিত-এর 'আবদাসা নামক পল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৩]

ইয়াসের মা মৃত্যুবরণ করলে তিনি শোকে কাতর হয়ে ভীষণ কান্নাকাটি করেন। লোকেরা যখন সান্ত্বনা দিত, তিনি বলতেন ঃ[৪৪]

كان لى بابان مفتوحان من الجنة، فاغلق احدهما.

"আমার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা ছিল। এখন একটি বন্ধ হয়ে গেল।"

---

৪২. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৭৫; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৬৫-৬৮

৪৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৯; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৯৮; সাওয়ারুন মিন হায়াত আত তাবি'ঈন-৭৮-৭৯

৪৪. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৮৯, ৩৯২

কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবূ বকর (রা)

হযরত কাসিমের (রহ) ডাকনাম আবূ মুহাম্মাদ, মতান্তরে আবূ 'আবদির রহমান।[১] তিনি হযরত আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) পুত্র মুহাম্মাদের (রহ) সন্তান। তাঁর মা 'সাওদা' ছিলেন 'উম্মু ওয়ালাদ'। 'উম্মু ওয়ালাদ'-এর শব্দগত অর্থ সন্তানের মা। ইসলামের পরিভাষায় যে দাসী মনিবের ঔরসজাত সন্তান জন্ম দেয় তাকে বলা হয় উম্মু ওয়ালাদ। এমন দাসীকে আর কোনভাবে হস্তান্তর করা যায় না। যাই হোক কাসিমের মা সাওদা দাসী হলেও তিনি ছিলেন বিশ্বের এক অভিজাত ঘরের কন্যা। যুদ্ধবন্দী হিসেবে তৎকালীন বিশ্বের রীতি অনুযায়ী দাসীতে পরিণত হন।

মাদায়েন বিজয়ের পর পারস্য সম্রাট ইয়াযদিগুরদ-এর তিন কন্যা মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন। তাদেরকে মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন না করে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। 'আলী (রা) তাঁদের তিনজনকে ক্রয় করেন এবং তিনজন মুসলিম যুবকের হাতে তাদের একজন করে তুলে দেন। একজনকে দেওয়া হয় রাসূলুল্লাহর (সা) দৌহিত্র আল-হুসাইন ইবন 'আলীকে এবং এখানে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন যায়নুল 'আবিদীন; দ্বিতীয়জনকে লাভ করেন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর (রা) এবং তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ। তৃতীয়জনকে লাভ করেন 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) এবং তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রা)। ইয়াযদিগুরদের তিন কন্যার এ তিন সন্তান তাদের পরিণত বয়সে নৈতিকতা, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় সর্বজনমান্য ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।[২]

কাসিম জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষতায় মদীনার মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে মদীনার মনীষীদের দ্বিতীয় তাবকায় (স্তর) উল্লেখ করেছেন।[৩]

ইয়াতীম অবস্থা এবং ফুফুর নিকট লালিত-পালিত

হযরত 'উছমানের (রা) বিরুদ্ধাচরণ ও শাহাদাতের ঘটনায় মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরের (রা) নামটি ইসলামের ইতিহাসে বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তিনি হযরত উছমানের (রা) প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। এমনকি হযরত উছমানের (রা) হত্যাকারীদের মধ্যে তাঁর নামটিও উচ্চারিত হয়। 'উছমানের (রা) শাহাদাতের পর তিনি আলীর (রা) পক্ষ অবলম্বন করেন। হযরত 'আলী ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয় তাতে

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৫/১৮৬

২. 'আসরুত তাবি'ঈন-৮১

৩. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/১৮৬

মুহাম্মাদ 'আলীর (রা) একজন উদ্যমী সহযোগী হিসেবে তাঁর পাশে দাঁড়ান। হযরত 'আলী (রা) তাঁকে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেন। যখন হযরত মু'আবিয়ার (রা) পক্ষ থেকে হযরত 'আমর ইবন আল-'আস (রা) মিসরে সামরিক অভিযান চালান তখন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা) নিহত হন। কাসিম তখন অল্প বয়সী শিশু। এ কারণে তাঁর ফুফু উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসেন এবং অত্যন্ত স্নেহ-মমতায় তাঁকে গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে হযরত কাসিম তাঁর শৈশবকালীন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলতেন, আমাদের ফুফু-আম্মা 'আয়িশা (রা) 'আরাফার রাতে আমাদের মাথা ন্যাড়া করে দিতেন এবং মাথায় টুপি পরিয়ে মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন। পরের দিন সকালে আমাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন। তিনি আরো বলতেন, ফুফু-আম্মা নিজ হাতে আমাকে ও আমার ছোট্ট বোনকে খাওয়াতেন। তবে আমাদের সাথে খেতেন না। আমরা খাওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকতো তাই খেতেন। মা যেমন অতি আদরে তার শিশু সন্তানকে দুধ পান করায় তেমনি তিনিও আমাদের আদর করে খাওয়াতেন। আমাদেরকে গোসল করাতেন, মাথায় চিরুনী করে পরিষ্কার সাদা কাপড় পরিয়ে দিতেন। ভালো কাজ কী তা শেখাতেন, ভালো কাজ করার জন্য উৎসাহিত করতেন ও প্রশিক্ষণ দিতেন। আর মন্দ কাজ কী তাও শেখাতেন এবং তা থেকে বিরত থাকার কথা বলতেন। আমি সন্তানের প্রতি তাঁর চেয়ে বেশি যত্নশীল, তাঁর চেয়ে বেশি স্নেহশীল কোন পিতা-মাতাকে কখনো দেখিনি।

তিনি তাঁর এই স্নেহশীল ফুফুকে আম্মা বলে ডাকতেন। পরবর্তীকালে যখন তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করতেন তখন বলতেন: আমার আম্মা আয়িশা (রা) আমাকে বলেছেন, অথবা আমার আম্মা 'আয়িশার (রা) নিকট শুনেছি। তিনি বলতেন, তাঁর চেয়ে সুন্দর করে কথা বলতে এবং তাঁর চেয়ে বিশুদ্ধ ও মিষ্টভাষী কোন পুরুষ বা নারীকে তাঁর আগে পরে কখনো আমি দেখিনি।[৪]

জ্ঞান ও মনীষা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) এমন বিদুষী মহিলা ছিলেন যে, তাঁর একজন নগণ্যতম সেবকও জ্ঞান ও কর্মের উচ্চাসন অলঙ্কৃত করেন। কাসিম ছিলেন তাঁর অতি স্নেহের সন্তানতুল্য। তাঁর আদর-যত্নে লালিত-পালিত হয়ে তিনি 'ইল্ম ও 'আমল দু'সাগরের সংযোগস্থলে পরিণত হন। ইবন সা'দ লিখেছেন, তিনি উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ, ইমাম, শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ ও আল্লাহ্ ভীরু মানুষ ছিলেন।[৫] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তিনি একজন অতি উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন তাবি'ঈ। তাঁর বিশ্বস্ততা ও ইমাম হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে সকলে একমত।[৬]

---

৪. আত-তাবাকাত-৫/১৩৯; 'আসরুত তাবি'ঈন-৭৩

৫. আত-তাবাকাত-৫/১৪৩

৬. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৫৫

তাফসীর

ইসলামী জ্ঞানের সকল শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল। তবে আল্লাহর কালামের তাফসীরের ব্যাপারে ছিলেন খুবই সতর্ক। চরম সতর্কতার কারণে তিনি কুরআনের তাফসীর করতেন না। এ কারণে মুফাস্‌সির হিসেবে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেননি।[৭]

হাদীছ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) ব্যক্তি সত্তাটিই ছিল হাদীছের অন্যতম উৎসস্থল। হযরত কাসিম (রহ) এই উৎস থেকে প্রাণ ভরে পরিতৃপ্ত হন। তাছাড়া অন্য সাহাবায়ে কিরাম থেকেও হাদীছ শোনেন। যেমন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), আবূ হুরায়রা (রা) ও আরো অনেকে। তিনি নিজেই বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট বসতাম, তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ও আবূ হুরায়রার (রা) নিকটও বসতাম। তাঁদের নিকট থেকে আমি সর্বাধিক উপকার লাভ করেছি। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট এমন জ্ঞান, খোদাভীরুতা এবং এমন দুর্লভ তথ্য ছিল যা আর কারো নিকট থেকে অর্জন করা সম্ভব ছিল না।[৮] এ সকল ব্যক্তি ছাড়াও তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার, মু'আবিয়া, 'আবদুল্লাহ ইবন খাব্বাব, রাফি' ইবন খাদীজ, আসলাম মাওলা 'উমার (রা) প্রমুখ মহান সাহাবীর নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন।[৯] এ সকল মহান ব্যক্তিবর্গের কল্যাণে তিনি একজন বিশিষ্ট হাফিজে হাদীছে পরিণত হন। ইবন সা'দ তাকে كثير الحديث - বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী বলেছেন।[১০] ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে হাফিজে হাদীছগণের ইমাম ও নেতা বলে উল্লেখ করেছেন। আবুয যানাদ বলতেন, আমি কাসিমের চেয়ে সুন্নাহর বড় 'আলিম কাউকে দেখিনি।[১১] তিনি বিশেষভাবে হযরত 'আয়িশার (রা) হাদীছের হাফিজ ছিলেন। খালিদ ইবন বাযযায বলেন, 'আয়িশার (রা) হাদীছের তিনজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা হলেন কাসিম, 'উরওয়া ও 'আমর (রহ)।[১২]

তাঁর বর্ণনাসমূহের মান

মুহাদ্দিছগণ হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে তাঁর বর্ণনাসমূহকে খাঁটি সোনার মত মনে করেছেন। ইবন মা'ঈন বলেন, "عبيد الله بن عمر عن قاسم عن عائشة" সনদের এই ধারাটি খাঁটি সোনার শিকলের মত।[১৩]

---

৭. আত-তাবাকাত-৫/১৩৯

৮. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৫৫

৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/১৩৩

১০. আত-তাবাকাত-৫/১৩৯

১১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৫৬

১২. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/৩৩৪; তাবি'ঈন-৩৭৬

১৩. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৫৫

হাদীছের পঠন-পাঠন

প্রত্যেক রাতে ঈশার নামাযের পর তিনি এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা এক সাথে হাদীছের পঠন-পাঠন করতেন। হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক ছিলেন। বর্ণনার ক্ষেত্রে অর্থ নয়, বরং মূল শব্দে হাদীছ বর্ণনা জরুরী বলে মনে করতেন। এই সতর্কতার কারণে তিনি হাদীছ লেখা-লেখি পছন্দ করতেন না।[১৪]

'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আওন বলেন ঃ[১৫]

كان القاسم وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون بالحديث على حروفة، وكان الحسن وابراهيم والشعبى يحدثون بالمعانى.

'আল-কাসিম, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন ও রাজা' ইবন হায়ওয়া হাদীছ (রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে উচ্চারিত) বর্ণ ও শব্দে বর্ণনা করতেন। অন্যদিকে হাসান আল-বাসরী, ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ ও আশ-শা'বী (নিজেদের শব্দ ও বর্ণে) হাদীছের অর্থ ও ভাব বর্ণনা করতেন।

তাঁর ছাত্র-শিষ্য

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেক বড় বড় ইমাম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন ঃ 'আবদুর রহমান ইবন কাসিম, ইমাম শা'বী, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার, সা'ঈদ আল-আনসারীর পুত্র ইয়াহইয়া, সা'ঈদ ইবন আবী মুলায়কা, নাফি' মাওলা ইবন 'উমার, ইমাম যুহরী, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার, আইউব, মালিক ইবন দীনার (রহ) প্রমুখ। তাঁর এ সকল প্রতিভাবান ছাত্র তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৬]

ফিক্হ

ফিক্হ ছিল হযরত কাসিমের (রহ) বিশেষ অধীত বিষয়। এ বিষয়ে তিনি একজন ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর ফিক্হ বিষয়ে দক্ষতা ও উৎকর্ষতার সবচেয়ে বড় সনদ এই যে, তিনি ছিলেন মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহর একজন।[১৭] ফিক্হর জ্ঞানও তিনি অর্জন করেন ফুফু হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা, ইবন 'উমার ও ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট থেকে। তিনি বলতেন, আবূ বাকর ও 'উমারের (রা) সময়ে হযরত 'আয়িশা (রা) স্বতন্ত্রভাবে ফাতওয়া দিতেন এবং আমি তাঁর সাথে থাকতাম।[১৮] সেই সময়ের সকল

---

১৪. আত-তাবাকাত-৫/১৪০

১৫. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/১৮৮

১৬. প্রাগুক্ত-১৫/১৮৫; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৩৩

১৭. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৫৫

১৮. প্রাগুক্ত

আলিম তাঁর ফিক্‌হ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন। আবিয যানাদ বলতেন, আমি কাসিমের চেয়ে বড় কোন ফকীহ্‌কে দেখিনি।[১৯] ইমাম মালিক (রহ) বলতেন, কাসিম এই উম্মাতের ফকীহ্‌গণের মধ্যে ছিলেন।[২০]

ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে সতর্কতা

ফিক্‌হ বিষয়ে এত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীছের মত ফাতওয়া দানে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সে বিষয়ে কথা বলা অথবা কোন মাসয়ালার জবাব দেওয়া খুবই খারাপ মনে করতেন। বলতেন, আল্লাহর ফরয হুকুমগুলো জানার পর কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকার পরও কথা বলার চেয়ে কোন মানুষের মূর্খ থাকা অনেক ভালো। কোন মাসয়ালা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান না থাকলে সোজা নিজের অজ্ঞতার কথা জানিয়ে দিতেন। একবার তাঁকে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। শুধু স্পষ্ট ও সহজ প্রশ্নের জবাব দিতেন। যে সব মাসয়ালার জবাব নিজের মতের ভিত্তিতে দিতেন, তাতে স্পষ্ট বলে দিতেন যে, এটা আমার মত, এ কথা বলছিনা যে, এটাই সত্য।[২১]

দারসের আসর

হযরত কাসিমের (রহ) মদীনার মসজিদে নববীতে একটি হালকায়ে দারস বা পাঠদানের আসর ছিল। তাঁর ও সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) একই আসর ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র 'আবদুর রহমান এবং সালিমের ভাই 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) এই আসরে বসতেন, তাঁদের পরে এই স্থানে ইমাম মালিকের আসর বসতে থাকে। স্থানটি ছিল হযরত রাসূলে কারীমের (সা) কবর ও মিম্বারের মাঝামাঝি স্থানে হযরত 'উমারের (রা) সম্মুখে। কাসিম সকাল বেলায় দারস ও ইফতার এই স্থানে এসে দু'রাক'আত নামায আদায়ের পর আসরে বসে যেতেন। এ সময় মানুষের যা কিছু প্রশ্ন করার, করতো।[২২]

সমকালীনদের তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি

তাঁর সময়ের অনেক বড় বড় 'আলিম ও বিদগ্ধ ব্যক্তি তাঁর মনীষা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আনসারী বলতেন, আমরা মদীনায় এমন কোন ব্যক্তিকে পাইনি যাঁকে কাসিমের উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়। আবুয যানাদ বলতেন, কাসিম তাঁর যুগে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারী মানুষ ছিলেন, আইউব সাখতিয়ানী বলতেন, আমি কাসিমের চেয়ে উত্তম মানুষ আর দেখিনি।[২৩]

---

১৯. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮৫; 'আসরুত তাবি'ঈন-৭২

২০. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/৩৩৪

২১. আত-তাবাকাত-৫/১৩৯

২২. প্রাগুক্ত-১/১৪০

২৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ

বিনয় ও সমকালীন 'আলিমদের প্রতি সম্মান

জ্ঞানের এত উঁচু স্তরে অবস্থান করা সত্ত্বেও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কোন অনুভূতিই তাঁর ছিল না। তিনি নিজের চেয়ে কম মর্যাদার সমকালীনদেরকেও ভীষণ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মুখ থেকে কখনো তাদের সম্পর্কে এমন কোন শব্দ বা বাক্য উচ্চারিত হতো না যাতে বিন্দুমাত্র তাদের অসম্মান হয়। এমন সতর্কতার কারণে তিনি কোন কোন স্থানে সঙ্কটজনক অবস্থায় পড়ে যেতেন। একবার একজন মরুচারী বেদুঈন তাঁকে প্রশ্ন করলো ঃ আপনি বড় 'আলিম, না সালিম? এই প্রশ্নের জবাবদানে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান। যদি প্রকৃত সত্য কথাটি বলে দিতেন তাহলে নিজের মুখে নিজের প্রশংসা হয়ে যেত, আর যদি বলতেন সালিম বড় 'আলিম তাহলে অসত্য কথা হয়ে যেত। এ কারণে প্রথমে সুবহানাল্লাহ পাঠ করে এড়িয়ে যেতে চান। কিন্তু বেদুঈন যখন আবার জিজ্ঞেস করলো তখন তিনি বললেন, সালিম আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর।[২৪]

নৈতিক চরিত্র

হযরত কাসিমের (রহ) যে স্তরের 'ইল্‌ম ছিল, সেই স্তরের 'আমলও ছিল। তাঁর ব্যক্তি সত্তাটি ছিল সকল নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশস্থল। তিনি তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত আবূ বাকরের (রা) প্রতিরূপ ছিলেন। যুবায়র বলতেন, আমি আবূ বাকরের (রা) সন্তানদের মধ্যে এই কাসিমের চেয়ে বেশি তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাউকে পাইনি।[২৫]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) তাঁর অগাধ জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষতার কথা অকপটে স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন, খিলাফতের কর্তৃত্ব যদি কাসিমের হাতে থাকতো তাহলে কত না ভালো হতো। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলতেন, খিলাফতের বিষয়টি যদি আমার এখতিয়ারে থাকতো তাহলে আমি কাসিমকে খলীফা বানাতাম। খলীফা 'উমারের (রহ) এ কথা তাঁর কানে পৌঁছলে তিনি বিস্ময়ের সাথে বলেন, আমি যখন আমার পরিবার চালাতে পারি না, সেখানে এই উম্মাতের দায়িত্ব পালন কেমন করে সম্ভব।[২৬] 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের (রহ) সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ও লৌকিকতা বিবর্জিত। কাসিম ছিলেন স্বল্পভাষী চুপচাপ স্বভাবের মানুষ। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খলীফা হলেন, তখন মদীনাবাসীরা বললো, এবার কুমারী কাসিম কথা বলবেন।[২৭]

খলীফা 'উমার ইবন 'আযীযের (রহ) সাথে আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদের অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। 'উমার তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। হিজরী ৮৬ সনে উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক খলীফা

---

২৪. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/৩৩৪; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/১৮৮; 'আসরুত তাবি'ঈন-৭৩

২৫. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/৩৩৪

২৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৫৯

২৭. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/৩৮৫

হন। তিনি হিজরী ৮৭ সনের ২৩ রাবিউল আউয়াল হিশাম ইবন ইসমা'ঈলকে মদীনার ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করে তদস্থলে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযকে নিয়োগ দান করেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি মারওয়ান ভবনে ওঠেন। যুহরের নামাযের পর মদীনার তৎকালীন দশজন বিখ্যাত ফকীহ্ ও 'আলিমকে ডেকে পাঠান। তাঁরা হলেন ঃ 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, আবূ বাকর ইবন সুলায়মান ইবন আবী খায়ছামা, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'উদ, আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আমর, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন রাবী'আ ও খারিজা ইবন যায়দ (রহ)। তাঁরা উপস্থিত হলে 'উমার তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে নিম্নের কথাগুলো বলেন ঃ

'আমি আপনাদেরকে এমন এক কাজের জন্য ডেকেছি যাতে আপনারা আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাবেন এবং সত্যের সহযোগী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবেন। আমি আপনাদের পরামর্শ ছাড়া কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই না। এ কারণে আপনারা কেউ কারো উপর যুল্ম-অত্যাচার করছে এমন খবর পেলে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে অবশ্যই অবহিত করবেন।

তাঁর এ ভাষণ শোনার পর উপস্থিত ফকীহ্ 'আলিমগণ তাঁর মঙ্গল কামনা করতে করতে ফিরে যান। কাসিম ইবন মুহাম্মাদ 'উমারের ভাষণ শেষে মন্তব্য করেন ঃ

"اَلْيَوْمَ يَنْطِقُ مَنْ كَانَ لاَ يَنْطِقُ" 'যারা কথা বলতে পারতো না এখন তারা কথা বলতে পারবে।'[২৮]

মদীনার ওয়ালী থাকাকালে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যে অক্ষয় কীর্তিগুলো সম্পাদন করেন তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ। খলীফা 'আবদুল মালিক এ মসজিদ সম্প্রসারণ করে পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ নেন, কিন্তু মদীনাবাসীদের অসহযোগিতার কারণে তা ব্যর্থ হয়। খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং তিনি মসজিদটিকে সম্পূর্ণ নতুন কাঠামো ও শৈলীতে নির্মাণ করতে চান। দিমাশকের জামি' মসজিদ নির্মাণ শেষ করে তিনি হিজরী ৮৮ সনে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযকে লিখলেন, মসজিদে নববী নতুন করে নির্মাণ করতে হবে এবং এর আশে-পাশে আযওয়াজে মুতাহ্হারাত অর্থাৎ হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পূতঃপবিত্র বেগমদের যে সকল হুজরা ও অন্যান্য বাড়ি-ঘর আছে অর্থের বিনিময়ে সেগুলো অধিগ্রহণ করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খলীফার এ আদেশ বাস্তবায়ন করেন।

পত্র পেয়ে 'উমার মসজিদের আশে-পাশের বাড়ি-ঘরের মালিকদের ডেকে খলীফার পত্রটি

---

২৮. আল কামিল ফী আত-তারীখ-৪/৫২৬; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২১০; তাবি'ঈদের জীবনকথা-২/৩২৫-৩৬

পাঠ করে শোনান। তাঁরা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের মালিকানা ছেড়ে দিতে রাজি হন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয পুরাতন মসজিদ, উম্মাহাতুল মু'মিনীনের হুজরাসমূহ ও আশে-পাশের বাড়ি-ঘর ভাংতে আরম্ভ করেন। তখন এ কাজে তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ, আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান (রহ)সহ মদীনার বিশিষ্ট ফকীহগণ। তাঁরা সকলে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের হুজরাসমূহ মসজিদের মধ্যে ঢুকিয়ে নতুন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।[২৯]

তাকওয়া-পরহেজ্গারী

তাকওয়া-পরহেজগারীর দিক দিয়েও তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় তাবি'ঈ। ইবন সা'দ তাঁকে একজন খোদাভীরু উত্তম তাবি'ঈ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ বলেছেন। ইবন হিব্বান তাঁকে নেতৃস্থানীয় তাবি'ঈ এবং তাঁর যুগের একজন উত্তম তাবি'ঈ বলে গণ্য করেছেন।[৩০]

বার্ধক্যে ও হজ্জের সময় মিনায় পাথর মারার জন্য পায়ে হেঁটে যেতেন। রাবী'আ ইবন 'আবদির রহমান বলেন, কাসিম যখন অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি তাঁর অবস্থানস্থল থেকে বাহনের পিঠে চড়ে মিনা পর্যন্ত আসতেন। পরে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে পাথর মারার জন্য যেতেন। পাথর মেরে মসজিদ পর্যন্ত হেঁটে যেতেন। তারপর সেখান থেকে বাহনের পিঠে চড়ে অবস্থানস্থলে ফিরতেন।[৩১]

ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি অমুখাপেক্ষী মনোভাব

পার্থিব ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি এতই উদাসীন ও মুখাপেক্ষীহীন ছিলেন যে, প্রিয়জনের কোন অনুগ্রহ-উপঢৌকনও গ্রহণ করতেন না। সুলায়মান ইবন কুতায়বা বলেন, একবার 'উমার ইবন 'উবায়দিল্লাহ আমার হাতে এক হাজার দীনার দিয়ে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ও কাসিম ইবন মুহাম্মাদের নিকট পাঠান। ইবন 'উমার (রা) তাঁর অংশের দীনারগুলো গ্রহণ করেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এই বলে যে, 'উমার ইবন 'উবায়দ-আত্মীয়তার সম্পর্কের হক আদায় করেছেন। এ সময়ে এ অর্থের আমার খুব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কাসিম ইবন মুহাম্মাদ তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এ কথা তাঁর বেগম সাহেবা জানতে পেরে বলেন, 'উমার ইবন 'উবায়দুল্লাহর সাথে আমাদের (স্বামী-স্ত্রী) দু'জনের সম্পর্ক সমান সমান। কাসিম যদি তাঁর চাচাতো ভাই হন, তাহলে আমিও তো তাঁর ফুফাতো বোন হই। তাঁর এ কথার পর আমি তাঁর হাতেই এ অর্থ তুলে দিই।[৩২]

সত্যের স্বীকৃতি

এমন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, নিজের পিতার কোন ভুলকে তিনি ভুল বলে স্বীকার করতেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করতেন। পূর্বেই এসেছে যে, তাঁর

---

২৯. আল-কামিল ফী আত-তারীখ-৪/৫৩২; তাবি'ঈদের জীবন কথা-২/৩৭-৩৮

৩০. আত-তাবাকাত-৫/১৪১

৩১. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৫৫; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৩৫

৩২. আত-তাবাকাত-৫/১৪১

পিতা মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর (রা) আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'উছমানের (রা) ভীষণ বিরোধী ছিলেন এবং বিদ্রোহীদের সাথে খলীফার গৃহ অভ্যন্তরেও ঢুকে পড়েছিলেন। হযরত কাসিম (রহ) পিতার এ কাজকে একটা মারাত্মক ভুল বলে স্বীকার করতেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! 'উছমানের (রা) ব্যাপারে আমার পিতার অপরাধকে ক্ষমা করে দিন।[৩৩]

ওফাত

তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে একটু মতপার্থক্য আছে। হিজরী ১০৬ থেকে ১১২ সনের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন একথা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। তখন তাঁর বয়স ৭০ অথবা ৭২ (সত্তর/বাহাত্তর) বছর।[৩৪] বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত দেহ নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হয়েছেন। বাহনের পিঠে চড়ে তালবিয়া পাঠ করতে করতে পথ চলছেন। সাথে বেগম সাহেবা আছেন, ছেলে বাহনটি হাঁকাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাথায় তীব্র ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। এক সময় বুঝলেন তাঁর জীবনকাল শেষ হয়ে এসেছে। আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করলেন। তারপর কাগজ কলম নিয়ে একজনকে অসীয়াত লিখতে বললেন। লেখক তাঁর বলার আগেই লিখে ফেললেন, "কাসিম ইবন মুহাম্মাদ অসীয়াত করছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।" কাসিম (রহ) এ লেখাটুকু শুনে বললেন, যদি আমি আজকের পূর্বে এই সাক্ষ্য না দিয়ে থাকি তাহলে আমি একজন দারুণ হতভাগ্য। তারপর তিনি বলেন ঃ[৩৫]

يا بني إذا أنا متُّ فكفنِّي بثيابي التى كنت أصلي فيها : قميصي وإزاري وردائـي، فذالك كان كفن جدك أبي بكر، ثمَّ سوِّ عليَّ لَحْدِي والْحَقْ بأهلك، وإيَّـاكم أن تقفوا على قبري وتقولوا كان وكان فما كنت شيئًا.

'আমার ছেলে ঃ আমি যখন মারা যাব তখন আমি যে কাপড় পরে সালাত আদায় করি তা দিয়েই আমার কাফন বানাবে। আর তা হলো আমার জামা, লুঙ্গি ও চাদর। এ ছিল তোমার দাদা আবূ বাকরের (রা) কাফন। তারপর তোমরা আমাকে আমার কবরে শুইয়ে মাটি চাপা দিয়ে পরিবার-পরিজনের নিকট চলে যাবে। খবরদার, আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এমন বলবে না যে, তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন। আসলে আমি কিছুই ছিলাম না।'

পুত্র একবার বললেন, আপনি কি দু'খানা নতুন কাপড় পছন্দ করেন না? বললেন, আবূ বাকরকেও তিন কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছিল। তাছাড়া মৃতদের চেয়ে জীবিতদেরই নতুন কাপড়ের প্রয়োজন বেশি।

---

৩৩. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৪১৮

৩৪. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/১৮৫

৩৫. 'আসরুত তাবি'ঈন-৮২

এই অসীয়াতের পর তিনি মক্কা-মদীনার মাঝে "কুদাইদ" নামক স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখান থেকে তিন মাইল দূরে "মুশাল্লাল" নামক স্থানে কবর দেওয়া হয়।[৩৬]

মৃত্যুকালে তিনি নগদ এক লাখ দিরহাম রেখে যান। তার মধ্যে একটি দিরহামও অবৈধ উপার্জনের ছিল না।[৩৭]

শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।[৩৮] দাড়ি ও মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল, তাতে মেহেদীর খিজাব লাগাতেন। রূপোর আংটি পরতেন এবং তাতে নিজের নাম খোদাই করা ছিল। মার্জিত রঙ্গিন পোশাক পরতেন। জুব্বা, পাগড়ী, চাদর ও অন্যান্য কাপড় সাধারণত "খুয" সূতার হতো। এ ছাড়া আরো দামী পোশাকও পরতেন। পাগড়ী কালো হতো। জাফরানী রং বেশি পছন্দ ছিল। তাছাড়া সবুজ রংও ব্যবহার করতেন।

---

৩৬. আত-তাবাকাত-৫/১৪৩

৩৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৮৫

৩৮. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/১৮৯

ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মার আল-বাসরী (রহ)

ইয়াহইয়া (রহ) তাবি'ঈদের মধ্যবর্তী স্তরের মানুষ। ইমাম আয-যাহাবীর মতে এই স্তরের পুরোধা হলেন প্রখ্যাত মনীষী হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ)। ইয়াহইয়ার ডাকনাম আবূ সুলায়মান, মতান্তরে আবূ 'আদী ও আবূ সা'ঈদ। বসরার অধিবাসী এবং 'আদওয়ান গোত্রের সন্তান।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ, ভাষা ও সাহিত্যের বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কুরআনের একজন বিশিষ্ট 'আলিম ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে কুরআন বিশেষজ্ঞ বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

হাদীছ

তিনি হাদীছের হাফিজ ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে হাফিজ ও লেখক তাবি'ঈদের তৃতীয় তাবকায় (স্তরে) তাঁর জীবনী সন্নিবেশ করেছেন।[৩] সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে হযরত 'উছমান, 'আলী, 'আম্মার ইবন ইয়াসির, আবূ যার আল-গিফারী, আবূ হুরায়রা, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, সুলায়মান ইবন সুরাদ, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা), জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, নু'মান ইবন বাশীর (রা) প্রমুখের মত উঁচু স্তরের মনীষীদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৪] তবে ইমাম আবূ দাউদ বলেন, তিনি হযরত আয়িশা (রা) থেকে হাদীছ শোনেননি। তাই ইমাম আয-যাহাবী (রহ) ইমাম আবূ দাউদের নিকট প্রশ্ন রেখেছেন।

فما الظن بالذين قبلها؟ - 'আয়িশার (রা) পূর্ববর্তী যাঁরা তাঁদের সম্পর্কে ধারণা কি? অর্থাৎ 'উছমান, 'আলী (রা), যাঁরা 'আয়িশার (রা) বহু পূর্বে ইনতিকাল করেছেন তাঁদের নিকট থেকেও কি ইয়াহইয়া শোনেননি?[৫]

ইয়াহইয়া ইবন 'আকীল, সুলায়মান আত-তায়মী, 'আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা, কাতাদা মাওলা ইবন 'আব্বাস (রা), 'আতা' আল-খুরাসানী, রাকীন ইবন রুবা'য়, 'আবদুল্লাহ ইবন কুলাইব সাদূসী, আযরাক ইবন কায়স, ইসহাক ইবন সুওয়াইদ, আবুল মুনীব

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭১; তাহ্যীব আল-কামাল-৩২/৫৩

২. তাবাকাত ইবন সা'দ-৭/১০১

৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭১

৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৩২৫; তাহ্যীব আল-কামাল-৩২/৫৪

৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৫

'উবাইদুল্লাহ, 'উমার ইবন 'আতা' ইবন আবিল খাওলা (রহ) প্রমুখ ব্যক্তি তাঁর খ্যাতিমান ছাত্র। তাঁরা সকলে তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৬]

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে একজন ফকীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতার বড় প্রমাণ হলো তিনি মারব-এর কাজীর পদ অলঙ্কৃত করেন।[৭]

ভাষা, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র

নিছক ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি ভাষা-সাহিত্যেও তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আরবী ব্যাকরণের "নাহূ" ও আরবী ভাষায় ছিল তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য।[৮] নাহূর জ্ঞান তিনি অর্জন করেন এই শাস্ত্রের উদ্ভাবক আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ায়লীর নিকট থেকে।[৯] ভাষায় তাঁর প্রচণ্ড দখল ছিল। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের বিশুদ্ধ ভাষী ও অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ।[১০] 'আবদুল মালিক ইবন 'উমাইর বলেন ঃ

فصحاء الناس ثلاثة : موسى بن طلحة ويحيى بن يعمر و قبيصة بن جابر

"বিশুদ্ধভাষী মানুষ তিনজন ঃ মূসা ইবন তালহা, ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মার ও কাবীসা ইবন জবির।" ইবন হিব্বান তাঁর 'আছ-ছিকাত' গ্রন্থে বলেন ঃ

كان من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علما باللغة مع الورع الشديد.

'তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম বিশুদ্ধভাষী এবং ভাষা জ্ঞানে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। আর সেই সাথে ছিল তাঁর মধ্যে দারুণ আল্লাহ-ভীতি।'[১১]

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তাঁকে বসরা থেকে বের করে দিলে কুতায়বা ইবন মুসলিম স্বাগতম জানান এবং খুরাসানের রাজধানী "মারব"-এর কাজী নিয়োগ করেন।[১২] সেখানে আদালত ভবন ছিল এবং এজলাসও বসতো। তা সত্ত্বেও তিনি বিচার প্রার্থীদের সুবিধার জন্য পথে-ঘাটে চলতে-ফিরতে মানুষের সাধারণ ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করে দিতেন। মূসা ইবন ইয়াসার বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মারকে বাজারে, রাস্তা-গলিতে মানুষের ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা করতে দেখেছি। অনেক সময় এমনও হতো যে, তিনি বাহনের পিঠে কোথাও যাচ্ছেন, তখন বাদী-বিবাদী এসে সামনে দাঁড়াতো। তিনি থেমে তাদের বক্তব্য শুনে ফয়সালা করে দিতেন।[১৩]

---

৬. প্রাগুক্ত; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/৩২৫; তাহ্‌যীব আল-কামাল-৩২/৫৪

৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭৫; তাবাকাত-৭/১০১

৮. প্রাগুক্ত

৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/৩০৫

১০. শাজারাত আয-যাহাব-১/১৭৬

১১. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৩২/৫৫

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাবাকাত ইবন সা'দ-৭/১০১

একটি অক্ষয় কীর্তি

তাঁর জীবনের একটি অক্ষয় কীর্তি যা কিয়ামাত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে তা হলো আল-কুরআনের বর্ণমালায় "নুকতা" প্রদান করা। উল্লেখ্য যে, এর পূর্বে আরবী বর্ণমালার কোন বর্ণে "নুকতা" ছিল না। সাধারণ মানুষ ও অনারবদের কুরআন পাঠ সহজীকরণের জন্য ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মার সর্বপ্রথম আল-কুরআনের সমআকৃতির বর্ণমালায় "নুকতা" লাগিয়ে পার্থক্য সূচিত করেন। হারূন ইবন মূসা বলেন ঃ أول من نقط المصاحف يحى بن يعمر -'ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মার প্রথম ব্যক্তি যিনি মাসহাফে নুকতা প্রদান করেন।'[১৪]

আহ্‌লি বায়তের সাথে সম্পর্ক

আহ্‌লি বায়ত তথা হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বংশধরদের প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কোন রকম বাছ-বিছার ছাড়াই তাঁদেরকে অন্য সকলের উপর প্রাধান্য দিতেন। তবে কাউকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করতেন না। একবার হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তাঁকে বলেন, আপনি বিশ্বাস করেন হাসান ও হুসায়ন (রা) রাসূলুল্লাহর বংশধর। আপনাকে হয় এ বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে, নতুবা প্রমাণ পেশ করতে হবে। তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ[১৫]

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاودَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسى وَهرُوْنَ، وَكَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيِ وَعِيْسى وَاِلْيَاسَ، كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ.

"তাঁর (ইবরাহীম) বংশধর দাঊদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও (দান করি)। আর এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, 'ঈসা এবং ইলইয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। তারা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।"

তারপর বলেন, এই আয়াতে 'ঈসাকে ইবরাহীমের বংশধর বলা হয়েছে। সময়ের এত দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও কেবল মাতৃকূলের সম্পর্কের কারণে যদি 'ঈসা (আ) ইবরাহীমের বংশধর হতে পারেন তাহলে হাসান ও হুসায়ন (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) দৌহিত্র হয়ে তাঁর বংশধর হতে বাধা কোথায়? তাঁর এ যুক্তিতে হাজ্জাজ সন্তুষ্ট হন।[১৬]

হিজরী ১১৯, মতান্তরে ১২০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৭] তবে খলীফা ইবন খায়্যাত তাঁর তারীখে হিজরী ৮০ সনের পরে এবং ৯০ সনের আগে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের সাথে ইয়াহইয়ার জীবনী আলোচনা করেছেন।[১৮]

---

১৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭৫

১৫. সূরা আল-আন'আম-৮৪-৮৫

১৬. শাজারাত আয-যাহাব-১/১৭৬

১৭. তাবি'ঈন-৫১৪

১৮. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৩২/৫৫

আইউব ইবন আবী তামীমা আস-সাখতিয়ানী (রহ)

হযরত আইউবের ডাকনাম আবূ বাকর এবং পিতার নাম কায়সান। কিন্তু তিনি আবূ তামীমা ডাকনামে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। আইউব 'আনযা গোত্রের দাসত্বের রশি গলায় নিয়ে বেড়ে ওঠেন। তাঁর বাসস্থান ছিল বসরার বানূ আল-হারীশে।[১]

তার মাহাত্ম্য ও মনীষা

তিনি যদিও দাস ছিলেন, তবে 'ইল্‌ম ও 'আমলের জগতের মুকুটধারী ছিলেন। আল্লামা ইবন সা'দ লিখেছেন ঃ[২]

كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا فِي الْحَدِيْثِ جَامِعًا عَدْلاً وَرِعًا كَثِيْرَ الْعِلْمِ حُجَّةً.

"হাদীছে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, বহুগুণের সমাহার, ন্যায়নিষ্ঠ, আল্লাহভীরু, বহু জ্ঞানের অধিকারী দলিল-প্রমাণ সদৃশ মানুষ।"

ইমাম নাওবী লিখেছেন, তার মহত্ত্ব, নেতৃত্ব, অগ্রগামিতা, মুখস্থ শক্তি, বিশ্বাসযোগ্যতা, জ্ঞানের ব্যাপকতা, উপলব্ধি ক্ষমতা এবং উঁচু মর্যাদার ব্যাপারে সকলে একমত।[৩] ইবনুল 'ইমাদ-আল-হাম্বলী তাঁকে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় 'আলিম বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

শ্রেষ্ঠ 'আলিমগণের স্বীকৃতি

তাঁর সমকালীন সকল বড় 'আলিম তাঁর জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষতা ও মহত্ত্বের কথা স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত তাবি'ঈ শু'বা তাঁকে "সায়্যিদুল 'উলামা"– 'আলিমদের নেতা অভিধায় ভূষিত করতেন। ইবন 'উয়ায়না বলতেন, আমি ৮৬ (ছিয়াশি) জন তাবি'ঈর সাক্ষাৎ লাভ করেছি, কিন্তু তাঁদের কাউকে আইউবের সমতুল্য পাইনি। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, আমার যে সকল মুহাদ্দিছ ও 'আলিমের কাছে বসার সুযোগ হয়েছে, আইউব তাঁদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্নাতের বেশি অনুসরণকারী। তাঁকে শীর্ষস্থানীয় 'আলিম গণ্য করা হতো। হিশাম ইবন 'উরওয়া বলতেন, বসরায় আইউবের মত দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ) তাঁকে বসরার নওজোয়ানদের নেতা বলতেন। ইবন 'আওন বলতেন, মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের ওফাতের পর আমাদের সামনে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাঁর স্থান পূরণ করার জন্য কে আছে? কিন্তু আমরা এমনিতেই জবাব পেয়ে গেলাম যে, আইউব আছেন। হিশাম ইবন 'উরওয়া বলেন, আমি বসরায় আইউবের মত আর কাউকে দেখিনি।[৫]

---

১. তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-২/৪০৪

২. তাবাকাতু ইবন সা'দ-৭/১৪

৩. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৩১

৪. শাজারাত আয-যাহাব-১/১৮০

৫. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৩২; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৩১, তাহ্‌যীব আল-কামাল-২/৪০৭

হাদীছ

তিনি বসরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী লিখেছেন, তিনি ছিলেন হাফিজ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। হাদীছের জ্ঞান তিনি লাভ করেন বড় বড় তাবি'ঈদের নিকট থেকে। 'উমার ইবন সালামা জারমী, আবূ রাজা' 'আতারুদী, আবূ 'উছমান নাহ্দী, আবুশ শা'ছা' জাবির ইবন যায়দ, হাসান আল-বাসরী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ, নাফি' ইবন আবী মুলায়কা, ইবন মুনকাদির, হুমায়দ ইবন বিলাল, আবূ কিলাবা আল-জারমী, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, 'আবদুর রহমান ইবন কাসিম, 'ইকরিমা, আতা' (রহ) প্রমুখ 'আলিমদের নিকট থেকে হাদীছ শোনেন এবং তাঁদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন।[৬] হাদীছে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৮০০ (আটশো) এবং কোন কোন বর্ণনা মতে ২০০০ (দু'হাজার) এ পৌঁছে।[৭] মু'আল্লা ইবন মানসূর বলেন, আমি ইসমা'ঈল ইবন 'উলায়্যার নিকট বসরার হাফিজে হাদীছ কারা তা জানতে চাইলাম। তিনি এই লোকগুলোর নাম উল্লেখ করলেন ঃ আইউব, ইবন 'আওন, সুলায়মান আত-তায়মী, হিশাম আদ-দাস্তুওয়ায়ী ও সুলায়মান ইবন আল-মুগীরা (রহ)।[৮]

ইমাম মালিক, সুফইয়ান ছাওরী, ইবন 'উয়ায়না, ইবন 'উল্লবা, মা'মার, আ'মাশ, কাতাদা, শু'বা (রহ) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও ইমাম তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। আল-মিয্যী তাঁর বিখ্যাত ৫৫ জন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৯]

হাদীছ শাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের নিকট তাঁর বর্ণিত হাদীছের স্থান

অবস্থা ও গুণগত দিক দিয়ে তাঁর বর্ণনাসমূহের যে মর্যাদা ও স্থান ছিল তা কয়েকজন মুহাদ্দিছের মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায়। তাঁর বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে আবূ হাতিমের ধারণা ছিল, তাঁর মত ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন নেই।[১০] মুহাম্মাদ ইবন সীরীন তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত বলেছেন। মুসলিম ইবন আকয়াস বলেন, আমি ইবন সীরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, অমুক অমুক হাদীছ আপনার নিকট কে বর্ণনা করেছে? বললেন ঃ বিশ্বস্ত, বিশ্বস্ত ব্যক্তি আইউব।[১১] ইবন আল-মাদীনী, নাসাঈ, ইবন খায়ছামা প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁর বর্ণনাসমূহকে অতি উঁচু মর্যাদার বলে মনে করতেন। আর শু'বা তো তাঁর ঐ সকল বর্ণনাকে যাতে আইউবের নিজেরই সন্দেহ হতো, অন্যদের নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত বর্ণনাসমূহের উপর প্রাধান্য দিতেন। একবার তিনি আইউবের

---

৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩১

৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৯৭-৩৯৮; তাহ্যীব আল-কামাল-২/৪০৬

৮. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৪০৭

৯. প্রাগুক্ত-২/৪০৫-৪০৬; তাহ্যীব আল-কাসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৩২

১০. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৪০৮

১১. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৩১-১৩২

কাছে একটি হাদীছ সম্পর্কে জানতে চান। তিনি বলেন, এতে আমার সন্দেহ আছে। শু'বা বললেন, আপনার সন্দেহ আমার নিকট অন্যদের দৃঢ় প্রত্যয়ের চেয়েও পছন্দনীয়।[১২]

ফিক্‌হ শাস্ত্রেও তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিল। শু'বা তাঁকে "সায়্যিদুল ফুকাহা"– ফকীহদের নেতা বলতেন।[১৩] কিন্তু চরম সতর্কতার কারণে ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পায়নি।

সতর্কতা

এমন মুহাদ্দিছ ও ফকীহ্‌সুলভ দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীছ বর্ণনা এবং ফিক্‌হ সংক্রান্ত মাসয়ালা বলার ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, প্রশ্নের জবাব দানের ক্ষেত্রে আমি আইউব ও ইউনুছের চেয়ে অন্য কাউকে বেশি অজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখিনি। জবাব দিলেও তার আগে প্রশ্নকারীর স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা করে দেখতেন যে, সে তাঁর জবাবটি যথাযথভাবে মানুষের নিকট উপস্থাপন করতে পারবে কিনা। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, যখন কোন ব্যক্তি আইউবের নিকট কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তখন তার মুখ থেকে প্রশ্নটি আবার শুনতে চাইতেন। যদি তা হুবহু পূর্বের মত হতো তাহলে জবাব দিতেন, আর যদি দ্বিতীয়বার কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে ফেলতো তাহলে জবাব দিতেন না। জবাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতেন না, বরং শুধুমাত্র হাদীছ ও সুন্নাহ্‌র বিধান বলে দিতেন। যদি সে বিষয়ে কোন হাদীছ তাঁর কাছে না থাকতো তাহলে নিজের অজ্ঞতার কথা জানিয়ে দিতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি কোন একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি সাফ বলে দেন, এ বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। প্রশ্নকারী বললো, কিয়াস ও যুক্তির ভিত্তিতে আপনার মতটি বলুন। বলেন, আমার কোন মতও নেই।[১৪]

নিজের মতামতকে তিনি একটি বাতিল জিনিস বলে মনে করতেন। এক ব্যক্তি একবার তাঁকে বললো, আপনি কোন মাসয়ালায় নিজের মতামত প্রকাশ করেন না কেন? তিনি উপমার মাধ্যমে জবাব দেন যে, এক ব্যক্তি গাধাকে প্রশ্ন করে, তুমি জাবর কাট না কেন? জবাবে গাধা বলে, এই বাতিল ও অসার বস্তু চিবাতে আমার ভালো লাগে না।[১৫]

জ্ঞানের অহঙ্কারের ভীতি ও সাবধানতা

মানুষ যখন কোন সম্মানজনক অবস্থান অথবা মর্যাদাবান স্তরে পৌঁছে যায় তখন আত্মতুষ্টি ও অহঙ্কার থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য খুবই কষ্টকর। এ জন্য আইউব সব সময় ভীত থাকতেন। তিনি বলতেন, কোন্ মানুষ এর থেকে মুক্ত হতে পেরেছে? যখন কোন ব্যক্তি

---

১২. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/৩৯৮

১৩. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৩১; তাহ্‌যীব আল-কামাল-২/৪০৬

১৪. তাবাকাতু ইবন সা'দ-৭/১৪

১৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৩১; তাবি'ঈন-৫৫

হাদীছ বর্ণনা করে এবং তার ভিত্তিতে সে মানুষের হৃদয়ে একটি স্থান করে নেয় তখন তার অন্তরে কিছু জিনিস, যেমন ঃ আত্মতুষ্টি, অহমিকা, গর্ব-অহঙ্কার ইত্যাদির উদয় ঘটে।[১৬]

কিন্তু তিনি এই পঙ্কিলতা থেকে নিরাপদ ছিলেন। জ্ঞানের এটাও একটা ঔদ্ধত্য যে, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতা অন্যের কাছে প্রকাশ হতে দেয় না। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি অনেক প্রশ্নকারীকে সাফ বলে দিতেন যে, এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। কাউকে বলতেন, অন্য কোন 'আলিমকে জিজ্ঞেস কর।[১৭]

জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে তাঁর আচরণ

জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে তিনি ভীষণ ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে সম্মানও করতেন। তার অবস্থা অতি সাধারণই হোক না কেন। রাবী' ইবন মুসলিম বলেন, একবার আমি আইউব আস-সাখতিয়ানীর সফরসঙ্গী ছিলাম। আমরা যখন আবতাহ উপত্যাকায় তখন একজন অতি সাধারণ পোশাক পরা মোটা মানুষের সাথে দেখা হয়। সে আইউবকে খুঁজছিল। আমি তাঁকে বললাম, একজন সাধারণ মানুষ আপনাকে খুঁজছে। তিনি লোকটিকে দেখামাত্র দৌড়ে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন। লোকটির পরিচয় নিয়ে জানা যায়, তিনি প্রখ্যাত 'আলিম তাবি'ঈ হযরত সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রহ)।[১৮]

'ইবাদত-বন্দেগী

হযরত আইউবের মধ্যে যে স্তরের জ্ঞান ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল আল্লাহ-ভীতি ও দুনিয়ার ভোগ-বিমুখতা। ইমাম মালিক (রহ) বলেন, তিনি ছিলেন একজন 'আমলকারী 'আলিম, ভীষণ আল্লাহ-ভীরু 'আবিদ এবং সৎ মানুষ।[১৯] জীবনে চল্লিশ বার হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।[২০] কিন্তু তিনি নিজের সকল ইবাদত-বন্দেগী গোপন করার চেষ্টা করতেন। বলতেন, এসব কাজ প্রকাশ্যে করার চেয়ে গোপনে করাই উত্তম।[২১] সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন, কিন্তু মানুষের নিকট তা গোপন করার উদ্দেশ্যে প্রত্যুষে এমন জোরে আওয়ায করতেন যাতে সবাই মনে করে তিনি এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন।[২২]

রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি গভীর ভালোবাসা

হযরত রাসূলে কারীমের প্রতি এত উৎসর্গিত প্রাণ ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ

---

১৬. তাবাকাত-৭/১৪

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৫৯

২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩১

২১. তাবাকাত-৭/১৬

২২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩১

শুনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতেন। তাঁর সেই কাঁদা দেখে অন্যদের দয়া হতো।[২৩] ইমাম মালিক (রহ) বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিমাণ দেখে আমি তাঁর নিকট থেকে হাদীছ লিখতে আরম্ভ করি।[২৪] হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইত্তেবা' ও অনুসরণের ক্ষেত্রেও ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, আমি যে সকল লোকের নিকট বসেছি তাদের সবার চেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে বেশি সুন্নাতের অনুসারী আইউবকে পেয়েছি।[২৫]

খ্যাতির প্রতি অনীহা ও দুনিয়াদার মানুষ থেকে দূরে থাকা

হযরত আইউবের মধ্যে পূর্বে উল্লেখিত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান থাকার কারণে তিনি মানুষের দর্শনস্থলে পরিণত হন। কিন্তু তিনি দুনিয়া, দুনিয়াদার মানুষ এবং খ্যাতি ও নাম-কাম থেকে সর্বদা পালানোর চেষ্টা করতেন। কোন জনসমাবেশ ও মানুষের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পথ চলতে গিয়ে সাধারণ পরিচিত ও সোজা পথ বাদ দিয়ে অপরিচিত ঘুর-প্যাচের দীর্ঘ পথে চলতেন। হাম্মাদ-ইবন যায়দ বলেন, পথ চলার সময় আইউব আমাকে দূরের পথে নিয়ে যেতেন। আমি যখন তাঁকে নিকটের পথের কথা বলতাম তখন তিনি বলতেন, আমি অমুক স্থানের মজলিস থেকে দূরে থাকতে চাই। আরেকটি বর্ণনায় হাম্মাদ বলেন, তিনি আমাকে এমন সব রাস্তায় নিয়ে যেতেন যে, সেই রাস্তা তালাশ করা দেখে বিস্মিত হতাম। একাজ করতেন শুধু মানুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য। কিন্তু এ পথেও যখন কারো সামনে পড়ে যেতেন তখন নিজেই প্রথমে সালাম করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে মানুষ তাঁর সালামের জবাবে অনেক কথা বাড়িয়ে বলতো। এভাবে তাঁকে সম্মান করাও তিনি পছন্দ করতেন না। এ কারণে তাঁদের জবাব শুনে বলতেন, আল্লাহ্ তুমি ভালো করে জান, আমি এটা চাইনি; এ আমার ইচ্ছা নয়।[২৬]

মানুষের দৃষ্টি এড়াতে অধিকাংশ সময় অন্য কাউকে নিজের সাথে চলার অনুমতি দিতেন না। শু'বা বলেন, অনেক সময় আমি আমার প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে যেতে চাইতাম, কিন্তু তিনি অনুমতি দিতেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছোট ছোট গলি পথে এদিক ওদিক পেঁচিয়ে যেতেন, যাতে লোকে চিনতে না পারে।[২৭] আর এ কারণে সে যুগে তাঁর স্তরের লোকদের প্রচলিত পোশাক তিনি ছেড়ে দেন। সে যুগের তাপস ও দুনিয়া বিরাগী লোকদের চাদরের প্রান্ত একটু উপরে উঠানো থাকতো। এ ছিল তাঁদের তাপস্য ও বৈরাগ্যের চিহ্ন। এ কারণে তিনি তাঁর চাদর নীচে ছেড়ে দিয়ে চলতেন। মা'বাদ বলেন, আমি আইউবের জামার প্রান্ত লম্বা দেখে প্রতিবাদ করি। তিনি বলেন, আবূ 'উরূবা! পূর্ববর্তী যুগে প্রান্ত ঝুলিয়ে চলা প্রসিদ্ধ ছিল, আর এখন প্রসিদ্ধি গুটিয়ে চলাতে।[২৮]

---

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৪৯

২৫. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/১৩৩

২৬. তাবি'ঈন-৫৭

২৭. তাবাকাত-৭/১৫-১৬

২৮. প্রাগুক্ত

বিত্তবানদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা

তিনি সব সময় বিত্তবান ও ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী ব্যক্তিদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকতেন। এমনকি খলীফা ও আমীর-উমারাদের কেউ তাঁর বাড়িতে আসা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, আমার ছেলে বাকর আমার সবচেয়ে প্রিয়। তাকে আমি দাফন করে দিতে পারি, তবু খলীফাদের কেউ আমার কাছে আসা পছন্দ করি না। উমাইয়্যা বংশের ইয়াযীদ ইবন আল-ওয়ালীদ ছিলেন আইউবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যখন তিনি খলীফা হলেন তখন আইউব দু'আ করলেন এই বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْسِهْ ذِكْرِىْ 'হে আল্লাহ! তাঁর মন থেকে আমার কথা ভুলিয়ে দাও।'[২৯]

প্রফুল্ল ও মিষ্টি স্বভাব

পূর্বের আলোচনা থেকে কেউ যেন মনে না করে যে, তিনি গোঁমড়া মুখ ও রুক্ষ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। মূলতঃ তিনি নিজেকে লুকানোর জন্যই মানুষের সাথে মেলামেশা পছন্দ করতেন না। অন্যথায় তিনি ছিলেন দারুণ প্রফুল্ল ও মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, আমি আইউবের চেয়ে বেশি আর কাউকে মানুষের সাথে হাসি মুখে ও অন্তর খুলে মিশতে দেখিনি।[৩০] কেউ অসুস্থ হলে অথবা কারো মৃত্যু হলে তিনি রোগীকে দেখতে এবং মৃতের আপনজনকে সান্ত্বনা দিতে যেতেন। তখন মনে হতো সেই ব্যক্তি তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানিত। এ রকম অবস্থায় তিনি অতি সাধারণ মানুষের বাড়িতেও উপস্থিত হতেন। ইয়া'লা ইবন হাকাম নামক একজন দাস তাঁর মহল্লায় থাকতো। সে শুধু তার মাকে রেখে মারা যায়। তিনি তার বাড়িতে একাধারে তিন দিন যান এবং দরজায় গিয়ে বসতেন।[৩১]

ওফাত

হিজরী ১৩১ সনে বসরায় 'তাউন' রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ (তেষট্টি) বছর।[৩২] একটি লাল চাদর তিনি বহু দিন পূর্ব থেকে কাফনের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। তিনি সেটি ইহরাম অবস্থায় এবং রমজানের তিরিশ তারিখ রাতে জড়াতেন। মৃত্যুর পূর্বে চাদরটি চুরি হয়ে যায়।[৩৩]

তাঁর মাথায় একটি জটা ছিল। বছরে একবার এবং সাধারণতঃ হজ্জের সময় মুড়ে ফেলতেন। শেষ বয়সে মাথা ও দাড়ির চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে লাল খিজাবও লাগাতেন।[৩৪]

---

২৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩১

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. তাবাকাত-৭/১৬

৩২. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৪০৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩২

৩৩. তাবাকাত-৭/১৬-১৭

৩৪. তাবি'ঈন-৫৯

তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন অতি প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্ তাঁর দু'আ সাথে সাথে কবুল করতেন। এমন কয়েকটি ঘটনা সীরাতের গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়। যেমন ইবন 'আকীল 'শামায়িল আয-যুহ্হাদ' গ্রন্থে বলেছেন, একবার আইউব একটি কাফেলার সাথে মক্কা যাচ্ছেন। পথিমধ্যে মরুভূমিতে পানি সংকট দেখা দিল। সহযাত্রীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তিনি একটি স্থানে হাত দিয়ে একটি বৃত্তের মত রেখা টানলেন। তারপর দু'আ করলেন। সাথে সাথে সেখানে একটি পানির ঝর্ণা সৃষ্টি হলো। লোকেরা পান করলো এবং তাদের পশুগুলোকেও পান করালো। প্রয়োজন শেষ হলে তিনি আবার সেই বৃত্তের উপর হাত ঘোরালেন এবং ঝর্ণাটি বন্ধ হয়ে গেল। এ রকম আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা 'আবদুল ওয়াহিদ ইবন যায়দ বর্ণনা করেছেন।[৩৫]

---

৩৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩২

জাবির ইবন যায়দ (রহ)

হযরত জাবিরের (রহ) ডাকনাম আবূ আশ-শা'ছা'। পিতার নাম যায়দ। আযদ গোত্রের সন্তান এবং বসরার অধিবাসী।[১] উমান মতান্তরে বসরার 'আল-জাওফ' নামক স্থানের সাথে সম্পর্ক বুঝানোর জন্য তাঁকে 'আল-জাওফী' বলা হয়।[২]

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত জাবির (রহ) বহু 'আলিম সাহাবীর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তবে হাবরুল উম্মাহ্ (উম্মাতের মহাজ্ঞানী) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) সাহচর্যে সবচেয়ে বেশি অবস্থান করেন। এ কারণে তাঁকে "সাহিবু ইবন আল-আব্বাস" অর্থাৎ ইবন আল-আব্বাসের (রা) সাথী বলা হতো।[৩] এই সাহচর্যের কল্যাণে তিনি বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হন এবং তাঁর সময়ের একজন বিশিষ্ট 'আলিম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে "أحد الأعلام" বা "বিশিষ্টজনদের একজন" বলেছেন।[৪] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা, দৃঢ়তা ও সুউচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে সকলে একমত। তিনি ছিলেন তাবি'ঈ ইমাম ও ফকীহদের মধ্যে একজন।[৫]

কুরআন

কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ তথা সকল ইসলামী জ্ঞানে তিনি সমান পারদর্শিতা অর্জন করেন। 'উলূমুল কুরআন বা কুরআন বিষয়ক বিবিধ জ্ঞানে ছিলেন বিশেষভাবে পারদর্শী। তাঁর মহান শিক্ষক হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা), যিনি নিজেও একজন শ্রেষ্ঠ কুরআন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, বলেন :[৬]

لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما فى كتاب الله.

"বসরাবাসীরা যদি জাবির ইবন যায়দের কথা মেনে নেয় তাহলে কিতাবুল্লাহর (কুরআন) মধ্যে যা কিছু আছে সে বিষয়ে তাদের জ্ঞান অনেক প্রশস্ত হয়ে যাবে।"

হাদীছ

তিনি হাদীছেরও একজন বড় হাফিজ ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে হাদীছের বিশিষ্ট

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭২

২. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-৩/২৮৬

৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩

৪. প্রাগুক্ত

৫. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৪২

৬. তাহ্যীব আল-কামাল-৩/২৮৬

'আলিমদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৭] হাদীছের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র, হাকাম ইবন 'আমর আল-গিফারী, আমীর মু'আবিয়া (রা) প্রমুখের মত শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণের নিকট থেকে। তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে 'আমর ইবন দীনার, ইয়া'লা ইবন মুসলিম, আইউব আস-সাখতিয়ানী, 'আমর ইবন জুরহুম (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৮]

ফিক্হ

ফিক্হ বিষয়েও তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিল। ইমাম নাওবী (রহ) তাঁকে তাবি'ঈ ইমাম ও ফকীহদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৯] সাহাবা (রা) ও তাবি'ঈন কিরাম (রহ) ফিক্হ বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতার কথা স্বীকার করেছেন। দাহহাক আদ-দাব্বী বলেন, একবার হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাওয়াফের মধ্যে জাবির ইবন যায়দের দেখা পান। তখন তিনি জাবিরকে লক্ষ্য করেন বলেন :[১০]

يا جابر إنك من فقهاء البصــرة وإنــك تُستفتى فــلا تفتــين إلا بقـرآنٍ نـاطق أو سـنة ماضية، فان لم تفعل هلكت وأهلكت.

"ওহে জাবির! তুমি বসরার একজন অন্যতম ফকীহ্ এবং তুমি মানুষের জিজ্ঞাসার জবাবে ফাতওয়া দিয়ে থাক। তবে কখনো স্পষ্টভাষী কুরআন ও কার্যকর সুন্নাহ ব্যতীত ফাতওয়া দেবে না। এমনটি না করলে তুমি নিজেও ধ্বংস হবে এবং অন্যদেরকেও ধ্বংস করবে।"

হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন :[১১]

سئل أيوب هل رأيت جابر بن زيد؟ قال : نعـم، كـان لبيبًـا لبيبًـا وجعـل يعجـب من فقهه.

"আইউবকে জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কি জাবির ইবন যায়দকে দেখেছেন? বললেন : হাঁ, দেখেছি। তিনি ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান মানুষ। তারপর উচ্ছ্বসিতভাবে তাঁর ফিক্হ বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন।"

ইয়াস ইবন মু'আবিয়া ছিলেন বসরার বিখ্যাত কাজী। তিনি বলেন :[১২]

أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد.

---

৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩
৮. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-২/৩৮
৯. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/১৪২
১০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩
১১. প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাত-৭/১৩১
১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭২

"আমি বসরাবাসী ও তাদের মুফতী জাবির ইবন যায়দকে পেয়েছি।" অপর একটি বর্ণনামতে তিনি বলেন, জাবির ছাড়া বসরাবাসীদের সত্যিকার কোন মুফতী ছিল না।[১৩]

হযরত হাসান আল-বাসরীর (রহ) অনুপস্থিতিতে জাবির ফাতওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতেন।[১৪]

হযরত জাবির (রহ) কোন এক কারণে একবার কারারুদ্ধ হন। ধারণা করা হয় যে, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের যুলুম-অত্যাচারের শিকারে পরিণত হন তিনি। তাঁর জ্ঞানের উপর বসরাবাসীদের এত আস্থা ছিল যে, তারা তাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর লাভের জন্য কারাগারে তাঁর নিকট ছুটে যেত। কাতাদা বলেন, জাবির কারারুদ্ধ হলেন। সে সময় হিজড়ের উত্তরাধিকারের বিষয়ে একটি সমস্যা দেখা দিলে লোকেরা কারাগারে তাঁর নিকট সমাধান চেয়ে পাঠালো। তিনি বললেন, তোমরা তো বেশ ভালো। আমাকে কারাগারে আটক রেখেছো, আবার আমার নিকট ফাতওয়াও চাচ্ছো। অতঃপর তিনি জবাব পাঠিয়ে দেন।[১৫] বসরাবাসীদের কেউ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট কোন কিছু জানতে চাইলে বলতেন : تسألوني عن شئ وفيكم جابر بن زيد - তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছো, অথচ তোমাদের মধ্যে তো জাবির ইবন যায়দ আছে।[১৬]

হযরত জাবিরের ব্যক্তি সত্তাটি ছিল বহু জ্ঞানের সমাহার, তিনি তাঁর যুগের একজন খুব বড় 'আলিম ছিলেন। 'আমর ইবন দীনার বলতেন :[১৭]

ما رأيت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زير.

"আমি জাবির ইবন যায়দ অপেক্ষা ফাতওয়া বিষয়ে অধিক জানে এমন কাউকে দেখিনি।" তাঁর মৃত্যুর পর হযরত কাতাদার (রহ) মুখ থেকে বার বার উচ্চারিত হচ্ছিল : اليوم دفن علم الأرض - "আজ পৃথিবীর জ্ঞান দাফন হয়ে গেল।"[১৮]

জ্ঞান গ্রন্থাবদ্ধকরণ

সেই যুগের কিছু মহান ব্যক্তির মত তিনিও জ্ঞান গ্রন্থাবদ্ধ করা পছন্দ করতেন না। 'আমর ইবন দীনার বলেন, কিছু লোক জাবির ইবন যায়দকে বললো, মানুষ আপনার মুখ থেকে যা শোনে তা লিখে ফেলে। একথা শুনে তিনি "ইন্না লিল্লাহ" উচ্চারণ করে বলেন, তারা লিখে ফেলে? তাঁর অনীহা দেখে তাঁর ছাত্রদের অনেকে লেখা ছেড়ে দেয়।[১৯]

---

১৩. আত-তাবাকাত-৭/১৩১
১৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-২/৩৮
১৫. আত-তাবাকাত-৭/১৩১
১৬. তাহ্যীব আল-কামাল-৩/২৮৬
১৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩; আত-তাবাকাত-৭/১৩১
১৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩
১৯. আত-তাবাকাত-৭/১৩৬

এত জ্ঞান-গরীমার সাথে চারিত্রিক বহু গুণ ও বৈশিষ্ট্যে তিনি বিভূষিত ছিলেন। ভালো কাজের বিপরীতে দুনিয়ার যে কোন সুখ-সম্পদের কোন রকম গুরুত্ব তাঁর কাছে ছিল না। তিনি বলতেন, ষাট বছর জীবন পূর্ণ হতে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছু পেয়েছি, আল্লাহর বহু অনুগ্রহ লাভ করেছি। কিন্তু এই ভালো কাজ ছাড়া অবশিষ্ট যা কিছু আমি করেছি এবং এ সকল সুখ-সম্পদ আমার জুতার থেকেও হেয় ও তুচ্ছ। মুহাম্মাদ ইবন হুসায়ন বলতেন, আল্লাহ জাবিরের প্রতি দয়া করুন! তিনি দিরহামের বিপরীতেও একজন মুসলিম ছিলেন।[২০]

একটি অপবাদ ও তাঁর সম্পর্কহীনতা

চরমপন্থী খারিজী সম্প্রদায়ের একটি উপদলের নাম 'ইবাদিয়া'।[২১] তাদের কিছু লোক তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতো। এ কারণে তাঁর সম্পর্কে কিছু মানুষের এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এই সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক আছে অথবা কমপক্ষে তাদের চিন্তা-দর্শন দ্বারা তিনি কিছুটা প্রভাবিত। কিন্তু তাদের এ ধারণা সবই অমূলক ও ভিত্তিহীন ছিল। ইবাদিয়াদের সাথে তাঁর উঠা-বসা ছিল ঠিক, তবে তাদের চিন্তা-দর্শনের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি তাঁর জীবনে বার বার এবং শেষ জীবনে অন্তিম রোগ শয্যায়ও ইবাদিয়াদের চিন্তা-বিশ্বাসের সাথে তাঁর সম্পর্কহীনতার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। তাঁর অন্তিম সময়ে যখন অবস্থা একেবারেই খারাপ হয়ে পড়ে তখন ছাবিত আল-বানানী তার কাছে জানতে চান, আপনার কোন ইচ্ছা আছে কি? বললেন : হাসান আল-বাসরীকে এক নজর দেখতে চাই। সে সময় হাসান আল-বাসরী (রহ) সরকারের কোপদৃষ্টিতে ছিলেন। তাই গ্রেফতার এড়াতে আবূ খলীফা নামক এক ব্যক্তির গৃহে আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁকে জাবিরের ইচ্ছার কথা জানানো হলো। সাথে সাথে তিনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু ছাবিত তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, বের হলে গ্রেফতার হওয়ার ভয় আছে। তিনি জবাব দিলেন : আল্লাহ আমাকে শত্রুর দৃষ্টি থেকে রক্ষা করবেন। তিনি নিষেধ উপেক্ষা করে তখনই রাতের অন্ধকারে জাবিরের নিকট পৌছেন। জাবিরের একা উঠে বসার শক্তি ছিল না। তাই অন্যের সাহায্য নিয়ে উঠে বসেন। হাসান আল-বাসরী (রহ) তাঁকে কালিমা তায়্যিবা পড়ার তালকীন দেন এবং তিনি কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করেন। তারপর তিনি ইবাদিয়াদের বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য জাবিরের কাছে জিজ্ঞেস করেন, ইবাদিয়াদের সাথে তোমার সম্পর্কের প্রকৃতিটি কেমন ছিল?

---

২০. প্রাগুক্ত-৭/১৩৪

২১. 'আবদুল্লাহ ইবন ইবাদ-এর অনুসারীদেরকে 'ইবাদিয়া' বলা হয়। উমাইয়্যা খলীফা মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের সময় তারা বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে এবং 'তাবালা' নামক স্থানে 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আতিয়্যা তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। (আশ-শাহরিস্তানী, আল-মিলাল ওয়া আন-নিহাল-১৩৪)

জাবির বলেন, আমি আল্লাহর কাছে তাদের ব্যাপারে দায়মুক্তি চাই। হাসান আল-বাসরী (রহ) আবার প্রশ্ন করেন : তাদের ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? জাবির তাদের সাথে নিজের সম্পর্কহীনতার কথা প্রকাশ করেন। তখন জাবিরের একান্তই অন্তিমদশা। এ কারণে হাসান আল-বাসরী (রহ) তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু তখনো জাবিরের জীবনকাল শেষ হয়নি। তাই হযরত হাসান (রহ) সুবহে সাদিক হওয়ার পর নামাযে জানাযার ভঙ্গিতে চারটি তাকবীর উচ্চারণ করে জাবিরের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন। তারপর অন্ধকারেই নিজের অবস্থান স্থলে ফিরে যান।[২২] আর এ রোগেই হযরত জাবির (রহ) ইনতিকাল করেন।

ওফাত

ইমাম আহমাদ, আল-ফাল্লাস ও বুখারীর মতে তিনি হিজরী ৯৩ সনে ইনতিকাল করেন। পক্ষান্তরে আল-ওয়াকিদী ও ইবন সা'দের মতে তাঁর মৃত্যু সন হিজরী ১০৩ এবং আল-হায়ছাম ইবন 'আদীর মতে হিজরী ১০৪।[২৩]

---

২২. আত-তাবাকাত-৭/৩২

২৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১.৭৩; তাহ্‌যীব আল-কামাল-৩/২৮৭ .

আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (রহ)

তাঁর পূর্ণ নাম আবূ 'আমর আল-আসওয়াদ এবং পিতার নাম ইয়াযীদ। তাঁর দশম ঊর্ধ্বতন পুরুষ "নাখা'"-এর প্রতি আরোপ করে তাঁকে নাখা'ঈ বলা হয়। কূফার অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন "মুখাদরাম" ব্যক্তি ছিলেন। যাঁরা জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ লাভ করেন তারা হলেন 'মুখাদরাম'।[১] তিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাবি'ঈ 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদের ভাই, 'আলকামা ইবন কায়সের ভাতিজা, ইবরাহীম আন-নাখা'ঈর মামা এবং 'আবদুর রহমান ইবন আল-আসওয়াদের পিতা। তিনি 'আলকামা ইবন কায়সের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন।[২]

জ্ঞান-মনীষা ও 'ইবাদত-বন্দেগীর দিক থেকে আল-আসওয়াদকে কূফার বিশিষ্ট 'আলিমদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইমাম যাহাবী তাঁকে ইমাম, ফকীহ, তাপস, দুনিয়া বিরাগী ও কূফার 'আলিম বলেছেন।[৩] ইমাম নাওবী লিখেছেন, তাঁর বিশ্বস্ততা ও মহত্ত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।[৪]

হাদীছ

হাদীছের বিশিষ্ট হাফিজ ছিলেন। হযরত আবূ বাকর, 'উমার, 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, 'আয়িশা সিদ্দীকা, হুযায়ফা, আবূ মাহযূরা, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, মু'আয ইবন জাবাল, বিলাল ইবন রাবাহ (রা) প্রমুখের মত উঁচু পর্যায়ের সাহাবীর সুহবত এবং তাঁদের থেকে হাদীছ শোনার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত 'উমার (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। উল্লেখিত মহান ব্যক্তিবর্গের সকলের সূত্রে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৫]

ছাত্র-শিষ্য

তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে তাঁর নিজ পরিবারের সকল সদস্য বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হন। যেমন : তাঁর ভাগ্নে ইবরাহীম নাখা'ঈ, ভাই 'আবদুর রহমান ও তাঁর পিতার চাচাতো ভাই 'আলকামা। এই 'আলকামা তো তৎকালীন জ্ঞানের জগতের উজ্জ্বল তারকাতুল্য ছিলেন। তাছাড়া অন্যদের মধ্যে 'আম্মারা ইবন 'উমায়র, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, আবূ বুরদা ইবন আবূ মূসা, মুহারিব ইবন দাছারা, আশ'আছ ইবন

---

১. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৭৪

২. তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-২/২৫১

৩. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৪২

৪. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১২২

৫. তাহযীব আত-তাহযীব-১/৩৪২; তাহযীব আল-কামাল-২/২৫১

আবিশ শা'ছা' (রহ) ও আরো অনেকে তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন। ফিক্হ শাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি একজন ফকীহ্ ছিলেন। ইমাম যাহাবী, ইবন হাজার 'আসকিলানী এবং আরো অনেকে তাঁর ফিক্হ বিষয়ে ব্যুৎপত্তির কথা স্বীকার করেছেন।[৬]

'ইবাদত-বন্দেগী ও দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা

'ইল্মের চেয়েও তাঁর 'আমল যথা : আল্লাহ্ভীতি, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ স্বভাব, 'ইবাদত-বন্দেগী ছিল বেশি সুন্দর। তাবি'ঈদের মধ্যে আটজন মহান ব্যক্তি ছিলেন 'ইবাদত-বন্দেগী এবং দুনিয়া বিরাগী স্বভাবের জন্য সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন : আর-রাবী' ইবন খুছায়ম, 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ আত-তামীমী, উয়াইস আল-কারানী, হারাম ইবন হায়্যান, মাসরূক ইবন আল-আজদা', আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ, আবূ মুসলিম আল-খাওলানী ও আল-হাসান আল-বাসরী (রহ)।[৭] এই তালিকায় আল-আসওয়াদের নামটিও আছে। ইমাম যাহাবী লিখেছেন, তিনি 'ইবাদতের ক্ষেত্রে খুব উঁচু পর্যায়ের ছিলেন।[৮] মনীষীগণ উপরোক্ত আট 'আবিদের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন :[৯]

إن الأسود بن يزيد هو نظير مسروق فى الجلالة والعلم والثقة والسّن، يضرب بعبادتهما المثل.

"মহত্ত্ব, জ্ঞান, বিশ্বস্ততায় ও বয়সে আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ ছিলেন মাসরূক ইবন আল-আজদা'র সমকক্ষ। তাঁদের দু'জনের 'ইবাদতের দ্বারা দৃষ্টান্ত দেয়া হয়।"

নামায

তাঁর জীবনের প্রধান কাজ ছিল নামায আদায় করা। প্রতিদিন সাত শো রাক'আত নফল নামায আদায় করতেন।[১০] সব সময় প্রথম ওয়াক্তেই নামায আদায় করতেন। এ ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিতেন যে, তিনি যে কাজে বা যে কোন অবস্থায় থাকতেন না কেন নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু ছেড়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর সফর সঙ্গীরা বলেছেন, সফর অবস্থায় যত বন্ধুর পথই অতিক্রম করুন না কেন নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথে বাহনের পিঠ থেকে নেমে নামায আদায় করে নিতেন। তারপর আবার সামনে এগোতেন।[১১]

---

৬. প্রাগুক্ত

৭. 'আসরুত তাবি'ঈন-৭৩১-৭৩৩

৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৩

৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৫০-৫১

১০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৩

১১. আত-তাবাকাত-৬/৪৭; 'আসরুত তাবি'ঈন-২৭৫

রোযা

রোযার প্রতিও তাঁর প্রবল আগ্রহ ও মনোযোগ ছিল। প্রায় সব সময় রোযা রাখতেন। প্রচণ্ড গরমের দিনেও রোযা ছাড়তেন না, যখন লাল উটের মত শক্তিশালী এবং তীব্র গরম সহ্য করা প্রাণীও গরমের তীব্রতায় বেহাল অবস্থা হয়ে যেত। সফরেও রোযার ধারাবাহিকতায় কোন রকম ছেদ পড়তো না। অনেক সময় এমন হতো যে, সফরের কষ্ট এবং পিপাসার তীব্রতায় তাঁর চেহারা বিবর্ণ এবং জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত, তবুও তিনি রোযা ছাড়তেন না। এত কঠোর 'ইবাদতের কারণে একটি চোখ নষ্ট হতে চলে, দেহ শুকিয়ে হালকা-পাতলা হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'আলকামা ইবন মারছাদ তাঁকে দেখতে আসেন। পিছন থেকে তাঁর দেহ মৃদু স্পর্শ করে বলেন :

يا أبا عبد الرحمن لم تعذب هذا الجسد؟

"ওহে আবূ 'আবদির রহমান! এই দেহকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন?"

তিনি জবাব দিলেন :

أريد راحة هذا الجسد يا أخا الإسلام، يا أبا شبل الجِدَّ الجِدَّ.

'ওহে ইসলামের ভাই, আমি এই দেহকে শান্তি দিতে চাই। আবূ শাবল! ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।"[১২]

হজ্জ

তাঁর হজ্জ আদায়ের সংখ্যা দেখে বুঝা যায় তাঁর মধ্যে হজ্জ করার আগ্রহ কী পরিমাণ ছিল। জীবনের এমন কোন বছর হয়তো ছিল না যে বছর হজ্জ করেননি। তাঁর হজ্জ ও 'উমরার সম্মিলিত সংখ্যা সত্তর থেকে আশি (৭০-৮০) হবে। মায়মূন ইবন হামযা বলেন: আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ জীবনে আশিটি হজ্জ ও 'উমরা করেন। তবে দু'টি এক সাথে নয়, পৃথকভাবে। তাঁর পুত্র 'আবদুর রহমানও পিতার মত পৃথকভাবে আশিটি হজ্জ ও 'উমরা করেন।[১৩] কখনো কখনো আগ্রহের আতিশয্যে কূফা থেকেই ইহরাম বেঁধে—

لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوْبِ، لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ لَبَّيْـكَ، لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

ধ্বনি দিতে দিতে যাত্রা করে মক্কায় পৌঁছতেন। তবে সব সময় এমন করতেন না, বরং বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে তাঁর ইহরাম বাঁধার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ রাতে মক্কায় প্রবেশ করতেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সাথে ছিল গভীর আবেগের সম্পর্ক। এ ব্যাপারে তিনি ভীষণ কঠোরও ছিলেন। কেউ যদি হজ্জ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করতো তাহলে সে মারা গেলে তার জানাযার নামায পড়তেন না।[১৪]

---

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাহ্যীব আল-কামাল-২/২৫২

১৪. আত-তাবাকাত-৬/৪৭-৪৮

কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন ছিল তাঁর আবাসে-প্রবাসে দিন-রাতের একান্ত সঙ্গী। কুরআন তিলাওয়াত ছিল তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। রমযান মাসে তিলাওয়াতের আগ্রহ আরো বেড়ে যেত। মাগরিব ও 'ঈশার মাঝের সময়টুক শুয়ে থাকতেন। তারপর উঠে নামায আদায় করে সারা রাত তিলাওয়াত করতেন। এক মাসে দু'রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। আর অন্য মাসে প্রতি ছয় রাতে একবার।[১৫]

মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও হৃদ্যতার সম্পর্ক

আজকাল আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতের সামান্য ভিন্নতার কারণে সব রকম সামাজিক কর্মকাণ্ডেও মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদের মত মহান ব্যক্তিদের আদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য। মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁরা পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখতেন। আল-আসওয়াদ হযরত 'উমারের (রা) সাহচর্যে বেশিদিন থাকার কারণে তাঁর অনুসারী ছিলেন। অন্যদিকে 'আলকামা ছিলেন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) শাগরিদ ও অনুসারী। কিন্তু তাঁরা দু'জন যখন মিলিত হতেন তখন তাদের মধ্যে মোটেও মতপার্থক্য দেখা যেত না।[১৬]

ওফাত

হিজরী ৭৫ মতান্তরে ৭৪ সনে তিনি কূফায় ইনতিকাল করেন।[১৭] অন্তিম রোগশয্যায় কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাসে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। যখন বিছানায় একা পাশ-ফেরাতে পারতেন না তখন ভাগ্নে ইবরাহীম নাখা'ঈর সাহায্য নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকেন। আত্মীয়-বন্ধুরা বললেন : আবূ 'আবদির রহমান! এমন অস্থির হচ্ছেন কেন? বললেন : কেন হবো না? আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমাও করে দেন, তাহলেও আমি যে পাপ করেছি তার জন্য তো আমাকে লজ্জা পেতে হবে।[১৮] একেবারে শেষ মুহূর্তে বলেন, আমাকে কালেমায়ে তায়্যিবার তালকীন দাও, যাতে আমার মুখ থেকে বের হওয়া শেষ কথাটি হয়– لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ। - "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"[১৯]

জীবনের শেষ দিকে তাঁর দাড়ি ও মাথার চুল সাদা হয়ে যায়। খিজাব লাগাতেন। চূড়া ওয়ালা টুপি পরতেন, কালো রংয়ের পাগড়ী পরতেন, যার প্রান্ত পিছনের দিকে ছাড়া থাকতো।[২০]

---

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. প্রাগুক্ত; 'আসরুত তাবি'ঈন-২৭৬

১৭. তাহ্যীব আল-কামাল-২/২৫২

১৮. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৭৬

১৯. আত-তাবাকাত-৬/৫০

২০. প্রাগুক্ত-৬/৫৯

আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান (রা)

হযরত 'আবদুল্লাহর (রহ) ডাকনাম আবূ সালামা এবং এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাই অনেকে আবূ সালামা তাঁর আসল নাম বলে মনে করেছেন। তাঁর পিতা মক্কার কুরায়শ গোত্রের বানূ যুহরা শাখার প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) এবং মাতা তুমাদির বিন্‌ত আল আসবাগ। তুমাদির ছিলেন দিমাশকের সন্নিকটে দাওমাতুল জান্দালে বসবাসরত বানূ কাল্‌ব গোত্রের কুদা'আ শাখার সন্তান। বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবীর (সা) জীবনকাল লাভ করেন। তিনি হলেন কাল্‌ব গোত্রের প্রথম মহিলা যাঁর বিয়ে হয় মক্কার কুরায়শ গোত্রের কোন পুরুষের সাথে।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) ছিলেন 'আশারা মুবাশ্‌শারার (জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন) অন্যতম সদস্য। এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তিনি কত উঁচু মাপের ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। আবূ সালামা এমন মহান পিতার 'ইল্‌ম ও 'আমল (জ্ঞান ও কর্ম)-এর পরিবেশে অত্যন্ত স্নেহ-আদরে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে ওঠেন। পিতার জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলেন এবং অচিরেই সমকালীনদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিতে পরিণত হন। অনেক 'আলিম তাঁকে মদীনার সাত ফকীহ্‌র মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে এটা সর্বজন গৃহীত মত নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর নামটি উচ্চারিত হওয়া তাঁর যোগ্যতার একটি বড় প্রমাণ। জ্ঞানের জগতে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা এবং তাঁর ইমাম হওয়ার ব্যাপারে 'আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, আবূ সালামার ইমাম হওয়া এবং তাঁর সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে সকলে একমত।[২]

হাদীছ

তিনি পিতা হযরত 'আবদুর রহমান ইবন আওফের (রা) নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। তাছাড়া উঁচু স্তরের আরো অনেক সাহাবীর (রা) নিকট থেকেও তিনি তাঁর জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটান। যেমন : হযরত 'উছমান, তালহা, 'উবাদা ইবন আস-সামিত, আবূ কাতাদা, আবুদ দারদা', উসামা ইবন যায়দ, হাস্‌সান ইবন ছাবিত, রাফি' ইবন খাদীজ, ছাওবান, নাফি' ইবন আল-হারিছ, 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম, আবূ হুরায়রা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, আনাস ইবন মালিক, জাবির, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, উম্মুল

---

১. তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-২১/২৬৯; তাবি'ঈন-৫৩৪

২. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত

মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকা, উম্মু সালামা (রা) ও আরো অনেকে। উঁচুস্তরের বহু তাবি'ঈর নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন। তাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ।[৩]

উপরে উল্লেখিত মহান ব্যক্তিবর্গের অনুগ্রহ ও অবদান তাঁকে হাদীছের ইমামের পদে অধিষ্ঠিত করে। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :[৪]

كان من كبار أئمة التابعين غزير العلم ثقة عالما.

"তিনি ছিলেন তাবি'ঈ ইমামদের অন্যতম, অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী, বিশ্বস্ত 'আলিম ব্যক্তি।"

ইবন সা'দ বলেন : كان ثقة فقيهًا كثير الحديث.

"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, সুদৃঢ়, ফকীহ ও বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী।" তিনি আবূ সালামাকে মদীনার 'আলিমদের দ্বিতীয় স্তরে উল্লেখ করেছেন।[৫]

আবূ সালামার (রহ) স্মৃতির ভাণ্ডারে বহু হাদীছ থাকার কথা শ্রেষ্ঠ 'আলিমগণ স্বীকার করেছেন। ইমাম যুহরী (রহ) বলেন, ইবরাহীম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন কারিজ আমাকে বলতেন যে, তোমাদের মধ্যে দু'ব্যক্তির চেয়ে হাদীছের অন্য কোন বড় 'আলিম আমি দেখিনি। একজন 'উরওয়া ইবন যুবায়র এবং অন্যজন আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান।[৬] ইমাম যুহরী আরো বলেন :[৭]

أربعة من قريش وجدتهم بحورا : عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الله.

"আমি চার ব্যক্তিকে জ্ঞানের সাগর রূপে পেয়েছি। তাঁরা হলেন : 'উরওয়া ইবন যুবায়র, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, আবূ সালামা ও 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ।"

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এখানে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম উপস্থাপন করা হলো : ইমাম শা'বী, 'আবদুর রহমান আল-আ'রাজ, 'আররাক ইবন মালিক, 'আমর ইবন দীনার, আবূ হাযিম, আবূ সালামা ইবন দীনার, যুহরী, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, ইয়াহইয়া ইবন আবী কাছীর, মুহাম্মাদ ইবন 'আমর, সালিম আবুন্ নাদর, আবুয্ যানাদ, সা'দ ইবন ইবরাহীম আল-কাজী (রহ) ও আরো অনেকে।[৮]

---

৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/১১৫; তাহ্যীব আল-কামাল-২১/২৬৯

৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৩

৫. আত-তাবাকাত-৫/১১৬; তাহ্যীব আল-কামাল-২১২৭১

৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/১১৬

৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৩

৮. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২৪১

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্রে আবূ সালামার স্থান এত উঁচুতে ছিল যে, অনেকে তাঁকে মদীনার সাত ফকীহর অন্যতম বলেছেন। ইবন সা'দ তাঁকে ফকীহ বলেছেন।[৯] এই উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট থেকে তিনি ফিক্‌হর জ্ঞান অর্জন করেন। সুযোগ্য শিক্ষকের যোগ্য ছাত্র হিসেবে গভীর অনুধ্যান ও সূক্ষ্ম অনুধাবন ক্ষমতা অর্জন করেন। বিভিন্ন মাসয়ালায় মহান শিক্ষকের সাথে যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হতেন। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষককে নিজের মতে আনতে সক্ষম হন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :[১০]

كان أبو سلمة يتفقّه ويناظر ابن عباس رض ويراجعه.

"আবূ সালামা ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট থেকে ফিক্‌হর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন, তাঁর সাথে যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হতেন এবং তাঁকে তাঁর মত থেকে সরিয়ে নিজের মতে নিয়ে আসতেন।"

ইমাম যুহরী মনে করেন, ইবন 'আব্বাসের (রা) সাথে এই মতপার্থক্যের কারণে তিনি তাঁর অগাধ জ্ঞানের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত থেকে গেছেন।[১১]

বিচারকের পদে

হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে তৎকালীন মদীনার ওয়ালী সা'ঈদ ইবন আল-'আস তাঁকে মাদীনাতুর রাসূলের কাজীর পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু পরবর্তীতে ওলট-পালটের কারণে এ পদে থাকতে পারেননি। সা'ঈদ ইবন আল-'আসের অপসারণ এবং তদস্থলে মারওয়ানের যোগদানের পর আবূ সালামাকে কাজীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।[১২]

ওফাত

খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকের খিলাফতকালে হিজরী ৯৪ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। তবে ১০৪ হিজরীতে ৭২ বছর বয়সে তাঁর ইনতিকাল হয় বলে ভিন্ন একটি বর্ণনায় এসেছে।[১৩]

হযরত আবূ সালামা (রহ) ছিলেন একজন সুদর্শন চেহারার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ। 'আবদুল্লাহ ইবন আবী ইয়া'কূব আদ-দাববী বলেন : আবূ সালামা ছিলেন দীপ্তিমান চেহারার মানুষ। তাঁর চেহারার সেই দীপ্তি ছিল রোমান সম্রাটদের স্বর্ণমুদ্রার দীপ্তির মত। শেষ জীবনে মাথার চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে তিনি মেহদীর খিযাব লাগাতেন।

---

৯. আত-তাবাকাত-৫/১১৬

১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৩

১১. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২১/২৭২

১২. আত-তাবাকাত-৫/১১৫

১৩. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২১/২৭২; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৩

কাতাদা ইবন দি'আমা আস-সাদূসী (রহ)

আবুল খাত্তাব কাতাদার পিতার নাম দি'আমা। তিনি হিজরী ৬১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উর্ধ্বতন ৮ম পুরুষ সাদূস-এর নাম অনুসারে তিনি সাদূসী নামে পরিচিত। তিনি শ্রেষ্ঠ 'আলিম তাবি'ঈদের একজন। জ্ঞানের সাথে কাতাদার স্বভাবগত একটা সম্পর্ক ছিল। তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত একই রকম ছিল। মাতারুল ওয়াররাক বর্ণনা করেছেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত তিনি একজন জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র ছিলেন।[১] তিনি ছিলেন জন্মান্ধ।[২]

তাঁর স্মৃতিশক্তি

জ্ঞান অন্বেষণের তীব্র আকাঙ্ক্ষার সাথে তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তি লাভ করেন। কোন কিছু একবার শুনলে চিরদিনের জন্য তা স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়ে যেত। একবার একটি হাদীছ শোনার পর আর কখনো কোন মুহাদ্দিছের নিকট তা দ্বিতীয়বার শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। একবার যে কথা তার কানে ঢুকেছে তা চিরকালের জন্য অন্তর-ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হয়ে গেছে।[৩] তাঁর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে বিস্ময়কর সব ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন একটি ঘটনা 'ইমরান ইবন 'আবদিল্লাহ বর্ণনা করেছেন। একবার কাতাদা প্রখ্যাত তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) নিকট গেলেন এবং কিছুদিন সেখানে অবস্থানও করেন। এ সময় তিনি সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের নিকট প্রাণ খুলে হাদীছ শুনতে চাইতেন এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতেন। একদিন সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এ পর্যন্ত তুমি আমার নিকট যত কথা জানতে চেয়েছো তা কি সব তোমার মনে আছে? তিনি হাঁ সূচক জবাব দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলো এভাবে বলতে আরম্ভ করলেন : আমি আপনার নিকট একথা জানতে চেয়েছি, আপনি এ জবাব দিয়েছেন। আমি এই প্রশ্ন করেছি, আপনি এই বলেছেন, আর হাসান আল-বাসরী (রহ) এই জবাব দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের নিকট থেকে শোনা সব হাদীছ তাঁকে শুনিয়ে দেন। সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) তাঁর এই প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখে ভীষণ অবাক হলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, আল্লাহ্ তোমার মত মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা আমার কল্পনায়ও ছিল না।[৪]

---

১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৫০

২. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/২২৪

৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৯

৪. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/২২৭

জ্ঞান ও মনীষা

এমন আগ্রহ, আবেগ, জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি তাঁকে কুরআন, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্‌হ, ভাষা, সাহিত্য, আরবদের প্রাচীন ইতিহাস, বংশবিদ্যা ইত্যাদিসহ সেই যুগের সকল ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানের সাগরে পরিণত করে।[৫] আল্লামা নাওবী লিখেছেন, তাঁর মাহাত্ম্য ও জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।[৬]

কুরআন

তিনি কুরআনের হাফিজ ছিলেন। ভালো মুখস্থ ছিল। বড় বড় সূরাগুলো পাঠের সময় একটি শব্দেও ভুল করতেন না। মা'মার বলেন, একবার কাতাদা সা'ঈদ ইবন 'আরূবাকে না দেখে সূরা আল-বাকারা শোনান এবং একটি হরফেও কোন ভুল করেননি। শোনানোর পর তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি ঠিক মত মুখস্থ রেখেছি? তিনি বললেন, হাঁ। সুফইয়ান ইবন 'উয়ানা বলেন : কাতাদা জাবির ইবন 'আবদিল্লাহর (রা) সহীফা থেকে মুখস্থ করতেন। তিনি তা সুলায়মান আল-ইয়াশকুরীর নিকট থেকে নকল করেন।[৭]

তাফসীর

কুরআনের তাফসীরের তিনি একজন বড় 'আলিম ছিলেন। কুরআনের আয়াতের তাফসীর ও তাবীলের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। নিজেই বলতেন, কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যে সম্পর্কে আমি কিছু না কিছু শুনিনি। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলতেন, কাতাদা তাফসীরের একজন বড় 'আলিম ছিলেন।[৮] ইবন হিব্বান বলেন, তিনি কুরআনের সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন। ইবন নাসের উদ্দীন তাঁকে মুফাসসিরুল কিতাব বলেছেন।[৯]

হাদীছ

কাতাদার জ্ঞান চর্চার মূল বিষয় ছিল হাদীছ। এ বিষয়ে তাঁর অবস্থান ছিল অতি উঁচুতে। ইবন সা'দ লিখেছেন, হাদীছে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন ও প্রমাণ সদৃশ্য। আল্লামা যাহাবী তাঁকে হাফিজ ও আল্লামা নামে অভিহিত করেছেন।[১০] তাঁকে ইরাকের সবচেয়ে বড় হাফিজে হাদীছ গণ্য করা হতো। সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব বলতেন, কাতাদার চেয়ে বড় ইরাকের কোন হাফিজে হাদীছ আমাদের এখানে আসেননি। সুফইয়ান বলতেন, দুনিয়ায় কাতাদার সমতুল্য কেউ ছিল না। বাকর ইবন 'আবদিল্লাহ আল-মুযানী

---

৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১১০-১১০
৬. তাবি'ঈন-৩৮৫
৭. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/২২৮
৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৯
৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/৩৫৫; শাযারাত আয-যাহাব-১/১৫৩
১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৯

বলতেন, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় হাফিজে হাদীছ এবং এমন ব্যক্তিকে দেখতে চায় যিনি হাদীছ যেভাবে শুনেছেন হুবহু সেভাবে বর্ণনা করেন, তাহলে তার ক্বাতাদাকে দেখা উচিত।

ما رأيت الذى هو أحفظ منه ولا أجدر أن يؤدى الحديث كما سمعه.

"আমি এমন কাউকে দেখিনি যে তার চেয়ে হাদীছ ভালো মুখস্থকারী এবং তার চেয়ে ভালো হুবহু বর্ণনাকারী।"[১১]

'আবদুর রহমান ইবন মাহদী বলতেন, কাতাদা ছিলেন হুমায়দ-এর মত পঞ্চাশ ব্যক্তি থেকেও বড় হাফিজে হাদীছ।[১২] ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলতেন, কাতাদা বসরাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিজ ছিলেন। যা কিছু শুনতেন মুখস্থ করে নিতেন। একবার তাঁর সামনে জাবিরের সহীফা (পুস্তিকা) পাঠ করা হয়। একবার শুনেই তা মুখস্থ হয়ে যায়।[১৩] ইবন হিব্বান তাঁকে তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় হাফিজে হাদীছ গণ্য করেছেন। সুলায়মান তায়মী ও আইউব সাখতিয়ানীর মত মড় মুহাদ্দিছগণ তাঁর হাদীছের মুখাপেক্ষী ছিলেন এবং তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করতেন।[১৪]

শিক্ষকবৃন্দ

কাতাদার আসল ও প্রধান শায়খ ছিলেন হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ)। বেশির ভাগ তাঁরই ঝর্ণাধারা থেকে জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করেন। বারো বছর তাঁর সাহচর্যে কাটান। তিনি বলতেন, আমি বারো বছর যাবত হাসান আল-বাসরীর (রহ) মজলিসে বসেছি এবং তিন বছর তাঁর সাথে ফজরের নামায আদায় করেছি। আমার মত মানুষ তাঁর মত উঁচু মাপের মানুষের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে। তিনি ছিলেন হাসান আল-বাসরীর (রহ) যোগ্যতম ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। আবূ হাতিম বলতেন, হাসান আল-বাসরীর (রহ) সবচেয়ে বড় সঙ্গীদের মধ্যে কাতাদা একজন।[১৫]

হাসান আল-বাসরী (রহ) ছাড়াও সে যুগের একদল শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন। তাঁদের মধ্যে যেমন সাহাবায়ে কিরাম (রা) ছিলেন, তেমনি ছিলেন তাবি'ঈন কিরাম। যেমন : আনাস ইবন মালিক, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা), সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, 'ইকরিমা, আবূ বুরদা ইবন আবী মূসা, শা'বী, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'উদ, মুতাররিফ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন শিখখীর, হাসান আল-বাসরী, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, 'আমর ইবন দীনার, মাসরূক ইবন

---

১১. তাহযীব আল-কামাল-১৫/২২৭
১২. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৫৭-৫৮
১৩. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/১১০
১৪. তাহযীব আত-তাহযীব-৮/৩৫৫; তাবি'ঈন-৩৮৬
১৫. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৫৮

আওস, মুসলিম ইবন ইয়াসার (রহ) প্রমুখ। জামাল উদ্দীন আল-মিয্‌যী শতাধিক শায়খের নাম উল্লেখ করেছেন।[১৬]

তাঁর এ বিশেষ যোগ্যতা ছিল যে, যে মুহাদ্দিছের নিকটই তিনি গেছেন, অল্পদিনের মধ্যে তাঁর সকল জ্ঞান আত্মস্থ করে ফেলেছেন। একবার সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) নিকট কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং এ সময়ে তিনি তাঁকে এত প্রশ্ন করেন যে তিন দিনের মধ্যে তিনি শংকিত হয়ে তাঁকে বলেন, তুমি এখন যাও, আমার সকল জ্ঞান তুমি শূন্য করে ফেলেছো।[১৭]

তাঁর শিষ্য-শাগরিদ

তাঁর যোগ্যতার কারণে তিনি মানুষের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হন। অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু মানুষ তাঁর দারসের মজলিস থেকে পরিতৃপ্ত হয়েছে। তাদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে। এখানে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্রের নাম তুলে ধরা হলো : আইউব সাখতিয়ানী, সুলায়মান তায়মী, জারীর ইবন হাযিম, শু'বা, মিস'আর, আবূ বিলাল রাসিবী, মাতারুল ওয়াররাক, হাম্মাম ইবন ইয়াহইয়া, 'আমর ইবন হারিছ আল-মিসরী, শায়বান নাহবী, সাল্লাম ইবন আবিল মুতী', সা'ঈদ ইবন আবী 'উরূবা, আবান ইবন ইয়াযীদ আল-'আত্তার, হুসায়ন ইবন যাকওয়ানা, হাম্মাদ ইবন সালামা, আওযা'ঈ, 'আমর ইবন ইবরাহীম 'আবদী, 'ইমরান আল-কাত্তান, সালিহ আল-মুররী, 'আসিম ইবন সুলায়মান আল-আহওয়াল, সুলায়মান আল-আ'মাশ, হুমাইদ আত-তাবীল, সা'ঈদ ইবন আবী 'আরূবা (রহ) প্রমুখ।[১৮]

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। ইবন হিব্বান লিখেছেন, তিনি কুরআন ও ফিক্‌হর বড় 'আলিমদের একজন ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) তাফসীর ও হাদীছে দক্ষতার সাথে ফিক্‌হতেও তাঁর পারদর্শিতার কথা বলতেন।[১৯] বসরার জামা'আতে ইফতার অন্যতম সদস্য ছিলেন।[২০]

যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত দানের ক্ষেত্রে সতর্ক

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে দারুণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোন বিষয়ে জানা না থাকলে নিজের অজ্ঞতার কথা সাফ বলে দিতেন। নিজের মতের উপর ভিত্তি করে কোন মাসয়ালার জবাব দিতেন না। আবূ হিলাল বলেন, একবার আমি কাতাদার নিকট একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলাম।

---

১৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/৩৮১; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/২২৪-২২৬

১৭. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/২২৭

১৮. প্রাগুক্ত; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/৩৫২

১৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/৩৫৫; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৯

২০. আ'লাম আল-মুওয়াক্‌কি'ঈন-১/২৭

তিনি সাফ বলে দিলেন আমি জানিনে। বললাম, নিজের যুক্তির ভিত্তিতে বলে দিন। বললেন : আমি চল্লিশ বছর যাবত নিজের মতের ভিত্তিতে কোন জবাব দিইনি। যখন তিনি একথা বলেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর। তবে আবূ আওয়ানা বলেন, কাতাদা বলতেন, আমি তিরিশ বছর যাবত নিজের মত ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে কোন ফাতওয়া দিইনি।[২১]

কাতাদার মত ব্যাপক মনীষা খুব কম তাবি'ঈর মধ্যে ছিল। তিনি কেবল দীনী 'ইল্মের 'আলিম ছিলেন না, বরং সে যুগে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয় যেমন : আরবী ভাষা, সাহিত্য, আরব জাতির ইতিহাস, বংশ বিদ্যা প্রভৃতিরও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আবূ 'উমার বলেন, তিনি একজন বংশ বিদ্যাবিশারদ ছিলেন।[২২]

আবূ 'উবায়দা বলেন, বানূ উমাইয়্যাদের পক্ষ থেকে প্রতিদিন কোন না কোন ব্যক্তি কাতাদার নিকট ইতিহাস, কবিতা, বংশ বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু না কিছু জানার জন্য আসতো। ইবন নাসেরুদ্দীন তাঁর ব্যাপক মনীষার মূল্যায়ন করেছেন। এভাবে :[২৩]

أبو الخطاب الضرير الأكمه مفسر الكتاب آية فى الحفظ اماما فى النسب رأسا فى العربية واللغة وأيام العرب.

'অন্ধ আবুল খাত্তাব আল-কিতাবের মুফাসসির, মুখস্থ শক্তিতে একটি নিদর্শন, বংশ বিদ্যায় ইমাম, আরবী ভাষা, সাহিত্য ও আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহের জ্ঞানে নেতৃস্থানীয়।'

ইবন সা'দ তাঁকে বসরার তৃতীয় তাবকার (স্তর) মুহাদ্দিছগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

ওফাত

হিজরী ১১৭, মতান্তরে ১১৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন। আবূ হাতিম বলেন, হাসান আল-বাসরীর (রহ) মৃত্যুর সাত বছর পরে তিনি ওয়াসিত নগরে তা'উনে (প্লেগ) আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৬ অথবা ৫৭ বছর। তবে তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের বিস্তর মতভেদ আছে।[২৪]

---

২১. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/২২৮

২২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৯

২৩. শাযারাত আয-যাহাব-১/১৯৩

২৪. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/২৩২-২৩৩

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্ (রহ)

হযরত ওয়াহাবের (রহ) ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :[১]

وهب بن منبه الحافظ أبو عبد الله الصنعانى عالم أهل اليمن.

"ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ একজন হাফিজ, ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি সান'আর অধিবাসী এবং ইয়ামনবাসীদের একজন 'আলিম।" তিনি অনারব বংশোদ্ভূত। পারস্য সম্রাট কিস্‌রা আঁ নওশেরওয়ান যখন সায়ফ যী ইয়াযিনের নেতৃত্বে হাবশায় অভিযান চালান তখন ওয়াহাবের পিতা মুনাব্বিহ পারস্যের হারাত থেকে ইয়ামনে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার মত অন্য যারা বাইরে থেকে ইয়ামনে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে ইতিহাসে তারা "আবনা" (أبناء) নামে প্রসিদ্ধ।[২] এ কারণে আল্লামা আয-যিরিকলী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :[৩]

وهب بن منبه الأبناوى والصنعانى – ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ আবনা' বংশোদ্ভূত, সান'আর অধিবাসী। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে তাঁর পিতা মুনাব্বিহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু সন নিয়ে কিছুটা মত পার্থক্য আছে। তবে প্রসিদ্ধ মতে হিজরী ৩৪, খ্রীস্টাব্দ ৬৫৪ সনে ওয়াহাব ইয়ামনের সান'আয় জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ১১৪, খ্রীস্টাব্দ ৭৩২ সনে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৪] তাঁরা ছিলেন চার ভাই : ওয়াহাব, মা'কিল, হাম্মাম ও গায়লান। ওয়াহাব সবার বড় ও গায়লান সবার ছোট ছিলেন। অপর একটি বর্ণনায় মাসলামা নামে তাঁর আরেক ভাইয়ের নাম জানা যায়।[৫]

জ্ঞান ও মনীষা

ইসলামী জ্ঞানে তিনি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তবে একেবারে অপরিচিতও ছিলেন না। অন্য অনেক ধর্মের গ্রন্থাবলীর একজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাই 'আলিম তাবি'ঈনের মধ্যে তাঁরও একটা বিশেষ স্থান ছিল। আয-যিরিকলী বলেন, তিনি বিভিন্ন ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ থেকে বহু কাহিনীর বর্ণনাকারী এবং পূর্ববর্তীদের বহু কাহিনীর একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত।[৬] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তিনি একজন উঁচু

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০০

২. আল-মাগাযী আল-উলা ওয়া মুয়াল্লিফূহা-২৭; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৪৮৯

৩. আল-আ'লাম-৮/১২৫

৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০০-১০১

৫. তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/২৮৮, ৫০১-৫০২

৬. আল-আ'লাম-৮/১২৫

মর্যাদাসম্পন্ন তাবি'ঈ। তাঁর বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তার ব্যাপারে সকলে একমত। আল-'ইজলী বলেন :[৭]

كان ثقة تابعيا على قضاء صنعاء – 'তিনি একজন বিশ্বস্ত, তাবি'ঈ ব্যক্তি, সান'আর কাজীর পদে আসীন ছিলেন।' 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের সময় তিনি কাজী ছিলেন। খলীফা ইবন খায়্যাত তাঁকে ইয়ামনীদের দ্বিতীয় তাবকায় (স্তরে) এবং ইবন সা'দ তৃতীয় তাবকায় স্থান দিয়েছেন। আবূ যুরআ ও আন-নাসাঈ (রহ) তাঁকে 'ছিকা' (বিশ্বস্ত) বলে প্রত্যয়ন করেছেন।[৮]

হাদীছ

বহু সাহাবীর নিকট থেকে তিনি হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, আবূ হুরায়রা, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, আনাস ইবন মালিক, নু'মান ইবন বাশীর (রা) প্রমুখ সাহাবীর সূত্রে তাঁর বর্ণনা পাওয়া যায়। তাবি'ঈদের মধ্যে তাউস ইবন কায়সান, 'আমর ইবন দীনার, 'আমর ইবন শু'আয়ব, তাঁর ভাই হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ (রহ) প্রমুখের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন।[৯]

তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : তাঁর দু'পুত্র 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান, ভাতিজা 'আবদুস সামাদ ও 'আকীল, দৌহিত্র ইদরীস ইবন সিনান এবং অন্যদের মধ্যে 'আমর ইবন দীনার, সিমাক ইবন ফাদল, ইসরাঈল আবূ মূসা (রহ) ও আরো অনেকে।[১০]

বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে তাঁর পাণ্ডিত্য

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি অন্য ধর্মের গ্রন্থসমূহের একজন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ পারদর্শী সেকালে আর কেউ ছিলেন না। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তিনি প্রাচীন গ্রন্থসমূহের জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।[১১]

ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :[১২]

كان ثقة واسع العلم ينظر بكعب الأخبار في زمانه.

"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর যুগে তাঁকে কা'ব আল-আহবারের সমকক্ষ বলে মানা হতো।"

---

৭. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৪৯

৮. তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৪৮৮; তাবি'ঈন-৫০৩

৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১৯/৪৮৭

১০. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৪৪

১১. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/১৪৯

১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০১

উল্লেখ্য যে, এই কা'ব আল-আহবার ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি। আহলি কিতাবের শ্রেষ্ঠ 'আলিমগণের একজন। হযরত আবূ বাকরের (রা) খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে ইয়ামন থেকে মদীনায় আসেন।

ওয়াহাব ইবন মুনাব্‌বিহ সম্পর্কে একথাও প্রচলিত আছে যে, তিনি ইহূদী বংশোদ্ভূত। প্রাচীন আরবী গ্রন্থসমূহে ছড়িয়ে থাকা অধিকাংশ ইহূদী উপাখ্যানসমূহের উৎস তিনি। প্রাচীন গ্রীক, সুরইয়ানী, ও হিমইয়ারী ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন এবং দুর্বোধ্য প্রাচীন লেখা যা কেউ পাঠ করতে পারতো না, তিনি তা সহজে খুব সুন্দরভাবে পাঠ করতেন।[১৩] ইয়ামনী আহলি কিতাব, যাদের সংখ্যা সে সময় দক্ষিণ আরবে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাদের সাথে ওয়াহাব ইবন মুনাব্‌বিহর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ছিল এবং সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি ইহূদী ও খ্রীস্টানদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করেন।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি বিরানব্বই (৯২) খানা আসমানী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তার মধ্যে এমন কয়েকখানি ছিল যে সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান খুবই অপ্রতুল। দাঊদ ইবন কায়স বলেন : তিনি বলতেন, আমি বিরানব্বই খানা গ্রন্থ পাঠ করেছি যার সবগুলোই আসমানী। বাহাত্তর (৭২) খানা গির্জায় এবং মানুষের হাতে আছে। আর বিশ (২০) খানার জ্ঞান খুব কম সংখ্যক লোকেরই আছে। কোন কোন বর্ণনায় একথা এসেছে যে, তিনি এমন তিরিশখানা গ্রন্থ পাঠ করেন যা তিরিশ জন নবীর উপর নাযিল হয়েছিল।[১৪]

যাই হোক না কেন, একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তিনি অতীতের আসমানী গ্রন্থসমূহের একজন বড় 'আলিম ছিলেন এবং এ বিষয়ের বিখ্যাত দু'জন বিশেষজ্ঞ কা'ব আল-আহবার ও 'আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) সামষ্টিক জ্ঞান তাঁর একক সত্তার মধ্যে পুঞ্জিভূত করেন। নিজের জ্ঞানের জন্য তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ও ছিল। যেমন তিনি বলেন :[১৫]

يقولون عبد الله بن سلام أعلم أهل زمانه، وكعب أعلم أهل زمانه. أفرأيت من جمع علمهما؟ يعني نفسه.

"লোকেরা বলে থাকে 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, কা'ব তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। তুমি কি দেখেছো কে এই দু'জনের জ্ঞান জমা করেছে? মূলত সেই ব্যক্তি যে তিনি নিজে সে কথা বলতে চেয়েছেন।"

কেউ কেউ "কাদরিয়া" মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁর প্রতি দোষারোপ করেছেন এবং পরবর্তীতে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, সে কথাও বলেছেন। তাঁরা দাবী করেন,

---

১৩. জাওয়াদ 'আলী তারীখ আল-'আরাব কাবলাল ইসলাম-১/৮৪

১৪. আত-তাবাকাত-৫/৩৯২

১৫. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১/৪৮৯

এ বিষয়ে তিনি একখানা পুস্তক রচনা করেন; অতঃপর অনুতপ্ত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন :[১৬]

كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابا من كتب الأنبياء فى كلها : من جَعَل إلى نفسه شيئًا من المشيئة فقد كفر. فتركت قولى.

"আমি "কাদর" বা ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা বলতাম। অবশেষে নবীদের সত্তরের অধিক গ্রন্থ পাঠ করলাম। তার সবগুলোতে আছে, যে কেউ ইচ্ছার কোন কিছু নিজের দিকে আরোপ করবে, কাফির হয়ে যাবে। অতঃপর আমি আমার কথা ত্যাগ করি।"

বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং কঠোরতার মুখোমুখি হতে হয়।

ইতিহাস

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ (রহ) একজন বড় ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা। আরবী ভাষায় সংকলক ও গ্রন্থ রচনার সূচনা হয় মূলত উমাইয়্যা যুগে। এ ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ড. 'উমার ফাররূখ বলেন :[১৭]

ولقد عَرَفَ العصر الأموى تدوينا بمعنى التأليف منسوبا إلى وهب بن مُنَبِّه فى الأخبار، وإلى محمد بن عبد الرحمن العامرى (ت ١٢٠هـ) الفقه، وإلى محمد بن مسلم الزهرى (ت ١٢٤هـ) فى الحديث، ولكن لم يصل إلينا شيئ من تدوين ذلك العصر.

"উমাইয়্যা যুগ যে লিপিবদ্ধকরণ তথা গ্রন্থ রচনার সাথে পরিচিত হয়, ইতিহাস বিষয়ে তা ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহর প্রতি আরোপ করা হয়। আর ফিক্হ ও হাদীছে তা আরোপ করা হয় যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রহমান আল-'আমিরী (মৃ. ১২০ হি.) ও মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম আয-যুহ্রীর (মৃ. ১২৪ হি.) প্রতি। তবে সে যুগের লেখা কোন কিছু আমাদের নিকট পৌঁছেনি।"

ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান বলেন :[১৮]

ثم اشتغلوا فى تدوين التاريخ خصوصا المغازى، وأقدم ماوصل إلينا خبره من كتبهم فى هذا الموضوع كتاب ألفه وهب بن مبنه صاحب الأخبار والقصص... فألف كتابا فى الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وأشعارهم وقصصهم. قال ابن خلكان انه شاهده بنفسه واثنى عليه.

---

১৬. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯১

১৭. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৩৭৯

১৮. জুরজী যায়দান, তারীখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী-২/৫৮; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত আ'য়ান-২/১৮০

"অতঃপর তাঁরা ইতিহাস, বিশেষতঃ মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস) রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে সর্বপ্রাচীন যে গ্রন্থটির কথা আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা হলো ইতিহাস ও কাহিনী বিশেষজ্ঞ ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ রচিত গ্রন্থটি।... তিনি ইয়ামনের হিময়ার রাজ বংশের মুকুটধারী রাজন্যবর্গ, তাঁদের ইতিহাস, কবিতা ও উপাখ্যান বিষয়ে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইবন খাল্লিকান বলেন, তিনি সে গ্রন্থটি দেখেছেন এবং সেটির প্রশংসাও করেছেন।"

বিখ্যাত "কাশ্ফুজ জুনূন" গ্রন্থের রচয়িতা হাজী খলীফা বলেন, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ মাগাযী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ-বিগ্রহের তথ্য সংগ্রহ করেন। তবে সীরাতের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে সীরাতুন নাবীর বর্ণনাকারীদের সাথে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি।[১৯]

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ বর্ণিত হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খুব অল্প তথ্যই আমাদের নিকট পৌঁছেছে। Schott Reinhardt কৃত সংকলনে Papyrus-এর উপর লেখা ছোট্ট একটি টুকরো C. H-Becker লাভ করেন। তাতে বায়'আতে 'আকাবার উল্লেখ আছে। লেখাটি জার্মানীর Heidelberg-এ সংরক্ষিত আছে।[২০]

ইবন ইসহাক ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ থেকে ফায়ামিউন ও সালিহ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নাজরানে খৃস্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটির উপসংহারে ইবন ইসহাক বলেছেন :

فهذا حديث وهب بن منبه عن أهـل نجـران. – 'এই হলো নাজরানবাসীদের সম্পর্কে ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহের বক্তব্য।'[২১]

বিভিন্ন মূল সূত্রসমূহে ওয়াহাবকে "ছিকা" বা বিশ্বস্ত বলা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনাকারীগণ অতি অল্প ক্ষেত্রেই তাঁর বর্ণনা গ্রহণের জন্য আগ্রহী হয়েছেন। পক্ষান্তরে মদীনার অন্য বর্ণনাকারীদের নিকট থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যা ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ তাঁর ভাই হাম্মাম থেকে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, এই হাম্মাম একজন দীর্ঘজীবি মানুষ ছিলেন এবং প্রায় ১৩০ বছর জীবন লাভ করেন।[২২]

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ (রহ) একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের উল্লেখিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের কারণে তিনি আরো বিচক্ষণ ও 'ইবাদতকারী হয়ে যান। তিনি সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটাতেন। একাধারে বিশ বছর 'ঈশার নামাযের ওজুতে ফজরের নামায আদায় করেন। এত কোমল প্রকৃতির ছিলেন যে, জীবনে কাউকে কখনো কটু কথা বলেননি বা গালি দেননি।[২৩]

---

১৯. আল-মাগাযী আল-উলা ওয়া মুয়াল্লিফূহা-৩০-৩৪

২০. মুকাদ্দিমা, আল-মাগাযী আল-উলা-২২

২১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩১-৩৪

২২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০১; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৫০২

২৩. প্রাগুক্ত

আধ্যাত্মিকতায় তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। তাঁর থেকে সংঘটিত কিছু অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আবূ কাছীর ইবন 'উবায়েদ একবার তাঁর সাথে 'সা'দা' নামক স্থানে একজনের বাড়িতে যান এবং রাত্রি যাপন করেন। রাতে বাড়ির সকল বাতি নিভিয়ে দেওয়ার পর সকলে শয্যা গ্রহণ করে। গভীর রাতে গৃহকর্তার মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে ওয়াহাবের ঘরে আলো। সে তার পিতাকে বিষয়টি অবহিত করে। পিতা জানালার ছিদ্রপথে উঁকি দিয়ে দেখে তাঁর পা দু'টি এত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে যেন সূর্যের আলোর শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়ছে। সকালে গৃহকর্তা ওয়াহাবকে বললেন : গত রাতে আমি আপনাকে এমন এক অবস্থায় দেখেছি যা আর কাউকে কখনো সে অবস্থায় দেখিনি। তিনি জানতে চাইলেন, কী অবস্থায় দেখেছেন? তিনি বললেন : আমি আপনাকে সূর্যের আলো থেকেও উজ্জ্বল আলোর মধ্যে দেখেছি। তাঁর কথা শুনে ওয়াহাব বললেন : যা দেখেছেন গোপন রাখুন।[২৪]

'আবদুস সামাদ ইবন মা'কিল বলেন, একবার ওয়াহাবকে বলা হলো, ওহে আবূ 'আবদিল্লাহ : আপনি স্বপ্ন দেখে আমাদের নিকট বর্ণনা করেন এবং তা সবই সত্যে পরিণত হয়। তিনি বললেন : এখন আর সে অবস্থায় নেই। যেদিন আমি কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছি সেদিন থেকে সেই অবস্থাটি চলে গেছে।[২৫]

যাই হোক না কেন, একথা সত্য যে, কা'ব আল-আহবারের মত ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বহু ভিত্তিহীন ইহূদী উপাখ্যান ছড়িয়ে পড়েছে।

সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তাঁর বহু জ্ঞানগর্ভ কথা পাওয়া যায়। নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হলো :

একবার তিনি 'আতা' আল-খুরাসানীকে বলেন :[২৬]

كانَ العلماءُ قبلنا قد استَغْنَوْا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكـانوا لايلتفتـون إلى دنيـاهم، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم فى علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا عِلْمَهُمْ رغبةً فى دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهـدوا فـى علمـهم لـمارأوْا مـن سوء موضعه عندهم.

"আমাদের পূর্ববর্তীকালের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নিজেদের জ্ঞান নিয়ে অন্যদের দুনিয়া থেকে মুখাপেক্ষীহীন থাকতেন। তাঁরা অন্যদের দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না। আর দুনিয়াদার লোকেরা জ্ঞানীদের জ্ঞানচর্চার পিছনে তাদের দুনিয়া ব্যয় করতো। আমাদের আজকের দিনের জ্ঞানীরা যখন দুনিয়াদার লোকদের দুনিয়া পাওয়ার লোভে তাদের জ্ঞান ব্যয় করেন তখন দুনিয়াদার লোকেরা জ্ঞানীদের এই নিকৃষ্ট অবস্থান প্রত্যক্ষ করে তাদের

---

২৪. তাহযীব আল-কামাল-১৯/৪৯০

২৫. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯১

২৬. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯২

দুনিয়া জ্ঞানীদের জ্ঞানচর্চার পিছনে ব্যয় করা ছেড়ে দিয়েছে।" তিনি একবার মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণে তিনি বলেন :[২৭]

احفظوا عنى ثلاثا : إيَّاكم وهوى متَّبَعًا، وقرين سوء وعجائب المرء بنفسه.

"আমার এই তিনটি কথা মনে রাখবে : অনুসৃত প্রবৃত্তি, খারাপ বন্ধু ও আত্ম-তুষ্টি– এই তিনটি জিনিস থেকে তোমরা দূরে থাকবে।"

আবদুস সামাদ বলেন, আমি ওয়াহাব ইবন মুনাব্‌বিহ্‌কে বলতে শুনেছি :[২৮]

دعِ المِراءَ وَالجِدال من أمرك، فإن لن يعجز أحد رُجلين : رجلٌ هو أعلمُ منك. فكيف تُعادى وتُجادل من هو أعلم منك؟ ورجلٌ أنت أعلم منه فكيف تعادى من أنتَ أعلمُ منه ولايُطيعُك؟ قلع عن ذلك.

"তোমার কোন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার কর। কারণ দুই ব্যক্তিকে কখনো পরাভূত করা যায় না। এক ব্যক্তি যে তোমার চেয়ে বেশি জানে। যে তোমার চেয়ে বেশি জানে তার সাথে তুমি কিভাবে ঝগড়া ও শত্রুতা করবে? আরেক ব্যক্তি যার থেকে তুমি বেশি জান। সুতরাং তুমি যার থেকে বেশি জান, অথচ সে তোমাকে মানে না, তার সাথে তুমি ঝগড়া ও শত্রুতা করবে কিভাবে? সুতরাং তা থেকে বিরত থাক।"

আবূ সাল্লাম ওয়াহাব ইবন মুনাব্‌বিহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[২৯]

اَلعِلْمُ خَلِيْلُ الْمُؤْمِـنِ، وَالْحِلْمُ وَزِيْرُهُ. وَالْعَقْلُ دَلِيْلُهُ، وَالْعَقْلُ قَيِّمُهُ، وَالصَّبْرُ أَمِيْرُ جُنُوْدِه، وَالرِّفْقُ أَبُوْهُ، وَاللِّيْنُ أَخُوْهُ.

"জ্ঞান মু'মিন ব্যক্তির বন্ধু, বিচক্ষণতা তার মন্ত্রী, বুদ্ধিমত্তা তার নির্দেশিকা, কর্ম তার তত্ত্বাবধায়ক, ধৈর্য তার বাহিনীর পরিচালক, দয়া-সহানুভূতি তার পিতা এবং কোমল আচরণ তার ভাই।"

তিনি সব সময় বলতেন :

المؤمن ينظر ليَعْلَمَ ويسكت، ويتكلم ليفهم، ويخلو ليغنم.

"মু'মনি ব্যক্তি দেখে শেখার জন্য এবং চুপ থাকে, কথা বলে বুঝার জন্য এবং নির্জনতা অবলম্বন করে সাফল্য লাভের জন্য।"

তিনি আরো বলেন :

الإيمان عُرْيان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، ومالُهُ الفِقْهُ.

---

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত

"ঈমান হলো একেবারে খোলামেলা পবিত্র বিষয়, তার পোশাক হলো আল্লাহভীতি, তার সাজ-শোভা হলো লজ্জা-শরম এবং তার সম্পদ হলো বিজ্ঞতা।"

একবার তিনি তাঁর এক সঙ্গীকে বললেন :[৩০]

ألا أعلّمك علمًا لايتعايا الفقهاءُ فيه؟ قال : بلى. قال : إن سُئِلْتَ عن شيءٍ عندك فيه عِلْمٌ فأخبر بعلمك، وإلا فقل : لا ادرى.

"আমি কি তোমাকে এমন একটি জ্ঞান শিক্ষা দেব যে ব্যাপারে ফকীহগণ অক্ষম হননি? সে বললো : হা, দিন। বললেন : যদি কেউ তোমাকে এমন কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করে যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞানে আছে, তাহলে তুমি তোমার জ্ঞান অনুযায়ী তাকে অবহিত করবে, অন্যথায় বলবে : আমি জানিনে।"

'আমর ইবন 'আমির আল-বাজালী বলেন, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ বলতেন :

ثلاثٌ كُنَّ فيه أصاب البرَّ : سخاوة النفس، والصبر على الأذى، وطيبُ الكلام.

"তিনটি জিনিস যার মধ্যে থাকবে সে সৎ গুণের অধিকারী হবে : অন্তরের উদারতা, কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ এবং মিষ্টি কথা বলা।"

'আব্বাস ইবন ইয়াযীদ বলেন, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ বলতেন :

استكثر من الإخوان ما استطعت، فإنك إن استغنيتَ عنهم لم يَضُرُّوكَ وَإنْ اِحْتَجْتَ إليهم نعفوك.

"যথা সম্ভব বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। তুমি যদি তাদের মুখাপেক্ষী না হও তাতে তারা তোমার কোন ক্ষতি করবে না, আর মুখাপেক্ষী হলে তারা তোমার উপকার করবে।"

তিনি বলতেন :

إذا اسمعت الرجل يمدحُك بما ليسَ فيك، فلا تَأْمَنْهُ أن يذُمُّكَ بما ليس فيك.

"যখন কোন ব্যক্তিকে তোমার মধ্যে নেই এমনগুণের কথা বলে তোমার প্রশংসা করতে শুনবে তখন তোমার মধ্যে নেই এমন দোষের কথা বলে তোমাকে নিন্দা না করার ব্যাপারেও তাকে আস্থাভাজন মনে করবে না।"

'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক বলেন, একবার এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললো, মানুষ এখন যেসব কাজ করছে, তাতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তাদের সাথে আর মেলামেশা করবো না। তিনি বললেন না, এমন করবে না। মানুষ তোমার কাছে আসবে, তুমিও তাদের কাছে যাবে, তাদের তোমার কাছে প্রয়োজন আছে, তোমারও তাদের কাছে প্রয়োজন আছে। তবে তুমি তাদের মধ্যে থাকবে বধির শ্রোতা, অন্ধ চক্ষুষ্মান এবং নিরব বক্তা হিসেবে।

---

৩০. প্রাগুক্ত

জা'ফার ইবন বুরকান বর্ণনা করেন, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্ বলতেন : সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যার নিজের দোষ তার ভাইয়ের দোষ চর্চা থেকে বিরত রেখেছে। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে অক্ষম হওয়ার পূর্বে আল্লাহর কাছে নত হয়েছে। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে কোন রকম পাপ-পঙ্কিলতা ছাড়া অর্জিত অর্থ-সম্পদ থেকে সাদাকা করে। সুসংবাদ ক্ষতিগ্রস্ত ও অক্ষমদের জন্য। সুসংবাদ তার জন্য যে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোকদের সাথে বসে। সুসংবাদ তার জন্য সুন্নাহ্ যাকে ধারণ করেছে, সুতরাং সে তার সীমা অতিক্রম করে না।"

আল-হায়ছাম ইবন 'আদী বলেন, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্ বলতেন : "নির্বোধ ব্যক্তি যখন কথা বলে তখন তার নির্বুদ্ধিতা তাকে লজ্জিত করে, যখন চুপ থাকে তখন তার এই অক্ষমতাই তাকে লজ্জিত করে। কাজ করলে বিকৃত করে, পরিত্যাগ করলে বিনষ্ট করে। তার নিজের জ্ঞান যেমন তাকে সাহায্য করে না, তেমনি অন্যের জ্ঞানও তার কোন উপকারে আসে না। মা মনে করে তার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে, স্ত্রী মনে করে স্বামীহারা হয়েছে। তার প্রতিবেশী তার থেকে একাকীত্ব কামনা করে, তার বন্ধুরা তার থেকে নির্জনতা অবলম্বন করে।" এরপর তিনি কবি মিসকীন আদ-দারিমীর নিম্নের শ্লোকগুলো আবৃত্তি করতেন।[৩১]

اتَّقِ الأحمقَ أن تصحبه + إنما الأحمقُ كالثوب الخَلِق

كلَّمَا رَقَّعتَ منه جانبًا + حركته الريحُ وهنًا فانخرق

أو كَصَدْعٍ في زجاج فاحش + هل ترى صدْ ع زجاج يتفق

وإذا جالستَه في مجلس + أفسدَ المجلس منه بالخُرق

وإذا نَهنْهتَه كي يرعوى + زاد جهلاً وتَمَادى في الحُمق.

"বোকা লোকের সাহচর্য থেকে দূরে থাক। বোকা লোক জীর্ণ পোশাকের মত। তুমি তার কোন একদিকে তালি লাগালে, বাতাসের দোলায় তার দুর্বল অংশ আবার ফেটে যাবে। অথবা সে কাঁচে ভাঙ্গনের মত। তুমি কি কাঁচের ভাঙ্গন জোড়া লাগতে দেখেছো? তুমি তার সাথে কোন সমাবেশে বসলে, সে তার বোকামী দ্বারা সমাবেশ নষ্ট করে দেবে। সতর্ক করার জন্য যদি তুমি তাকে নিষেধ কর তাহলে তার মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে এবং নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্তে পৌঁছাবে।"

তিনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চরিত্রের দশটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যেমন : বিচক্ষণতা, জ্ঞান, সঠিক পথপ্রাপ্ত হওয়া, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হওয়া, সকল পঙ্কিলতা থেকে নিজকে সংরক্ষণ করা, লজ্জা-শরম, গাম্ভীর্য, সর্বদা কল্যাণের উপর থাকা, মন্দ ও অকল্যাণ প্রত্যাখ্যান করা এবং যারা অকল্যাণের উপর থাকে তাদেরকে ঘৃণা করা, উপদেশ দানকারীর উপদেশ গ্রহণ ও তার আনুগত্য করা।" তারপর তিনি প্রত্যেকটি

---

৩১. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯৩-৪৯৪

বৈশিষ্ট্য থেকে বের হওয়া দশটি করে শাখা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩২]

তিনি ছিলেন একজন সুরসিক ও উদার মনের মানুষ। সহজে রাগতেন না। ইবন 'আয়্যাশ বলেন, একবার আমি ওয়াহাব ইবন মুনাব্‌বিহর সাথে বসে আছি। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে ওয়াহাবকে বললো– আমি অমুক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনলাম, সে আপনাকে গালি দিচ্ছে। তার কথা শুনে ওয়াহাব রাগের সাথে বললেন :

أما وجد الشيطان رسولاً غيرك؟

"শয়তান কি তোমাকে ছাড়া আর কোন রাসূল (দূত) পায়নি?'

আমি সেখানে বসে থাকতেই সেই গালি দানকারী লোকটি আসে এবং সালাম দেয়। ওয়াহাব সালামের জবাব দিয়ে তার সাথে হাত মিলান এবং হাসিমুখে তার হাত ধরে নিজের পাশে বসান। বর্ণিত হয়েছে, চল্লিশ বছরের মধ্যে তিনি প্রাণ আছে এমন কোন কিছুকে গালি দেননি।[৩৩]

তিনি সাধারণত রাগতেন না, তবে অন্যায় কোন কিছু দেখলে রেগে যেতেন। সিমাক ইবন আল-ফাদল বলেন, একবার আমরা 'উরওয়া ইবন মুহাম্মাদের নিকট বসা ছিলাম। ওয়াহাব ছিলেন 'উরওয়ার পাশেই। এ সময় কিছু লোক এসে তাদের এলাকার শাসকের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ তুলে ধরলো। তার মধ্যে কিছু মন্দ কথাও ছিল। ওয়াহাব 'উরওয়ার হাতে থাকা লাঠিটি কেড়ে নিয়ে অভিযুক্ত শাসনকর্তার মাথায় সজোরে আঘাত করেন। তাতে তার মাথা কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। ওয়াহাবের এমন রাগ দেখে উরওয়া হাসতে হাসতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন। তারপর বলেন, আমরা রেগে যাই বলে আবূ 'আবদিল্লাহ ওয়াহাব দোষারোপ করেন, আর এখন তিনিই এভাবে রেগে গেলেন? বললেন : আমি না রেগে পারি কি করে? যিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার স্রষ্টা তিনিই তো রেগে যান। তিনি বলেন :

فَلَمَّا اسَفُوْنَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

"যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করলো, আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং ডুবিয়ে দিলাম তাদের সকলকে।[৩৪]

আল-জা'দ ইবন দিরহাম বলেন :[৩৫]

مَا كَلَّمْتُ عالما قط إلا غضب، وحل حَبْوَته غير وهب بن منبه.

"আমি যখনই কোন 'আলিমের সাথে কথা বলেছি তাকে রেগে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে দেখেছি। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু ওয়াহাব ইবন মুনাব্‌বিহ।"

---

৩২. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯৮-৫০১

৩৩. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯০, ৪৯৩

৩৪. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯১

৩৫. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯০

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহ)

মুহাম্মাদ-এর ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ, মতান্তরে আবূ বাকর এবং পিতার নাম ইসহাক। দাদা ইয়াসার ছিলেন 'আয়নুত তামার (عين التمر)-এর যুদ্ধবন্দীদের একজন। মুস'আব ইবন 'আবদিল্লাহ আয-যুবায়রী তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :[১]

يسار مولى عبد الله بن قيس، جد محمد بن إسحاق صاحب "المغازى" من سبى عين التمر، وهو أول سبى دخل المدينة من العراق.

"'আবদুল্লাহ ইবন কায়সের দাস ও 'আল-মাগাযী' রচয়িতা মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের দাদা ইয়াসার ছিলেন 'আয়নুত তামার-এর একজন যুদ্ধবন্দী। তিনি মদীনায় প্রবেশকারী ইরাকের প্রথম যুদ্ধবন্দী।" সম্ভবতঃ এ কারণে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি কায়স ইবন মাখরামা ইবন মুত্তালিব ইবন 'আবদু মান্নাফের দাস ছিলেন। ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তিনি ইবন ইসহাক নামে প্রসিদ্ধ। হিজরী ৮৫, খ্রীস্টাব্দ ৭০৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় বেড়ে ওঠেন। এ কারণে 'আল-মাদানী' বলা হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) মহান সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিকের দর্শন লাভে ধন্য হন। তিনি বলতেন :[২]

رأيت أنس بن مالك وعليه عمامة سوداء، والصبيان يشتدون ويقولون : هذا رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، لايموت حتى يلقى الدجال.

"আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) দেখেছি এমন অবস্থায় যে, তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি এবং শিশু-কিশোররা তাঁকে নিয়ে কোরাস করে গাইছে : ইনি নবীর (সা) একজন সাহাবী, দাজ্জালকে না দেখে মৃত্যুবরণ করবেন না।"

ইবন ইসহাক ছিলেন শ্রেষ্ঠ 'আলিম তাবি'ঈদের একজন। বিশেষতঃ তিনি মাগাযী ও সীরাত শাস্ত্রের একজন ইমাম ছিলেন। সীরাত অর্থ জীবনী এবং মাগাযী অর্থ যুদ্ধ-বিগ্রহ। তবে আল-মাগাযী ও আস-সীরাহ্ বলতে সাধারণত রাসূলে কারীমের (সা) জীবন চরিত ও তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস বুঝায়।

তিনি ছিলেন মদীনার অধিবাসী। ইমাম যুহরীর (রহ) অন্যতম ছাত্র এবং মদীনাবাসী আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তি। হাদীছ চর্চা ও বর্ণনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। পরবর্তীকালে 'আসিম ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বাকর ও যুহরীর (রহ) ন্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ 'আলিমগণের মজলিসে বসে জ্ঞানের পরিধি আরো বৃদ্ধি করেন। তিনি

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৬/৭৩

২. প্রাগুক্ত-১৬/৭০; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭২-১৭৩

তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহে এ তিনজনসহ অন্য মুহাদ্দিছদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বর্ণনা করেছেন। একমাত্র মদীনাবাসী প্রায় একশো রাবী (বর্ণনাকারী)-এর নাম উল্লেখ করেছেন যাঁদের নিকট থেকে তিনি তাঁর রচনাবলীর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন।

হিজরী ১১৫, খ্রীস্টাব্দ ৭৩৩ সনে ইবন ইসহাক ইসকান্দারিয়া যান এবং সেখানে ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব (মৃ. ১২৮/৭৪৫)-এর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। এই ইয়াযীদ মিসরে সর্বপ্রথম হাদীছ চর্চার সূচনা করেন। এরপর ইবন ইসহাক আবার মদীনায় ফিরে আসেন। হি. ১২৩, খ্রীস্টাব্দ ৭৪১ সনে তাঁর শিক্ষক ইমাম যুহরীর সাথে কোন এক সাক্ষাতের সময় তিনি প্রিয় ছাত্র ইবন ইসহাককে উপস্থিত 'আলিমদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৩২/৭৪৯ সনে মদীনায় সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়নার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারপর তিনি মদীনা ত্যাগ করে যথাক্রমে কূফা, আল-জাযীরা, রায় ও বাগদাদে যান।

বাগদাদেই তিনি আমরণ অবস্থান করেন। 'আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূরের খিলাফতকালে (১৩৬-১৫৮/৭৫৪-৭৭৫) আল-জাযীরার ওয়ালী ছিলেন (১৪২/৭৫৯) আল-'আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ আল-'আব্বাসী। ইবন ইসহাক জাযীরায় অবস্থানকালে তাঁর সাথেও যোগাযোগ করেন।

ইমাম মালিক (রহ)সহ আরো কিছু 'আলিম তাঁর কিছু দোষ-ত্রুটির কথা বলে কঠোর সমালোচনা করেছেন। তবে দু'একজন ছাড়া অন্য সকল ইমাম ও হাদীছ বিশারদ তাঁর মুখস্থ শক্তি ও ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে আস্থা ব্যক্ত করেছেন। আবূ যার'আ আবদুর রহমান ইবন 'আমর বলেন, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক এমন এক ব্যক্তি যাঁর থেকে হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে সুফইয়ান আছ-ছাওরী, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, হাম্মাদ ইবন যায়দ, হাম্মাদ ইবন সালামা, ইবনুল মুবারক, ইবরাহীম ইবন সা'দ (রহ) প্রমুখের মত 'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীবের মত উঁচু স্তরের 'আলিম তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাদীছ বিশারদগণ তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সত্যবাদী ও সৎ মানুষ হিসেবে পেয়েছেন।[৩]

'আলিমদের স্বীকারোক্তি

শু'বা তাঁকে "আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীছ" (হাদীছ শাস্ত্রে বিশ্বাসীদের আমীর) বলতেন।[৪] লোকেরা যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি মুহাম্মাদ ইবন ইসহাককে এমন অভিধায় ভূষিত করেন কী কারণে? জবাবে তিনি বলেন : তাঁর মুখস্থ শক্তির কারণে।[৫] ইয়াযীদ ইবন হারূন বলতেন, যদি আমার হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকতো তাহলে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাককে মুহাদ্দিছগণের আমীর বানাতাম :

لو كان لى سلطان لأمّرت ابن اسحاق على المحدثين.

---

৩. তারীখু বাগদাদ-১/২২৪

৪. তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৭৮, ৮১; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭৩

৫. তারীখু বাগদাদ-১/২২৪; তাবি'ঈন-৩৯৯

আবূ মু'আবিয়া তাঁকে أحفظ الناس (মানুষের মধ্যে সর্বাধিক হাদীছ মুখস্থকারী), ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন "ছিকা" (বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য) ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল "حسن الحديث" বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর বর্ণিত হাদীছ সাহীহ পর্যায়ের নয়, বরং তার পরবর্তী হাসান পর্যায়ের।[৬] আলী ইবন আল-মাদীনী বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের কেন্দ্র ছিলেন ছয় ব্যক্তি, পরে এই ছয়জনের জ্ঞান বারোতে স্থানান্তরিত হয়। তাঁদের একজন হলেন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক :

قال علي بن المديني مَدَار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة، فذكرهم، ثم قال : فصار علم الستَّةَ عند اثنى عشر، أحدهم محمد بن اسحاق.[৭]

ইমাম যুহরীর কর্ম-পদ্ধতি

ইমাম যুহরী (রহ) ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের উস্তাদ। ছাত্রের জ্ঞানের উপর তাঁর এত পরিমাণ আস্থা ছিল যে, তিনি বলতেন :[৮]

لا يزال بالمدينة علم جمٌّ ما كان فيهم ابن اسحاق.

"যতদিন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আছে ততদিন মদীনাবাসীদের মধ্যে জ্ঞান থাকবে।" তিনি যখন মদীনার বাইরে কোথাও যেতেন তখন মুহাম্মাদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। একবার তিনি মদীনার বাইরে কোথাও যাওয়ার ইরাদা করলেন। জ্ঞান পিপাসুদের অনেকে তাঁর সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি এই নও-জোয়ান ইবন ইসহাককে তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি। তাঁর এই স্থলাভিষিক্তি যুহরীর (রহ) শিষ্য-শাগরিদদের মধ্যে স্বীকৃত ছিল। এ কারণে যুহরীর মৃত্যুর পর তাঁর বর্ণনাসমূহের সত্যায়নের জন্য মানুষ ইবন ইসহাকের নিকট যেত।[৯] ইবন 'উয়াইনা বলেন, ইবন ইসহাকের প্রতি কেউ কোন দোষারোপ করেছে এমন কাউকে আমি দেখিনি।[১০]

ইমাম যুহরী (রহ) তাঁর বাড়ীর দারোয়ানকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, ইবন ইসহাক যখনই আসবে তাকে যেন ঢুকতে দেওয়া হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যুহরীর নিকট ইবন ইসহাকের স্থান কী ছিল। একবার ইবন ইসহাক নিয়মের চেয়ে একটু দেরীতে আসলেন। যুহরী (রহ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : কোথায় ছিলে? ইবন ইসহাক বললেন : দারোয়ানদের কারণে কেউ কি আপনার নিকট আসতে পারে? যুহরী সাথে সাথে দারোয়ানকে ডেকে বলেন দেন, ইবন ইসহাক যখনই আসুক তাকে ঢুকতে বাঁধা দেবে না।[১১]

---

৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭৩

৭. তারীখু বাগদাদ-১/২২৪; তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৭৪

৮. প্রাগুক্ত

৯. ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৪৮৪; তাবি'ঈন-৩৯৯

১০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭৩

১১. তারীখু বাগদাদ-১/২১৯; তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৭৪

ইমাম মালিক ও হিশামের সমালোচনা এবং তার কারণ

মনীষীদের এত প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ সত্ত্বেও ইবন ইসহাক ইমাম মালিক ও হিশামের কঠোর সমালোচনার মুখোমুখীও হয়েছেন। বিশেষতঃ তাঁর সম্পর্কে ইমাম মালিকের মতামত ছিল অত্যন্ত কঠোর। এমনকি তিনি তাঁর সম্পর্কে অনেক অশোভন শব্দও ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি একবার ইবন ইসহাক সম্পর্কে বলেন : انظروا إلى دجال من الدجاجلة 'তোমরা দাজ্জালদের মধ্য থেকে একজন দাজ্জালকে দেখ।' এ বাক্যে তিনি মুহাম্মাদ ইবন ইসহাককে দাজ্জাল বলেছেন। হিশামও তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না। তবে মুহাদ্দিছগণ নিজেরাই তাঁদের দু'জনের এমন কঠোর সমালোচনার কারণ বলে দিয়েছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ মোটামুটি এ রকম :

হাদীছ গ্রহণে ইমাম মালিক এত কঠোর এবং যাচাই-বাছাইয়ে তাঁর নীতিমালা এত উঁচুমানের ছিল যে, কারো মধ্যে সামান্য দোষ-ত্রুটি দেখলে তিনি তার সমালোচনায় অতি কঠোর শব্দ উচ্চারণে কোন রকম দ্বিধা করতেন না। খতীব আল-বাগদাদী লিখেছেন, কিছু 'আলিম এ রকম বলেছেন যে, সত্যনিষ্ঠ, দীনদার, মুত্তাকী, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ইমাম মালিকের এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগের জন্য সমকালীন বহু 'আলিম তাঁরও সমালোচনা করেছেন।[১২] ইবরাহীম ইবন আল-মুনযির বলেন : ইবন আবী যি'ব, 'আবদুল 'আযীয আল-মাজিশূন, ইবন আবী হাযিম ও মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক- এঁদের প্রত্যেকে মালিক ইবন আনাসের সমালোচনা করেছেন। তবে সবচেয়ে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক। তিনি বলতেন :[১৩]

ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه، أنا بيطار كتبه.

"তোমরা তাঁর কিছু বই আমার কাছে নিয়ে এসো, যাতে আমি তাঁর কিছু দোষ-ত্রুটির বর্ণনা দিতে পারি। আমি তাঁর পুস্তকসমূহের চিকিৎসক।" এই প্রেক্ষাপটে ইমাম মালিক যদি ইবন ইসহাক সম্পর্কে কিছু রূঢ় শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন তাতে তাঁর নির্ভরযোগ্যতায় বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারে না।

তৃতীয় কারণ এই যে, ইবন ইসহাক গাযওয়া বা রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা গ্রহণের ব্যাপারে তেমন বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতেন না। এ কারণে ইমাম মালিক তাঁর আল-মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) বিষয়ক বর্ণনার সমালোচনা করতেন। তবে আল-মাগাযী ছাড়া ইবন ইসহাক বর্ণিত অন্যসব হাদীছের সাথে এই সমালোচনার কোন সম্পর্ক ছিল না। ইবন হিব্বান বলেন, ইমাম মালিক একবার মাত্র ইবন ইসহাক সম্পর্কে রূঢ় শব্দ প্রয়োগ করেন। তারপর তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর সাথে আচরণ করতেন। ইমাম মালিক তাঁর হাদীছের কারণে নয়, বরং মাগাযীর কারণে তাঁর সমালোচনা করতেন। কারণ, ইবন ইসহাক খায়বারসহ আরো কিছু যুদ্ধের বিবরণ ইয়াহূদীদের নও-মুসলিম সন্তানদের নিকট

---

১২. তারীখু বাগদাদ-১/২২৩

১৩. ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৪৮৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৭৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১৭৩

থেকে শুনে গ্রহণ করতেন। আর তারা আবার সেই সব বিবরণ দিত তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষের সূত্রে। যদিও ইবন ইসহাক এসব বর্ণনা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতেন না। তবে ইমাম মালিক পরম বিশ্বাসভাজন ও আস্থাশীল ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কোন বর্ণনা গ্রহণ করা মোটেই সমীচীন মনে করতেন না।[১৪]

কিছু 'আলিম বলেছেন, ইমাম মালিকের সমালোচনা মাগাযীর জন্য নয়, বরং তাঁর 'আকীদার (বিশ্বাস) জন্য ছিল। 'আবদুর রহমান ইবন 'আমর আন-নাসরী বলেন, আমি দুহাইমের সামনে ইবন ইসহাক সম্পর্কে ইমাম মালিকের সমালোচনার প্রসঙ্গটি উঠালাম। তিনি বললেন, এটা হাদীছের কারণে ছিল না, বরং তা এজন্য ছিল যে, ইমাম মালিক ইবন ইসহাককে কাদরিয়াদের আকীদায় বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করতেন।[১৫] যাই হোক, উপরে উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা এতটুকু জানা গেছে যে, ইবন ইসহাকের অগ্রহণযোগ্যতা ও দুর্বলতা ইমাম মালিকের কঠোর সমালোচনার কারণ ছিল না। এর কারণ ছিল অন্য কিছু। এ কারণে এ সমালোচনার প্রভাব ইবন ইসহাক বর্ণিত হাদীছের উপর পড়তে পারে না। এজন্য ইমাম মালিক ছাড়া অন্য সকল ইমাম ও 'আলিম তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এমনকি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ), যিনি 'আকীদার ক্ষেত্রে কঠোরতার ব্যাপারে ইমাম মালিক থেকে কোন অংশে কম ছিলেন না, ইবন ইসহাকের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের (রহ) পুত্র আবদুল্লাহ একবার মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক সম্পর্কে এক ব্যক্তির একটি জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, আমার পিতা তাঁর বর্ণনাসমূহ যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করতেন এবং মুসনাদে স্থান দিতেন। তবে সুনানের ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতেন না।

ইমাম মালিকের (রহ) পরে ইবন ইসহাকের কঠোর সমালোচকদের মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি নাম হিশাম। তাঁর এমন অবস্থানের রহস্য হলো, ইবন ইসহাক হিশামের স্ত্রী ফাতিমা বিনত মুনযিরের সূত্রে কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলতেন, আমার স্ত্রী ফাতিমা একজন পর্দানশীন মহিলা, তার নয় বছর বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন বেগানা পুরুষ তাঁকে দেখেনি। তাহলে ইবন ইসহাক তার থেকে হাদীছ শোনেন কিভাবে? তবে অনেক মুহাদ্দিছের মতে শুধু একথার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের বর্ণনাসমূহকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করা সঠিক নয়। কারণ, তিনি তো পর্দার আড়াল থেকে শুনে থাকতে পারেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) হিশামের এ বক্তব্য বর্ণনার পর মন্তব্য করেছেন এ ভাষায় :[১৬]

وقوله وهى بنت تسع غلط بين لأنها أكبر من هشام بثلاث عشـرة سـنة وكـان أخـذ

---

১৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৪৫

১৫. তারীখু বাগদাদ-১/২২৪; তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৭৭

১৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩৯, ৪০

ابن إسحاق عنها وقد جاوزت الخمسين وقد روى عنها أيضا غير محمد بن إسحاق من الغرباء محمد بن سوقة.

"হিশাম যে তাঁর স্ত্রী নয় বছর বয়সের কথা বলেন, তা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, হিশামের চেয়ে তাঁর স্ত্রী তের বছরের বড়। ইবন ইসহাক যখন তাঁর নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করেন তখন হিশামের স্ত্রীর বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে। ইবন ইসহাক ছাড়াও মুহাম্মাদ ইবন সূকা'র মত বেগানা পুরুষরাও তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।"

ইবন হিব্বান তাঁর "الثقات" গ্রন্থে বলেন :[১৭]

تكلم فيه رجلان هشام ومالك، فأما قول هشام فليس مما يجرح به الانسان وذلك أن التابعين سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا إليها، وكذلك ابن إسحاق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل.

"মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক সম্পর্কে ইমাম মালিক ও হিশাম– দু'ব্যক্তিই কথা বলেছেন। তবে হিশামের কথায় কোন মানুষ অভিযুক্ত হতে পারে না। কারণ, অসংখ্য তাবি'ঈ উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) প্রতি দৃষ্টিপাত না করে পর্দার আড়াল থেকে তাঁর কথা শুনতেন। একইভাবে ইবন ইসহাকও ফাতিমার কথা শুনে থাকবেন।"

'আলী ইবন আল-মাদীনী বলেন :[১৮]

الذى قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها.

"হিশাম যা বলেছেন তা কোন দলীল হতে পারে না। সম্ভবতঃ তিনি (ইবন ইসহাক) তাঁর স্ত্রীর নিকট অপ্রাপ্ত বয়সে গিয়েছেন এবং তাঁর থেকে হাদীছ শুনেছেন।

ইবন ইসহাকের শায়খগণ

ইবন ইসহাক ছিলেন ইমাম যুহরীর (রহ) খাস শাগরিদ। তবে তিনি ছাড়া আরো অনেক শায়খের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। যেমন তাঁর শায়খদের মধ্যে তাঁর পিতা ইসহাক, চাচা মূসা, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আমর, মু'আইদ ইবন কা'ব ইবন মালিক, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আত-তায়মী, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর (রা), মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার ইবন যুবায়র, 'আসিম ইবন 'আমর ইবন কাতাদা, 'আব্বাস ইবন সাহ্ল ইবন সা'দ, ইবন মুনকাদির, মাকহূল, ইবরাহীম ইবন 'উকবা, হুমায়দ আত-তাবীল, সালিম আবী আন-নাদার, সা'ঈদ মুকরী, সা'ঈদ ইবন আবী হিন্দ, আবূ আয-যানাদ, 'আবদুর রহমান ইবন আসওয়াদ আন-নাখা'ঈ, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, 'ইকরিমা ইবন খালিদ, 'আলা' ইবন 'আবদির রহমান, 'আমর ইবন শু'আয়ব,

---

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৭৮

নফি', আবূ জা'ফার আল-বাকির, ফাতিমা বিন্‌ত আল-মুনযির (রহ) প্রমুখের মত বড় আলিমগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জামাল উদ্দীন আল-মিযযী তাঁর ১২২ (একশত বাইশ) জন শায়খের নাম উল্লেখ করেছেন।[১৯]

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের তালিকা অতি দীর্ঘ। এখানে কিছু বিশিষ্ট ছাত্র যাঁরা তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো :

জারীর ইবন হাযিম, 'আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন 'আওন, ইবরাহীম ইবন সা'দ, শু'বা ইবন আল-হাজ্জাজ, ইবন 'উয়ায়না, ইবন মু'আবিয়া, 'আবদুল্লাহ ইবন ইদরীস, আবূ 'আওয়ানা, 'আবদুল আ'লা আশ-শামী, 'আবদুহু ইবন সুলায়মান, জারীর ইবন 'আবদিল হামীদ, যিয়াদ আল-বাক্কা'ঈ, হাম্মাদ ইবন যায়দ, সালামা ইবন আল-ফাদল, মুহাম্মাদ ইবন সালামা আল-হাররানী, ইউনুস ইবন বুকাইর, ইয়াযীদ ইবন হারূন, আহমাদ ইবন খালিদ, ইয়া'লা ইবন উবায়দ, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-উমাবী, ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব আল-মিসরী, ইউনুস ইবন বুকাইর আশ-শায়বানী, ইয়া'লা ইবন 'উবায়দ আত-তানাফুসী, হারূন ইবন মূসা আন-নাহবী, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক (রহ) ও আরো অনেকে।[২০]

সীরাত ও মাগাযী

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের অধ্যয়নের আসল ক্ষেত্র ছিল মাগাযী ও সীরাত শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের তিনি একজন ইমাম ছিলেন। ইমাম যাহাবী বলেন :[২১]

كان أحد أوعية العلم حبرا فى معرفة المغازى والسير.

'তিনি মাগাযী ও সীরাত বিদ্যায় ছিলেন একজন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি।'

ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলতেন, কেউ যদি মাগাযী শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চায় তাকে ইবন ইসহাকের মুখাপেক্ষী হতে হবে।[২২] খতীব বাগদাদী লিখেছেন, তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি এই বিদ্যার দিকে দৃষ্টি দেন এবং এত সমৃদ্ধি ঘটান যে, তাঁর পরে আর কেউ তাতে কোন কিছু সংযোজন করতে পারেননি। তিনি আমীর-উমারা ও শাসক শ্রেণীর দৃষ্টি ফলাফল শূন্য ও অর্থহীন কিস্‌সা-কাহিনী থেকে প্রকৃত ইতিহাসের দিকে ফিরিয়ে দেন। এভাবে তিনি সর্বপ্রথম ইতিহাস চর্চার রুচি সৃষ্টি করেন। শাসকদের রুচির পরিবর্তন ঘটানো, অর্থহীন গ্রন্থ ও কিস্‌সা-কাহিনীর চর্চা থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) মাগাযী, সুন্নাহ এবং বিশ্বের উৎপত্তির ইতিহাসের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া

---

১৯. প্রাগুক্ত-১৬/৭২; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৭২; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যব-৯/৩৯

২০. প্রাগুক্ত

২১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৭৩

২২. তারীখু বাদগাদ-১/২১৫

ছাড়া আর কোন কিছুই যদি তিনি না করতেন তাহলে এই একটি মাত্র কাজ তাঁর পথিকৃৎ ও শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবজনক আসন লাভের জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁর পরে আরো অনেকে এই শাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু কেউ তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি।[২৩] যে ইমাম যুহরীর নিকট থেকে তিনি এ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন, তিনিও এ ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।[২৪]

ইতিহাস

যদিও মাগাযী ও সীরাত ইতিহাসেরই একটি শাখা, তবে ইবন ইসহাক সাধারণ ইতিহাসেরও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। খতীব বাগদাদী বলেন, তিনি সীরাত, মাগাযী, আরবের অতীত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঘটনাবলী, মানব জাতির উৎপত্তি এবং নবীদের কিস্‌সা-কাহিনীরও 'আলিম ছিলেন।[২৫]

আল-মাগাযী বিষয়ে লেখালেখির সূচনা হয় কখন?

এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, হিজরী প্রথম শতকে 'তাদবীনে হাদীছ' তথা হাদীছ লেখালেখির কাজ শুরু হয় এবং দ্বিতীয় শতকে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীও লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। এগুলোকে পৃথকভাবে 'আল-মাগাযী' নামে বিন্যস্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি দেখা দিতে পারে তা হলো, সীরাত ও মাগাযী লেখার সূচনা হলো কীভাবে? এ শাস্ত্রটি কি হাদীছ শাস্ত্রের সাথে অথবা পৃথকভাবে গড়ে ওঠে? এ ব্যাপারে প্রাচ্যবিদদের ধারণা হলো, হাদীছ শাস্ত্র ছিল একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় এবং সীরাত ও মাগাযী ছিল তারই একটি অংশ বিশেষ। তবে কিছু মুসলিম ঐতিহাসিকের রয়েছে ভিন্ন মত। তাঁরা বলেন ঃ সীরাত ও মাগাযীর উৎপত্তি হয় সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এবং হাদীছ শাস্ত্রের পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে তা উন্নতি লাভ করে। সম্ভবতঃ এ মতপার্থক্যের কারণ হলো, প্রাথমিক যুগে সীরাত ও মাগাযী লেখকরা হাদীছ শাস্ত্রেরও আলিম ছিলেন এবং তাঁদেরকেও 'মুহাদ্দিছ' বলা হতো। তাঁরা হাদীছ ও মাগাযী বিষয়ক তথ্য একই রকম গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে সংগ্রহ করতেন। সীরাত ও মাগাযী বিষয়ক তথ্য প্রথম থেকেই সংগ্রহ করার ঝোঁক সাহাবা ও তাবি'ঈদের মধ্যে ছিল। সুতরাং তাঁরা এ বিষয়ের তথ্য হাদীছ থেকে স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রহ করেন। একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে, সীরাত ও মাগাযীর রাবীগণের যদিও হাদীছে পারদর্শিতা ছিল, তবে তাঁদের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা খুবই কম। মুহাদ্দিছ হিসেবেও তাঁরা তেমন খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি।[২৬]

---

২৩. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৯/৪৪

২৪. তারীখু বাগদাদ-১/২১৯; তাবি'ঈন-৪০৩

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. ড. মাহমুদুল হাসান, আরবূঁ মে তারীখ নিগারী কি নাশ্ ও নামা (ইসলাম আওর আসরে জাদীদ, খণ্ড-১. ১৯৬৭)

তাঁর রচনাবলী

তিনি ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইবন নাদীম বলেন ঃ[২৭]

وله من الكتب، كتاب الخلفاء رواه عنه الأموى، كتاب السيرة والـمبتداء والـمغازى.

'তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ আছে। 'কিতাবুল খুলাফা' গ্রন্থটি তাঁর থেকে 'উমাবী বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আছে 'কিতাবুস সীরাহ্ ওয়াল মুবতাদা ওয়াল মাগাযী।'

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রাচীনতম রচনাটি হলো সীরাত গ্রন্থটি। বহুকাল যাবত গ্রন্থটি দুস্প্রাপ্য। তবে এ গ্রন্থের সকল বর্ণনা এখনো বিদ্যমান আছে। ইবন হিশামের সীরাতের সবচেয়ে বড় উৎস এই সীরাত। এ কারণে তাঁর সকল বর্ণনা এতে সংরক্ষিত হয়েছে। ইবন হিশামের বর্তমান সীরাত গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে ইবন ইসহাকের সীরাতের সংক্ষিপ্ত রূপ।

ইবন ইসহাক তাঁর এই গ্রন্থটি আব্বাসীয় খলীফা আল-মাহদীর ছেলের জন্য লেখেন। একবার তিনি খলীফা আল-মাহদীর দরবারে যান। তখন সেখানে খলীফার এক ছেলেও উপস্থিত ছিল। খলীফা নিজের ছেলের প্রতি ইঙ্গিত করে ইবন ইসহাককে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি একে চেনেন? তিনি বলেন : আমীরুল মু'মিনীনের ছেলে। খলীফা অনুরোধ করেন, তিনি যেন তাঁর এ ছেলের জন্য এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করেন যাতে আদমের সৃষ্টি থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত পৃথিবীর সকল ঘটনার বিবরণ থাকে। এই নির্দেশ অনুযায়ী তিনি এক বৃহদাকৃতির গ্রন্থ রচনা করে খলীফার সামনে উপস্থাপন করেন। গ্রন্থটির কলেবর দেখে তিনি বলেন, এ তো অনেক বড় গ্রন্থ। এটাকে একটু সংক্ষিপ্ত করুন। তিনি সেটা সংক্ষেপ করেন। প্রথম গ্রন্থটি খলীফা আল-মাহদীর গ্রন্থাগারে রাখা হয়।[২৮] তবে ইবন সা'দ বলেন, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক হীরায় আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূরের নিকট আসেন এবং তাঁর জন্যই তিনি "আল-মাগাযী" রচনা করেন।[২৯]

তাঁর সীরাত ও মাগাযী

খলীফা আল-মানসূর ১৪৬/৭৬৩ সনে নতুন রাজধানী বাগদাদে যাওয়ার পূর্বে হীরায় অবস্থানকালে ইবন ইসহাক তাঁর আল-মাগাযী গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত করে তাঁর নিকট পাঠান। এ বর্ণনা দ্বারা কোনভাবেই বুঝা যায় না যে, তিনি কোন খলীফার নির্দেশে তাঁর আল-মাগাযী রচনা করেন। তাছাড়া তাঁর রাবী (বর্ণনাকারী)-দের তালিকা দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মদীনা ও মিসরে অবস্থানকালে যে সকল হাদীছ সংগ্রহ করেন তারই ভিত্তিতে আল-মাগাযী সংকলন করেন। তিনি কোন ইরাকী রাবীর নাম উল্লেখ

---

২৭. ইবন নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত-১৩৬

২৮. তারীখু বাগদাদ-১/২২১

২৯. তাবাকাত-৭/২৭; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৬/৮১

করেননি। এতেও স্পষ্ট হয় যে, তিনি শেষ বারের মত মদীনা ত্যাগের পূর্বে গ্রন্থখানির রচনা সমাপ্ত করেন।[৩০]

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ইবন ইসহাকের আল-মাগাযী গ্রন্থখানা অথবা সঠিক অর্থে তাঁর অংশ বিশেষ 'আরবী খিযানা' তথা গ্রন্থ ভাণ্ডার থেকে হারিয়ে যাওয়া এবং ৫০৬/১১১২ সনে লিখিতভাবে তাঁর অংশ বিশেষ ফাসের 'কারাবী' খিযানায় প্রাপ্তি, গ্রন্থখানা সম্পর্কে আমাদের সার্বিক অবগতির ক্ষেত্রে একটি শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। তবে ইবন হিশাম (মৃ. ২১৮/৮২৮) 'সীরাতুন্নাবী (সা)' নামে ইবন ইসহাকের গ্রন্থখানা সংক্ষেপে করে একটি মহৎ কাজ সম্পাদন করেন।

তিনি ইবন ইসহাকের অন্যতম প্রসিদ্ধ ছাত্র 'বাক্কাঈ' (মৃ. ১৮৩/৭৯৯)-এর বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাবারীসহ ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা অংশসমূহ জোড়া দিয়ে মূল গ্রন্থটির পদ্ধতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিত্র অংকনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

ইবন ইসহাকের মূল গ্রন্থে ইবন হিশাম যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তা তিনি 'সীরাতুন্নাবী'র ভূমিকায় স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। যেমন আদম (আ) থেকে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত আহলি কিতাবদের ইতিহাস তিনি পরিত্যাগ করেছেন। আমাদের মহানবীর (সা) প্রত্যক্ষ উর্ধ্বতন পুরুষগণ ছাড়া ইসমা'ঈলের (আ) বংশধরদের আলোচনা বাদ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি ইবন ইসহাক বর্ণিত এমন সব কাহিনী বাদ দিয়েছেন যাতে নবী কারীম (সা) সম্পর্কে কোন কথা নেই, সে কাহিনীর আল-কুরআনে কোন ইঙ্গিত নেই এবং গ্রন্থে বর্ণিত অন্য কোন ঘটনার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তকরণই এ বাদ দেওয়ার প্রধান কারণ। অন্যান্য কারণেও আরো কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন। যেমন কিছু প্রাচীন আরবী কবিতা যা পণ্ডিতদের নিকট অপরিচিত, কিছু তথ্য যা ব্যক্তি বিশেষের জন্য পীড়াদায়ক অথবা তাদের প্রতি পাঠকের মধ্যে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া কিছু তথ্য ইবন ইসহাকের গ্রন্থে ছিল কিন্তু বাক্কাঈ তা ভুলে গেছেন, ফলে ইবন হিশাম তা পাননি।

ইবন হিশাম বহু কিছু সংশোধন এবং আরব বংশ পরিচয় ও ভাষার ক্ষেত্রে অনেক কিছু সংযোজনও করেছেন। সে সবের প্রতি যথাস্থানে ইঙ্গিতও করেছেন। তবে তিনি মূল পাঠে কোন রকম পরিবর্তন করেননি। যেখানে তিনি কোন কিছু পরিবর্তন ও সংক্ষিপ্ত করেছেন বা বাদ দিয়েছেন সেখানে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তবে ইবন হিশামের সংক্ষিপ্তকরণের ফলে জ্ঞানের জগতে যে ক্ষতি হয়েছে তা আমরা পুষিয়ে নিতে পারি প্রাচীন আরবী গ্রন্থরাজির বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ইবন ইসহাকের গ্রন্থখানির অংশ বিশেষ একত্র করে পাঠের মাধ্যমে। ইমাম আত-তাবারী তাঁর বিখ্যাত তারীখ ও তাফসীর

---

৩০. আল-মাগাযী আল-উলা ওয়া মুয়াল্লিফূহা-৭৫-৮১

গ্রন্থদ্বয়ে ইবন ইসহাকের সীরাত গ্রন্থের 'আল-মুবতাদা' (সূচনাপর্ব) অধ্যায়ের পরিচ্ছেদগুলোর বহু অংশ বিশ্ববাসীর জন্য সংরক্ষণ করেছেন। অন্যদিকে আল-আযরুকী তাঁর 'আখবারু মাক্কাহ' গ্রন্থে ইবন হিশাম কর্তৃক বাদ দেওয়া অনেক খবরই ধরে রেখেছেন। ইবন হিশামের ভূমিকার মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আল-মাগাযী অধ্যায় থেকে যা বাদ পড়েছে তা অতি সামান্য, পক্ষান্তরে 'আল-মুবতাদা' অধ্যায় থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ বাদ পড়েছে। তবে এ ক্ষতি পূরণ করার ক্ষেত্রে আত-তাবারীর অবদান অন্য সকলকে অতিক্রম করে গেছে।

যদি আমরা বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত বিক্ষিপ্ত অংশসমূহের প্রতি যত্নবান হই, তাহলে ইবন ইসহাকের গ্রন্থটির নিম্নের চিত্র দেখতে পাই। ইবন ইসহাক তাঁর 'আল-মাগাযী' প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন এবং তা তিনটি বিষয় বস্তুতে বিন্যাস করেছেন। যেমন :

১. আল-মুবতাদা

২. আল-মাব'আছ

৩. আল-মাগাযী

১. আল-মুবতাদা

এ অধ্যায়ে ইবন ইসহাক জাহিলী যুগের আরবের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। তিনি এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু চারটি পরিচ্ছেদে সাজিয়েছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রাক-ইসলামী যুগের ওহী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইয়ামনের ইতিহাস, তৃতীয় পরিচ্ছেদে আরবগোত্রসমূহ ও তাদের মূর্তি পূজা এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমাদের মহানবী (সা)-এর প্রত্যক্ষ পূর্ব পুরুষ ও মক্কার ধর্মসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ের সনদের উপর নির্ভরতা খুবই কম।

২. আল-মাব'আছ

এ অধ্যায়ে ইবন ইসহাক দু'টি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে নবী কারীমের (সা) মাক্কী জীবন এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হিজরাত ও মদীনায় প্রথম বছরের কর্মতৎপরতার বিবরণ এসেছে। মাব'আছ অধ্যায়ে যে বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয় তা হলো পূর্ববর্তী অধ্যায়ের তুলনায় সনদের আধিক্য এবং বিশেষভাবে ইবন ইসহাকের মাদানী শিক্ষকদের বর্ণনার উপর নির্ভরতা, যা তিনি সন ভিত্তিক বিন্যাস করেছেন।

এ অংশে সনদ ছাড়া অথবা সনদ সহকারে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনার পাশাপাশি মদীনার বিভিন্ন গোত্রের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বিখ্যাত চুক্তিগুলো, যা মদীনার সামাজিক বিধি-বিধান নামে আখ্যায়িত, সে সম্পর্কে ইবন ইসহাক সংগৃহীত দলিল-প্রমাণাদি পাওয়া যায়। এতে আরো পাওয়া যায় একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা, যার কিছু অংশে রয়েছে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের নাম, কিছু অংশে হাবশার মুহাজিরদের ও প্রথম যুগের আনসারদের নাম ইত্যাদি। এভাবে দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হয়েছে।

৩. আল-মাগাযী

ইবন ইসহাক তাঁর আল-মাগাযীতে মদীনায় মুশরিক গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে নবী কারীমের (সা) প্রথম যুদ্ধের আহ্বান থেকে তাঁর ওফাত পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এ অংশে তিনি মহানবীর (সা) অন্তিম রোগ ও ওফাতের বিবরণ ছাড়া আর কিছু বিস্তারিত বর্ণনা করেননি। তবে এ অংশে সব কিছুই সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। আলোচ্য বিষয়ের সারকথা ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। আল-মাগাযীতে নামের তালিকার সংখ্যাও অনেক। যেমন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, নিহত, আহত ও বন্দী ব্যক্তিবর্গের তালিকা। অনুরূপ তালিকা দিয়েছেন উহুদ, খন্দক, খায়বার, মূতাসহ বিভিন্ন যুদ্ধেরও। হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদেরও ভিন্ন একটি তালিকা তিনি দিয়েছেন।

একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইবন ইসহাক তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় অংশের নামে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির নামকরণ করেন– আল-মাগাযী। এরপর নামটির এত প্রসিদ্ধি ঘটে যে, পরবর্তীকালে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাত লেখক তাঁদের রচিত রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনীকে এ নামে নামকরণ করেছেন।

ইবন ইসহাকের আল-মাগাযী যে এক বিরাট কর্মকাণ্ড সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বিভিন্ন বর্ণনা ও খবর সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি তাঁর সবটুকু শ্রম ব্যয় করেছেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সকল রাবী ও সূত্রের উল্লেখসহ সকল খবর লিপিবদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থে ইবন ইসহাকের সংকলন ও বিন্যাসের অসাধারণ ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনিই সর্বপ্রথম সীরাত বিষয়ক ঘটনাবলী ইতিহাসের পদ্ধতিতে একের পর এক সাজান। তাঁর পূর্বে আর কেউ এমনভাবে সাজাননি। এসব কারণে তিনি সীরাত ও মাগাযী রচনায় পথিকৃতের স্থান দখল করে আছেন। আবূ আহমাদ ইবন 'আদী বলেন :[৩১]

وقد روى "المغازى" إبراهيم بن سعد وسلمة بن الفضل ومحمد بن سلمة ويحيى بن سعيد الأموى وسعيد بزيغ وجرير بن حازم وزياد البكائى وغيرهم. وقد روى عنه "المتبدأ" و"المبعث"،ولو لم يكن لابن اسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لايحصل منها شئ إلى الاشتغال بمغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومبتدأ الخلق لكانت هذه فضيلة سبق بها ابن إسحاق، ثم من بعده صنفها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها.

"তাঁর থেকে "আল-মাগাযী" বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবন সা'দ, সালামা ইবন আল-ফাদল, মুহাম্মাদ ইবন সালামা, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-উমাবী, সা'ঈদ ইবন বাযীগ, জারীর ইবন হাযিম, যিয়াদ আল-বাক্কাঈ ও আরো অনেকে। তিনি "আল-মুবতাদা" ও

---

৩১. তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৮২

"আল-মাব'আছ" আল-বাক্কাঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। কোন কিছুই অর্জিত হয় না— এমন সব গ্রন্থ পাঠের ব্যস্ততা থেকে রাজা-বাদশাদেরকে সরিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) আল-মাগাযী, আল-মাব'আছ ও আল-মুবতাদা (পৃথিবীর সূচনা) পাঠের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজটি ছাড়া আর কোন কিছুই যদি ইবন ইসহাক না করতেন, তাহলেও এই একটি মাত্র কাজের জন্য তিনি সকলকে অতিক্রম করে যেতেন। তাঁর পরে আরো অনেকে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু কেউই তাঁর সমকক্ষতা লাভ করতে সক্ষম হননি।'

ইবন ইসহাক তাঁর আল-মাগাযী গ্রন্থে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোত্র-গোষ্ঠী ও জাতির নামে বহু আরবী কবিতা সন্নিবেশ করেছেন। তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীকালের বসরা ও কূফার আরবী ভাষা-সাহিত্যের পণ্ডিতগণ সেসব কবিতার অধিকাংশ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে মত প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালে ইবন হিশাম বসরা-কূফার পণ্ডিতদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সেসব কবিতার সত্যাসত্য যাচাই করেছেন এবং অধিকাংশ বাদ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হিজরী তৃতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী সাহিত্য বিশারদ মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল-জামহী (মৃ. ২৩২) যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা উপস্থাপন করে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। তিনি বলেন :[৩২]

وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل منه كل غثاء محمد بن اسحاق، وكان من علماء الناس بالسير فقبل الناس عنه الأشعار، ويعتذر منها ويقول لا علم لى بالشعر انما أوتى به فاحمله، ولم يكن ذلك له عذرًا، فكتب فى السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود، أفلا يرجع إلى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ ألوف من السنين والله يقول (وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى) وقال فى عاد (فهل ترى لهم من باقية) وقال (وعادًا وثمود والذين من بعدهم لايعلمهم الا الله).

'যারা আরবী কবিতার ক্ষতি ও ধ্বংস করেছে এবং কবিতার নামে সব আবর্জনা ও জঞ্জাল গ্রহণ করেছে, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক তাদের অন্যতম। তিনি একজন সীরাত বিশেষজ্ঞ। লোকেরা তাঁর নিকট থেকে আরবী কবিতা গ্রহণ করেছে। তিনি আপত্তি করে বলতেন : কবিতা সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। আমার নিকট কবিতা আনা হয়, আর তা গ্রহণ করি। এটা তাঁর জন্য কোন কৈফিয়ত হতে পারে না। তিনি তাঁর সীরাত গ্রন্থে এমন সব লোকের কবিতা সন্নিবেশ করেছেন যারা কখনো কোন কবিতা বলেনি। পুরুষদের কবিতা ছাড়াও মহিলাদের কবিতাও সংকলন করেছেন। এ পর্যন্ত তিনি থেমে থাকেননি, বরং 'আদ ও ছামূদ জাতি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন। তিনি কি নিজে কখনো চিন্তা করেননি,

---

৩২. তাবাকাতু ফুহুল আশ-শু'আরা'-৭-৮

এসব কবিতা কারা এতদিন ধারণ করেছে এবং হাজার হাজার বছর ধরে কে বা তা সংরক্ষণ করেছে? আল্লাহ বলেন : তিনিই প্রথম 'আদকে ধ্বংস করেছেন এবং ছামূদকে এমনভাবে নির্মূল করেছেন যে, তাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখেননি। 'আদ জাতি সম্পর্কে অন্যত্র বলেন : তুমি কি এখনো তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাবে? তিনি আরো বলেন : তোমাদের কাছে কি সেই জাতিসমূহের অবস্থার বিবরণ আসেনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে? নূহের জাতি, 'আদ-ছামূদ এবং তাদের পরবর্তীকালের বহু জাতি যাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।'

কাদরিয়া মতবাদ

কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, ইবন ইসহাক কাদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আরবী 'কদর' শব্দ হতে 'কাদরিয়া' কথাটি এসেছে। 'কদর' মানে শক্তি। এই সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদরা মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যে ও কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন বলে তারা কাদরিয়া নামে পরিচিত। তবে তিনি কাদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেও অনেকে বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন নুমাইর বলেন, ইবন ইসহাক কাদরিয়া ছিলেন বলে দোষারোপ করা হয়, অথচ এই মতবাদের সাথে তাঁর দূরতম সম্পর্কও ছিল না।[৩৩]

মৃত্যু

প্রথম জীবনে তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। পরে এখান থেকে কূফা, জাযীরা, রায় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করতে থাকেন। সর্বশেষ বাগদাদে যান এবং সেখানে হিজরী ১৫১, খ্রী. ৭৬৮, মতান্তরে ১৫২ অথবা ১৫৩ সনে ইনতিকাল করেন। খলীফা হারূন আর-রাশীদের মা খায়যুরানের কবরস্তানে সমাহিত হন।[৩৪]

---

৩৩. তারীখু বাগদাদ-১/২২২; তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৭৮

৩৪. তাবাকাত-৭/২৭' তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭৩; আল-আ'লাম-৬/২৮

মুজাহিদ ইবন জাবর (রহ)

হযরত মুজাহিদ (রহ)-এর ডাকনাম আবুল হাজ্জাজ। তিনি কায়স ইবন আস-সায়িব আল-মাখযূমীর আযাদকৃত দাস ছিলেন।[১] তাঁর পিতার নাম জাবর ও জুবায়র দু'রকম বর্ণিত হয়েছে।[২]

তিনি একজন দাস হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানের জগতের সম্রাট ছিলেন। জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ইমাম পদ মর্যাদার অধিকারী। ইবন সা'দ লিখেছেন :[৩]

كان فقيها عالما ثقةً كثير الحديث.

'তিনি ছিলেন একজন ফকীহ, 'আলিম, বিশ্বস্ত ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক।' ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে জ্ঞানের ভাণ্ডার বলেছেন।[৪] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর মহত্ত্ব ও ইমাম হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য আছে।[৫] তাফসীর, হাদীছ, ফিকহসহ সকল ইসলামী জ্ঞানে তিনি ইমাম পদ মর্যাদা লাভ করেন।

'ইল্‌মুল কিরাআত ও তাফসীর

আল-কুরআনের পঠন-পাঠনও একটি শাস্ত্র, যাকে عِلْمُ الْقِرَاءَةِ বা কিরাআত শাস্ত্র বলা হয়। এটা 'উলূম আল-কুরআনের একটি শাখা। এ শাস্ত্রে কুরআন পাঠের যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি পঠিত হয়। তিনি এই 'ইল্‌মুল কিরাআত ও তাফসীর শাস্ত্রের সে যুগের একজন খ্যাতিমান 'আলিম ছিলেন। তাফসীরের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন মুসলিম উম্মাহ্‌র জ্ঞানের সাগর হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট থেকে। পূর্ণ তিরিশ বার তিনি তাঁকে কুরআন শোনান ও তাফসীর শোনেন।[৬] এত মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে এ কাজ করতেন যে, প্রত্যেক সূরা পাঠ করে থেমে যেতেন, তারপর সূরা ও বিভিন্ন আয়াতের শানে নুযূলসহ নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতেন।[৭] তাঁর এমন মনোযোগ, অধ্যবসায় ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) মত মহান মুফাস্‌সিরে কুরআনের (কুরআন ভাষ্যকার) নিকট শিক্ষার কল্যাণে তিনি একজন উঁচু স্তরের মুফাস্‌সিরে পরিণত হন। খাসীফ বলেন, মুজাহিদ তাফসীরের সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন।[৮] হযরত কাতাদা

---

১. আত-তাবাকাত-৫/৪৬৬

২. আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা-৩/৪৮৫-৪৮৬ (জীবনী নং ৮৩৬৩); 'আসরুত তাবি'ঈন-৪৫৭

৩. আত-তাবাকাত-৫/৪৬৬

৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯২

৫. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৮৩

৬. আত-তাবাকাত-৫/৪৬৬

৭. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/৪৩; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯২

৮. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৮৩

(রহ) বলতেন, সেই সময়ের জীবিত সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে মুজাহিদ সবচেয়ে বড় 'আলিম।[৯] পবিত্র কুরআনের একজন বিখ্যাত কারীও ছিলেন তিনি।[১০] সুফইয়ান আছ্-ছাওরী বলতেন, তোমরা মুজাহিদ, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, 'ইকরিমা ও আদ-দাহ্হাক ইবন মুযাহিম– এই চারজনের নিকট থেকে কুরআনের তাফসীর গ্রহণ করবে।[১১]

হাদীছ

তিনি হাদীছের একজন অতি প্রসিদ্ধ 'আলিম ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে মুফাস্সির ও হাদীছের হাফিজ, ইবন সা'দ كثير الحديث – বহু হাদীছের ধারক-বাহক এবং ইমাম নাওবী (রহ) হাদীছের ইমাম বলেছেন। হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার (রা) তাঁর স্মৃতি শক্তির দারুণ প্রশংসা করতেন। বলতেন, হায়, নাফি'র মুখস্থ শক্তি যদি তোমার মত হতো![১২]

হযরত 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন আল-আ'স, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, আবূ হুরায়রা, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, রাফি' ইবন খাদীজ, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকা, জুওয়ায়রিয়া বিনত আল-হারীছ, উম্মু হানী (রা) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের নিকট থেকে তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। তাছাড়া তাবি'ঈদের মধ্যে 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, তাউস, 'আবদুল্লাহ্ ইবন সায়িব, 'আবদুল্লাহ্ ইবন সানজারা, 'আবদুর রহমান ইবন সাফওয়ান, 'উমার ইবন আসওয়াদ, মুওয়াররিক আল-'আজলী, আবূ 'আয়্যাশ আয-যারকী, আবূ 'উবায়দা ইবন 'আবদিল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রহ) প্রমুখের নিকট থেকেও তিনি হাদীছ শোনেন।[১৩]

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের গণ্ডি অনেক প্রশস্ত। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : আইউব আস-সিখতিয়ানী, 'আতা', 'ইকরিমা ইবন 'আওন, 'আমর ইবন দীনার, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, আবুয যুবায়র মাক্কী, কাতাদা, হাবীব ইবন আবী ছাবিত, হাসান ইবন 'আমর, সালামা ইবন কাহয়াল, সুলায়মান আল-আহওয়াল, সুলায়মান আল-আ'মাশ, মুসলিম, আল-বাতীন, তালহা ইবন মুসরিফ, 'আবদুল্লাহ্ ইবন কাছীর (রহ) ও আরো অনেকে।[১৪]

ফিক্হ

ফিক্হ শাস্ত্রেও তিনি একজন ইমাম ও মুজতাহিদ পর্যায়ের ব্যক্তি ছিলেন।[১৫] ইমাম যাহাবী, ইবন হাজার, ইমাম নাওবী (রহ) সকলে তাঁর ফিক্হ বিষয়ে পারদর্শিতার

---

৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯২
১০. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/৪৪
১১. 'আসরুত তাবি'ঈন-৪৫৬, ৪৫৯
১২. শাজারাত আয-যাহাব-১/১২৫
১৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/৪২
১৪. প্রাগুক্ত
১৫. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৮৩

ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর দক্ষতার জন্য এ সনদই যথেষ্ট যে, সে কালের জ্ঞানের নগরী মক্কার শ্রেষ্ঠ মুফতীদের মধ্যে তিনিও একজন।[১৬]

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জ্ঞান চর্চা

জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য পার্থিব উপকার প্রাপ্তির আশা থেকে একেবারে মুক্ত থাকে না। কিন্তু হযরত মুজাহিদের জ্ঞান চর্চা সব রকম চাওয়া-পাওয়ার আশা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। সালামা ইবন কুহায়ল বলেন, 'আতা', তাউস ও মুজাহিদ– এই তিনজন ছাড়া আমি এমন কাউকে পাইনি যার জ্ঞান চর্চা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।[১৭]

জ্ঞানের সাথে তাঁর মধ্যে আল্লাহ-ভীতি ও দুনিয়া বিরাগী মনোভাব পূর্ণমাত্রায় ছিল। ইবন হিব্বান বলেন, মুজাহিদ ছিলেন একজন ফকীহ্, আল্লাহ-ভীরু, তাপস ও দুনিয়া বিরাগী মানুষ।[১৮]

দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীনতা

আজীবন তিনি দুনিয়ার কাছে অপরিচিত ও তার সাথে সম্পর্কহীন থেকে গেছেন। পার্থিব ভোগ-বিলাস বা কোন জিনিসের প্রতি তাঁর মন কখনো আসক্তি বোধ করেনি। সব সময় চিন্তাক্লিষ্ট ও বিষণ্ন থাকতেন। আ'মাশ বলেন, মুজাহিদকে আমরা যখনই দেখতাম, বিষণ্ন দেখতাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে এই বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) আমার হাত মুট করে ধরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হাত ধরে বলেছেন, 'আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যেন মনে হয় তুমি কোন মুসাফির অথবা কোন পথিক।[১৯]

সরল ও সাদাসিধে জীবন

বাহ্যিক চাকচিক্য ও সাজ-শোভার প্রতি এতই বেপরোয়া ছিলেন যে, প্রথম দৃষ্টিতে তাঁর ও একজন অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা দুঃসাধ্য ছিল। আ'মাশ বলেন, যখন আমি মুজাহিদকে তাঁর বাহ্যিক অবস্থায় দেখতাম তখন তাঁকে একজন অতি তুচ্ছ মানুষ মনে হতো।

বাহ্যিক বেশভূষায় কোন সহিস বলে ধারণা হতো। মনে হতো তার গাধা হারিয়ে গেছে এবং সে অস্থির ও উদ্ভ্রান্তের মত তা তালাশ করছে। তবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল তাতে কোন হেরফের হতো না। তিনি যখন কথা বলতেন তখন তাঁর মুখ থেকে যেন মুক্তো ঝরতো।[২০] অনেক বড় বড় সাহাবী তাঁকে সম্মান ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে

---

১৬. ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৬

১৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৪২; তারীখু ইবন 'আসাকির-১৬/১২৯

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. শাজারাত আয-যাহাব-১/১২৫

২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪৫৩

দেখতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) মত মহান ব্যক্তি তাঁর বাহনের জিনের আংটা চেপে ধরে তাঁকে উঠা-নামায় সাহায্য করতেন। তিনি বলতেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) সাহচর্য পেয়েছি। আমি চাইতাম তাঁর সেবা করতে, কিন্তু উল্টো তিনিই আমার সেবা করতেন।[২১]

হযরত মুজাহিদের (রহ) ভ্রমণ করা ও পৃথিবীর বিস্ময়কর বস্তু ও নিদর্শনসমূহ দেখার দারুণ শখ ছিল। তিনি বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখতেন। তিনি বাবেলে যান কুরআনে বিধৃত হারূত-মারূতের ঘটনাটির স্থান পরিদর্শনের জন্য।[২২]

ওফাত

মৃত্যুর সন সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা আছে। হিজরী ১০২ মতান্তরে ১০৩ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। নামাযে সিজদা অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি সত্তর (৭০), মতান্তরে আশি (৮০) বছর জীবন লাভ করেন।[২৩]

---

২১. প্রাগুক্ত; তারীখু ইবন 'আসাকির-১৬/১২৯

২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪৫৫

২৩. আত-তাবাকাত-৫/৪৬৬; 'আসরুত তাবি'ঈন-৪৬৫

মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন হুসায়ন আল-বাকির (রহ)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দৌহিত্র হযরত হুসায়নের (রা) পৌত্র মুহাম্মাদের ডাকনাম আবূ জা'ফার এবং উপাধি আল-বাকির। তাঁর পিতা ইমাম যায়নুল 'আবিদীন 'আলী ইবন হুসায়ন (রা) এবং মাতা হযরত ইমাম হাসানের (রা) কন্যা উম্মু 'আবদিল্লাহ।[১] সুতরাং ইমাম হুসায়ন ও ইমাম হাসান (রা) যথাক্রমে তাঁর মহান দাদা ও নানা। পিতৃ ও মাতৃ উভয়কুলের দিক দিয়ে তাঁর ধমনীতে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পবিত্র রক্ত বহমান ছিল। হিজরী ৫৭ সনের সফর মাসে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। এই হিসাবে কারবালায় হযরত ইমাম হুসায়নের (রা) মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণের সময় তিনি তিন/চার বছরের শিশু মাত্র।[২]

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত বাকির ছিলেন সেই খনির রত্ন ও রাতের বাতি যার কল্যাণে সারা পৃথিবীতে 'ইল্ম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর তিনি ইমাম যায়নুল 'আবিদীনের (রহ) মত জ্ঞানের দু'সাগরের মোহনা সমতুল্য পিতার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। বংশীয় ঐতিহ্যের প্রভাব ছাড়াও তাঁর মধ্যে স্বভাবগতভাবে জ্ঞান অর্জনের প্রবল আগ্রহও ছিল। এ সকল কারণ সম্মিলিতভাবে তাঁকে তাঁর যুগের একজন শীর্ষ স্থানীয় 'আলিমে পরিণত করে। তিনি স্বীয় অগাধ জ্ঞানের কারণে "বাকির" অভিধায় ভূষিত হন।[৩] আরবী باقر শব্দটি بقر থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বিদীর্ণ করা, ফেঁড়ে ফেলা। তিনি 'ইল্ম তথা জ্ঞানকে বিদীর্ণ করে তার মূল ও অভ্যন্তরীণ গোপন রহস্য অবগত হন, তাই তাঁকে باقر (বাকির) বলা হয়।[৪]

অনেক 'আলিম মনে করতেন তাঁর মহান পিতার জ্ঞানের চেয়েও তাঁর জ্ঞান অনেক ব্যাপক ছিল। মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির বলেন, যতদিন আমি মুহাম্মাদকে না দেখেছি ততদিন মনে করতাম, এমন কোন 'আলিম নেই যাঁকে 'আলী ইবন হুসায়ন যায়নুল 'আবিদীনের (রহ) উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়।[৫] তিনি তাঁর সময়ে তাঁর পুরো খান্দানের নেতা ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন : كان سيد بنى هاشم فى زمانه - 'তিনি তাঁর সময়ে বানূ হাশিমের নেতা ছিলেন।'[৬] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তিনি একজন অতি

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল-১৭/৭৩

২. ওয়াফইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৪৫০

৩. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৮৭

৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৪

৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩৫০

৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৪

সম্মানিত তাবি'ঈ ও শ্রেষ্ঠ ইমাম ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকলে একমত। মদীনার ফকীহ ও ইমামগণের মধ্যে তিনি পরিগণিত।[৭] ইমাম যাহাবী তাঁকে শীর্ষস্থানীয় দৃঢ়পদ ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।[৮]

হাদীছ

হাদীছ তো তাঁর নিজ গৃহের সম্পদ। এ কারণে এর সবচেয়ে বেশী অধিকার ছিল তাঁর। ইবন সা'দ বলেছেন :[৯] كان ثقة كثير العلم والحديث – 'তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, বহু জ্ঞান ও হাদীছের ধারক-বাহক।' এই জ্ঞান তিনি অর্জন করেন পারিবারিক পরিমণ্ডলে নিজ বংশের উর্ধ্বতন পুরুষদের নিকট থেকে। যেমন : পিতা ইমাম যায়নুল 'আবিদীন, নানা হাসান, দাদা হুসায়ন ইবন 'আলী, মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা, দাদার চাচাতো ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা) প্রমুখ মহান ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে পরোক্ষভাবে অর্জন করেন। অর্থাৎ তাঁদের সূত্রে তাঁর সকল বর্ণনা "মুরসাল"। নিজ পরিবারের বাইরে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী রাফি', হারমালা, 'আতা' ইবন ইয়াসার, ইয়াযীদ ইবন হুরমুয, আবু মুররা (রহ) প্রমুখের নিকট থেকেও ফায়দা হাসিল করেন।[১০]

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

সেই সময়ের বড় বড় ইমাম যেমন : আবান ইবন তাগলিব আল-কূফী, জাবির ইবন ইয়াযীদ আল-জু'ফী, হাজ্জাজ ইবন আরতাত, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আতা', আওযা'ঈ, আল-আ'মাশ, ইবন জুরাইজ, ইমাম যুহরী, 'আমর ইবন দীনার, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ (রহ) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ এবং তাবি' তাবি'ঈনের বড় একটি দল তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেন।[১১]

ফিক্হ শাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ইবন আল-বারকী তাঁকে ফকীহ ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলেছেন।[১২] মনীষীগণ তাঁকে মদীনার তাবি'ঈ ফকীহ ও ইমামদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[১৩]

'ইবাদত-বন্দেগী

তিনি সেই সব মহান ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে ওঠেন

---

৭. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৮৭

৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৪

৯. আত-তাবাকাত-৫/২২৮; তাহ্যীব আল-কামাল-১৭/৭৪

১০. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩৫০; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৭৩

১১. প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৮৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৪

যাঁদের জীবনের প্রধান কাজই ছিল 'ইবাদত-বন্দেগী করা, আর যে পরিবেশে তিনি জন্মের পর চোখ মেলে তাকান সেখানে সর্বক্ষণ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের যিক্র ও তাসবীহ-তাহমীদের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হতে থাকতো। এ কারণে 'ইবাদতের সেই প্রাণশক্তি তাঁর মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছিল। রাত-দিন দেড়শো রাক'আত নফল নামায আদায় করতেন।[১৪] অতিরিক্ত সিজদার কারণে কপালে স্পষ্ট দাগ পড়ে গিয়েছিল। তবে সেটা তেমন গভীর ছিল না।[১৫]

হযরত আবূ বকর ও 'উমারের (রা) প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

নিজের পূর্বপুরুষ ও অন্যান্য মহান ব্যক্তির মত হযরত আবূ বকর ও 'উমারের (রা) প্রতিও ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ। জাবির বলেন, একবার আমি মুহাম্মাদ ইবন 'আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বংশের কেউ কি আবূ বকর ও 'উমারকে (রা) গালি দিতেন? বললেন, না। আমি তাঁদেরকে ভালোবাসি এবং তাঁদের মাগফিরাতের দু'আ করি। 'ঈসা ইবন দীনার আল-মুয়ায্যিনের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি তাঁকেও এরূপ জবাব দেন এবং তাঁদের দু'জনকে ভালোবাসতে ও তাঁদের জন্য দু'আ করতে বলেন।[১৬]

সালিম ইবন আবী হাফসা বলেন, আমি ইমাম আল-বাকির ও তাঁর পুত্র জা'ফার আস-সাদিকের নিকট আবূ বকর ও 'উমারের (রা) ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি, তিনি বলেন, সালিম! আমি তাঁদেরকে ভালোবাসি এবং তাঁদের দুশমনদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা দু'জন ছিলেন পথপ্রদর্শক ইমাম। আমাদের পরিবারের সকলকে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে দেখেছি।[১৭]

বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা

কিছু দল-উপদল এমন সব ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাস ঐ সকল মহান ব্যক্তিবর্গের প্রতি আরোপ করেছে যার সাথে তাঁদের বিন্দু মাত্র সম্পৃক্ততা ছিল না। দীনী বিষয়ে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন ইসলামী আকীদা ছাড়া আর কোন রকম নতুন আকীদা তাঁরা পোষণ করতেন না। জাবির বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন 'আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের আহ্লি বায়তের মধ্যে কেউ কি এমন ধারণা পোষণ করতেন যে, কোন পাপ শিরক? বললেন, না। আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম; তাদের কেউ কি পুনর্জীবনের প্রবক্তা ছিলেন? বললেন, না।[১৮]

ওফাত

তিনি হামিয়্যা নামক স্থানে ইনতিকাল করেন এবং লাশ মদীনায় এনে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সন নিয়ে মত পার্থক্য আছে। হিজরী ১১৪, ১১৫, ১১৭ ও ১১৮

---

১৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৪

১৫. আত-তাবাকাত-৫/২৩৬

১৬. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-কামাল-১৭/৭৫

১৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩৫১; তাহ্যীব আল-কামাল-১৭/৭৪

১৮. আত-তাবাকাত-৫/২৩৬

সনের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১৯] কত বছর জীবন লাভ করেন সে সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা মতে ৫৮ বছর এবং অন্যটি মতে ৭৩ বছর। তবে দ্বিতীয়টি যে সত্য নয় তা নিশ্চিত করে বলা যায়। কারণ হিজরী ৫৭ সনে যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সে ব্যাপারে সকলে একমত।[২০]

সেই হিসাবে প্রথম বর্ণনাটি অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। কারণ তখন তাঁর বয়স ৫৮ থেকে ৬১ বছরের মধ্যে হয় এবং কোনভাবেই ৭৩ বছর হয় না।

সন্তানাদি

ইমাম আল-বাকির (রহ) অনেকগুলো সন্তান রেখে যান। জা'ফার ও 'আবদুল্লাহ ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) দৌহিত্রী উম্মু ফারওয়ার (রহ) গর্ভজাত; ইবরাহীম ছিলেন উম্মু হাকীম বিনত উসায়দের গর্ভজাত; 'আলী ও যায়নাব ছিলেন এক দাসীর গর্ভজাত এবং উম্মু সালামা আরেক দাসীর গর্ভজাত ছিলেন। তাঁদের সকলের মধ্যে জা'ফার, যিনি আস-সাদিক উপাধি প্রাপ্ত, সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং তিনি তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।[২১]

ইমাম আল-বাকির সুন্দর বেশ-ভূষা পছন্দ করতেন। 'খুয' নামক এক প্রকার রেশমের মূল্যবান কাপড় ব্যবহার করতেন। সাদা ও রঙ্গীন দু'ধরনের পোশাকই ব্যবহার করতেন। পশমী বুটিদার কাপড়ও পরতেন। চুল ও দাড়িতে খিজাব লাগাতেন।[২২]

---

১৯. ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৪৫০; আত-তাবাকাত-৫/২৩৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৪

২০. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩৫১; তাহ্যীব আল-কামাল-১৭/৭৫

২১. আত-তাবাকাত-৫/২৩৮

২২. প্রাগুক্ত; তাবি'ঈন-৪৫১

মাকহূল আদ-দিমাশকী (রহ)

হযরত মাকহূলের (রহ) কুনিয়াত তথা ডাকনাম দু'টি : আবূ 'আবদিল্লাহ ও আবূ আইউব। তাঁর বংশ ও জন্মভূমি সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবন সা'দ তাঁকে কাবুলের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন।[১] ইবন হাজার কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যার একাংশের দ্বারা জানা যায় তিনি একজন অনারব বংশোদ্ভূত এবং তাঁর পিতার নাম সোহরাব। আর ইবন হাজারের বর্ণনার কিছু অংশের দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি মিসরীয় ছিলেন, আর কিছু বর্ণনা দ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি একজন আরব এবং হুযালী গোত্রের মানুষ।[২]

তবে শেষের দু'টি বর্ণনা অর্থাৎ হুযালী ও মিসরীয় হওয়া অবশ্যই সঠিক নয়। কারণ তাঁর অনারব বংশোদ্ভূত হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। তাঁর হুযালী ও মিসরীয় হওয়া এজন্য প্রসিদ্ধ যে, তিনি তাঁর জীবনের কিছু দিন হুযালী গোত্রের এক ব্যক্তির দাসত্বে ছিলেন এবং কিছুকাল মিসরে অবস্থান করেন।

এ ব্যাপারে ইমাম নাওবীর (রহ) বর্ণনাটি অধিক যুক্তিভিত্তিক ও সঠিক বলে প্রতিভাত হয়। তিনি তাঁকে অনারব বংশোদ্ভূত ও কাবুলের লোক বলেছেন। সুতরাং তার বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মাকহূলের (রহ) উর্ধ্বতন বংশধারা এ রকম :[৩]

مكحول بن زيد يا ابن ابى مسلم شهراب بن شاذل بن سند بن شزدان بن يردك بن يغوث بن كسرى كابلى ودمشقى.

এ বর্ণনা দ্বারা বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে যে সমন্বয়টি পাওয়া যায় তা হলো– তিনি অনারব বংশোদ্ভূত, জন্মভূমি কাবুল এবং দিমাশকে বসবাসকারী ছিলেন। আল-মিযযী বলেন : দিমাশকের 'আল-আহাদ' বাজারের পাশে তাঁর বাড়ি ছিল।[৪]

তাঁর জীবনের প্রথম পর্বের ইতিহাস হলো, তিনি 'আমর ইবন সা'ঈদ ইবন আল-'আসের দাস ছিলেন। 'আমর তাঁকে হুযালী গোত্রের এক মহিলাকে দান করেন। এই দ্বিতীয়জনের দাসত্বের কারণে তাঁর সম্পর্ক আরোপের ক্ষেত্রে দু'টি বর্ণনা হয়ে গেছে। একটি হলো তিনি 'আমর ইবন সা'ঈদের দাস ছিলেন, আর দ্বিতীয়টি হলো, তিনি ছিলেন হুযালী গোত্রের দাস। দু'টি বর্ণনাই সঠিক। তিনি নিজেই তাঁর দাসত্ব জীবনের সূচনা সম্পর্কে বলেছেন, "আমি 'আমর ইবন সা'ঈদ ইবন আল-'আসের দাস ছিলাম। পরে তিনি

---

১. আত-তাবাকাত-৭/১৬১

২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/২৯০; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৩৫৬

৩. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১১৩

৪. তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৩৫৬

আমাকে হুযালী গোত্রের এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেন।"[৫] কথাটি যুক্তিভিত্তিক এজন্য যে, 'আমরের পিতা সা'ঈদ হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে কাবুলের সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে জয় করেন।[৬] এটাই যুক্তিসিদ্ধ যে, এই অভিযানের সময় মাকহূল যুদ্ধবন্দী হিসেবে সা'ঈদের অধিকারে আসেন। আর একথার সমর্থন পাওয়া যায় খোদ মাকহূলের একটি বর্ণনাতে। তিনি বলেন, আমি এক সময় সা'ঈদের দাস ছিলাম।[৭] পরে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তাঁর পুত্র 'আমরের অধিকারে এসে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক।

মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনযির শাক্কার বলেন : মাকহূলের মূল হলো হারাতের। তাঁর পিতার নাম আবূ মুসলিম শোহ্‌রাব ইবন শাযিল। দাদা শাযিল হারাতের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কাবুলের এক রাজার মেয়ে বিয়ে করেন। স্ত্রীকে সন্তান সম্ভাবা অবস্থায় রেখে তিনি মারা যান এবং স্ত্রী পিতৃগৃহে চলে যান। সেখানে শোহরাবের জন্ম হয়। শোহরাব কাবুলে বেড়ে ওঠেন এবং সেখানে বিয়ে করেন। অতঃপর সেখানে মাকহূলের জন্ম হয়। একটু বড় হলে তিনি মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং সা'ঈদ ইবন আল-'আসের হাতে অর্পিত হন। এভাবে তিনি দাসত্বের জালে জড়িয়ে পড়েন। সা'ঈদ ইবন আল-'আস আবার তাঁকে হুযাইল গোত্রের এক মহিলার হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেন। পরে এই মহিলা মাকহূলকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন।[৮]

জ্ঞান অর্জনের জন্য ইসলামী বিশ্ব ভ্রমণ

মুসলমানরা যে দাসদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দাসত্বের নিকৃষ্ট জীবন থেকে বের করে পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে দিত, মাকহূল তাঁর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবন শুরু হয়েছে দাসত্বের মাধ্যমে এবং অবশেষে তিনি শামের জ্ঞানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হন। জ্ঞান অন্বেষণে তাঁর স্বভাবগত আগ্রহ ছিল। এ কারণে দাসত্বের জীবনেই তিনি জ্ঞান অর্জনে মনোযোগী হন। পরে দাসত্ব থেকে মুক্তির পর তৎকালীন গোটা ইসলামী বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি বলেন, যখন আমি দাসত্ব থেকে মুক্ত হই তখন মিসরের সকল জ্ঞান আত্মস্থ করে ফেলি।[৯] আর যতক্ষণ না আমার মধ্যে এ প্রত্যয় জন্মেছে যে, এখানকার সকল জ্ঞান আমি ধারণ করে ফেলেছি ততক্ষণ সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য পা বাড়াইনি।[১০]

মিসরের জ্ঞান ভাণ্ডার শূন্য করার পর তিনি মদীনায় যান এবং সেখান থেকে যান ইরাকে।

---

৫. আত-তাবাকাত-৭/১৬১

৬. ফুতূহ আল-বুলদান-৩২২

৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৭

৮. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৩৫৮

৯. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৮

১০. আত-তাবাকাত-৭/১৬০

এ দু'স্থানের জ্ঞানের সকল ঝর্ণাধারা থেকে পরিতৃপ্ত হওয়ার পর যান শামে। তথাকার জ্ঞানী-গুণীদের নিকট থেকে স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ করেন। মোটকথা, তিনি জ্ঞান অন্বেষণে ইসলামী দুনিয়ার প্রতিটি কোণে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি নিজেই বলেন : طفت الأرض كلها في طلب العلم. – 'আমি জ্ঞানের অন্বেষণে গোটা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছি।'[১১]

জ্ঞান অর্জনে তাঁর প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা-সাধনা তাঁকে জ্ঞানের জগতের এমন শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে দেয় যেখানে তাঁর সমকালীনদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই পৌঁছাতে পেরেছিলেন। ইমাম যুহরী (রহ) বলতেন; 'আলিম তো মাত্র চারজন। তাঁদের মধ্যে একজন মাকহূল। অন্য তিনজন হলেন : মদীনার সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, কূফার 'আমির আশ-শা'বী এবং বসরার হাসান আল-বাসরী।[১২] ইবন ইউনুস বলেন, মাকহূল একজন ফকীহ ও 'আলিম ছিলেন। তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলে একমত।[১৩] ইবন 'আম্মার বলতেন, তিনি শামের অধিবাসীদের ইমাম ছিলেন।[১৪] হাদীছ ও ফিক্হ উভয় শাস্ত্রে তিনি ইমাম মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

সুলায়মান ইবন মূসা বলতেন : আমাদের কাছে 'ইল্ম যখন হিজাযের যুহ্রী থেকে, 'ইরাকের হাসান আল-বাসরী থেকে, আল-জাযীরার মায়মূন ইবন মিহরান থেকে এবং শামের মাকহূল থেকে আসলো, আমরা তা গ্রহণ করলাম। সা'ঈদ ইবন 'আবদিল 'আযীয বলেন, হিশামের খিলাফাতকালে এ চারজনই ছিলেন মানুষের 'আলিম।[১৫]

হাদীছ

তিনি হিজায, ইরাক, মিসর, শামসহ জ্ঞান চর্চার সকল কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তথাকার মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। স্মৃতি শক্তি এত প্রখর ছিল যে, যা কিছু শোনেন সবই বক্ষে ধারণ ও সংরক্ষণ করেন।[১৬] এ কারণে তিনি তাঁর সময়ের একজন বড় হাফিজে হাদীছে পরিণত হন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে তাবি'ঈদের তৃতীয় স্তরের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭]

তাঁর শিক্ষকবৃন্দ

তিনি তাঁর সময়ের প্রায় সকল বড় 'আলিমের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এ কারণে তাঁর শিক্ষকদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। কোন দেশ তা থেকে বাদ পড়েনি। সেই

---

১১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৩৫৯

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১১৪

১৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/২৯১

১৫. তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৩৬০

১৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮

১৭. প্রাগুক্ত-১/১০৭

তালিকার মধ্যে বিশাল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের নামও আছে। তাঁদের মধ্যে আনাস ইবন মালিক, আবূ হিন্দ দারী, ওয়াছিলা ইবন আসকা', আবূ উমামা, 'আবদুর রহমান ইবন গানাম, আবূ জান্দাল ইবন সুহায়ল (রা) প্রমুখের নিকট থেকে সরাসরি হাদীছ শুনেছেন।[১৮] আর উবাই ইবন কা'ব, ছাওবান, 'উবাদা ইবন ছাবিত, আবূ হুরায়রা, আবূ ছা'লাবা খুশানী, 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা) থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের নাম বাদ দিয়ে তিনি নিজেই সরাসরি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৯] বিশিষ্ট তাবি'ঈদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, মাসরূক, জুবায়র ইবন নাদীর, কুরায়ব, আবূ মুসলিম, আবূ ইদরীস খাওলানী, 'উরওয়া ইবন যুবায়র, 'আবদুল্লাহ ইবন মুহায়রীয, 'আম্বাসা ইবন আবী সুফইয়ান, ওয়াররাদ কাতিব, মুগীরা, কুছায়্যির মুররা, উম্মুদ দারদা' (রহ) প্রমুখ থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন।[২০]

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের গণ্ডি অত্যন্ত প্রশস্ত। বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হলো : ইমাম যুহরী, হুমায়দ আত-তাবীল, মুহাম্মাদ ইবন 'আজলান, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আলা', সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ মুহারিবী, মূসা ইবন ইয়াসার, ইমাম আওযা'ঈ, সা'ঈদ ইবন 'আবদিল 'আযীয, 'আলা' ইবন আল-হারিছ, ছাওর ইবন ইয়াযীদ, আইউব ইবন মূসা, মুহাম্মাদ ইবন রাশিদ মাকহূলী, মুহাম্মাদ ইবন ওয়ালীদ যুবায়দী, বারদ ইবন সিনান, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আওফ, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, উসামা ইবন যায়দ লায়ছী, নাখীর ইবন সা'দ, সাফওয়ান ইবন 'আমর, ছাবিত ইবন ছাওবান (রহ) ও আরো অনেকে।[২১]

ফিক্‌হ ও ফাতওয়া

হাদীছ স্মৃতিতে ধারণের সাথে সাথে তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের একজন ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন। আবূ হাতিম বলতেন, আমি শামে মাকহূলের চেয়ে বড় কোন ফকীহ দেখিনি।[২২] সাঈদ ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে ইমাম যুহরীর চেয়েও বড় ফকীহ বলে মনে করতেন।[২৩] ইফতার ক্ষেত্রে ছিল তাঁর বিশেষ দক্ষতা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি। সা'ঈদ ইবন 'আবদিল 'আযীয বলেন, তাঁর যুগে ইফতার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে বেশী সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর কারো ছিল না।[২৪]

---

১৮. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/১১৩

১৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/২৯০

২০. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/১১৩; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৩৫৭

২১. প্রাগুক্ত

২২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৮

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/২৯১; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৩৬০

সতর্কতা

তিনি ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। নিজের মতের ভিত্তিতে যদি কোন মাসয়ালার জবাব দিতেন তাহলে স্পষ্টভাবে সে কথা বলে দিতেন যে, এটা আমার মত। সঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে।[২৫]

ফিক্হ বিষয়ে তাঁর মনীষা ও উৎকর্ষতার বড় প্রমাণ এই যে, সেই যুগে যখন গ্রন্থ রচনার সূচনাও হয়নি তখন তিনি ফিক্হ বিষয়ে দু'টি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ দু'টির নাম : ১. কিতাবুস সুনান, ২. কিতাবুস মাসায়িল।[২৬]

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়

জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সাথে নৈতিক উৎকর্ষতায়ও বিভূষিত ছিলেন। আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা– এ দু'টি গুণ তাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছিল। যা কিছু তাঁর হাতে আসতো সবই আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। সা'ঈদ ইবন 'আবদিল 'আযীয বলেন, মাকহূলের ভাতা নির্ধারিত ছিল। তিনি সেই অর্থ আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে ব্যয় করতেন।[২৭] একবার দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বড় অঙ্কের অর্থ তাঁর হাতে আসে। তিনি সেই অর্থও আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যয় করেন। তিনি একজন মুজাহিদকে তাঁর একটি ঘোড়ার মূল্য হিসেবে পঞ্চাশ স্বর্ণ মুদ্রা দিতেন।[২৮]

একটি সন্দেহের নিরসন

হযরত মাকহূল (রহ) সম্পর্কে একটা সাধারণ প্রসিদ্ধি ছিল যে, তিনি 'কাদরিয়া' মতবাদে বিশ্বাসী। এর সমর্থনে কিছু বর্ণনাও পাওয়া যায়। কিন্তু সঠিক বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে জানা যায়, এই ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে তিনি পরিচ্ছন্ন ছিলেন। ইমাম আওযা'ঈ (রহ) তাঁর একজন বিশিষ্ট ছাত্র বলেন, যতটুকু শোনা যায়, তাবি'ঈদের মধ্যে দুই ব্যক্তি হাসান আল-বাসরী ও মাকহূল (রহ) কাদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু আমি ব্যাপক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার পর জেনেছি এই প্রসিদ্ধি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।[২৯] তাঁর আরেকজন ছাত্র সা'ঈদ ইবন 'আবদিল 'আযীযও তাঁর এই ভ্রান্ত মতবাদের বিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে মতভেদ আছে। হিজরী ১১২, ১১৩ এবং ১১৮ সনের কথা বর্ণিত হয়েছে।[৩০]

---

২৫. শাজারাত আয-যাহাব-১/১৪৬

২৬. ইবন নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত (মিসর সংস্করণ)-৩১৮; তাবি'ঈন-৪৮৯

২৭. আত-তাবাকাত-৭/১৬১

২৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৮

২৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/২৯১; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৩৬০

৩০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১৮/৩৬০; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৩৬০

মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির (রহ)

কুরায়শ বংশের বানূ তায়ম শাখার সন্তান মুহাম্মাদ (রহ)। তাঁর ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। পিতা আল-মুনকাদির ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আল-হুযায়র।[১] তাঁর অপর দু'ভাই আবূ বাকর ইবন আল-মুনকাদির ও 'উমার ইবন আল-মুনকাদির।

আল-মুনকাদির ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) মামা। একদিন তিনি 'আয়িশার (রা) কাছে গিয়ে নিজের প্রয়োজনের কথা বলে কিছু অর্থ সাহায্য চাইলেন। তিনি বললেন, আমার হাতে কিছু অর্থ আসার কথা আছে, আসলে পাঠিয়ে দেব। এরপর দশ হাজার দিরহাম 'আয়িশার (রা) হাতে আসে এবং তিনি সাথে সাথে তা আল-মুনকাদিরের নিকট পাঠিয়ে দেন। মুনকাদির সেই অর্থ দিয়ে একটি দাসী কেনেন। সেই দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তাঁর তিন ছেলে : মুহাম্মাদ, আবূ বাকর ও 'উমার।[২]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা চর্চায় তিনি অতি উঁচু স্তরের মানুষ ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে আল-ইমাম ও শায়খুল ইসলাম (ইসলামের জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তি) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন :

مجمع على ثقته وتقدمه فى العلم والعمل وهو من طبقة عطاء لكنه تأخر موته.

"তাঁর বিশ্বস্ততা এবং 'ইল্ম ও 'আমলে অগ্রবর্তিতার ব্যাপারে সকলের ঐক্যমত আছে। তিনি 'আতা'র স্তরের মানুষ, তবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে দেরীতে।"[৩] ইবন হাজার আল-আসকিলানী (রহ) তাঁকে শীর্ষস্থানীয় ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

কিরাআত

আল-কুরআনের একজন বিশিষ্ট কারী ছিলেন। ইমাম মালিক (রহ) বলেন : "كان سيّد القراء - তিনি ছিলেন কারীদের নেতা।"

হাদীছ

হাদীছের একজন বিখ্যাত হাফিজ ছিলেন। আল-হুমায়দী বলেন : ابن المنكدر حافظا - ইবন আল-মুনকাদির একজন হাফিজ।[৫] তিনি সাহাবা ও তাবি'ঈন কিরামের বড় একটি

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৭

২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৪৭৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৩৬৫

৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৭

৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/১২৭

৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৭

দলের নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ আইউব আল-আনসারী, আনাস ইবন মালিক, জাবির, আবূ উমামা ইবন সাহ্ল, রাবী'আ ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র, আবূ কাতাদা, সাফীনা, 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা) এবং তাবি'ঈদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবী রাফি', 'উরওয়া ইবন যুবায়র, মু'আয ইবন 'আবদির রহমান আত-তায়মী, সা'ঈদ ইবন 'আবদির রহমান ইয়ারবূ', আবূ বাকর ইবন সুলায়মান (রহ) প্রমুখের সূত্রে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৬] তাঁর কিছু মুরসাল হাদীছ আছে। কিন্তু হাদীছের 'আলিমগণ মনে করেন, তাঁর মুরসাল হাদীছ অন্য অনেকের মারফূ' হাদীছের চেয়েও নির্ভরযোগ্য।[৭] ইবন 'উয়ায়না বলেন :

كان من معادن الصدق ويجتمع اليه الصالحون. – "তিনি ছিলেন সত্য ও সততার খনিসদৃশ। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁর কাছে সমবেত হতেন।" তিনি আরো বলেন, কেউ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (রাসূল সা. বলেছেন) বলেছেন, আর সকলে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিয়েছেন, একমাত্র তিনি ছাড়া এমন আর কাউকে আমি দেখিনি।[৮] ইবরাহীম বলতেন, তিনি মুখস্থ শক্তি, দৃঢ়তা ও দুনিয়া বিরাগী মনোভাবের চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষ ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন ইল্মে হাদীছে "হুজ্জাত" (দলিল-প্রমাণ) স্তরের ব্যক্তি।[৯]

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন ও তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন : তাঁর পুত্র ইউসুফ ও আল-মুনকাদির, ভাতিজা ইবরাহীম ও 'আবদুর রহমান এবং অন্যদের মধ্যে 'আমর ইবন দীনার, ইমাম যুহ্রী, আইউব, আনাস ইবন 'উবায়দ, সালামা ইবন দীনার, জা'ফার ইবন মুহাম্মাদ সাদিক, মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি', সা'দ ইবন ইবরাহীম, সুহায়ল ইবন আবী সালিহ, ইবন জুরায়জ, 'আলী ইবন যায়দ, মূসা ইবন 'উকবা, হিশাম ইবন 'উরওয়া, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী (রহ) ও আরো অনেকে।[১০]

ফিক্হ

তিনি ফিক্হ ও ফাতওয়ায় পারদর্শী ছিলেন। মদীনার তাবি'ঈ মুফতীগণের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হতো।[১১]

---

৬. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৪৭৩

৭. তাবি'ঈন-৪৬৩

৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৭; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৩৬৫

৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৪৭৫

১০. প্রাগুক্ত-৯/৪৭৪; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/২৬৪-২৬৫

১১. ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৬

তাঁর মধ্যে তাকওয়া-পরহিযগারী ও দুনিয়া বিরাগী মনোভাব চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। নফ্স বা আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য তিনি অত্যন্ত কঠিন অনুশীলন করতেন। একাধারে চল্লিশ বছর নানাভাবে নফ্সের পরিশুদ্ধির কাজ করেন। তিনি নিজেই বলেন : كابدت نفسى أربعين سنة حتى استقامت – "আমি চল্লিশ বছর যাবত আমার নফ্সকে কষ্ট দিয়েছি, অতঃপর সে সোজা হয়।"[১২] ইমাম মালিক বলতেন, তিনি উঁচু স্তরের 'আবিদ ও যাহিদ (দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ত) মানুষ ছিলেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী বলেন, তাঁর বাড়ীটি ছিল সত্যনিষ্ঠ ও 'আবিদ (সাধক) ব্যক্তিদের ঠিকানা।[১৩]

খাওফে খোদা বা আল্লাহর ভয় তাঁর অন্তরের গভীরে শিকড় গেঁড়েছিল। কুরআনের বিশেষ বিশেষ আয়াত যখন তিলাওয়াত করতেন তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ধারা জারি হয়ে যেত। এক রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে ব্যাকুল হয়ে কাঁদলেন। সকালে ভাইয়েরা তাঁর এমন কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন : এ আয়াতটি পাঠের পর আমার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় :

وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ. (الزمر : ٤٧)

"এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি।"

তাঁর মরণ সময় ঘনিয়ে এলে তিনি ভীষণ ভীত-শংকিত হয়ে পড়েন। বলেন, 'আমি এ আয়াতকে ভয় পাচ্ছি। আমি ভয় পাচ্ছি, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার সামনে এমন কিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে যার কল্পনাও আমি কখনো করিনি। হাদীছের ব্যাপারেও তাঁর অবস্থা এমন ছিল। ইমাম মালিক বলেন : যখন কেউ তাঁর কাছে কোন হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তখন তিনি কেঁদে ফেলতেন।[১৪]

হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী ও আবেগপ্রবণ ছিলেন। ঋণগ্রস্ত হয়েও হজ্জ করতেন। একবার কেউ একজন প্রতিবাদের সুরে বলে, আপনি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় হজ্জ আদায় করেন কেন? বললেন, হজ্জই ঋণ পরিশোধের সবচেয়ে বড় উপায় ও সহায়ক। হজ্জে একাকী যেতেন না। স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে সকলকে নিয়ে যেতেন। বলতেন, তাদেরকে আল্লাহর সামনে উপস্থাপনের জন্য নিয়ে যাই। তাকে দেখলে অন্যের নফ্সও পরিশুদ্ধ হতো। ইমাম মালিক বলেন, আমি যখন আমার অন্তরে কাঠিণ্য অনুভব করতাম তখন গিয়ে মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদিরকে দেখতাম। এর প্রভাব এই হতো যে, কয়েকদিন পর্যন্ত নফ্স আমার নিকট খুব অপ্রিয় থাকতো।[১৫]

---

১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৭
১৩. শাজারাত আয-যাহাব-১/১৭৮
১৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৭
১৫. শাজারাত আয-যাহাব-১/১৭৮

জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনার নিকট সবচেয়ে ভালো কাজ কি? বললেন, মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করা। আবার জিজ্ঞেস করে, সবচেয়ে প্রিয় জগত কোনটি? বললেন : বন্ধুদের সাথে আদান-প্রদান করা। আল-ওয়াকিদী বলেন : তিনি হিজরী ১৩০ সনে ইনতিকাল করেন।[১৬] একথা মুহাম্মাদ ইবন সা'দও বলেছেন। তবে হারূন ইবন মুহাম্মাদ আল-ফারবীর সূত্রে ইমাম আল-বুখারী হিজরী ১৩১ সনের কথা বলেছেন। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না বলেন, তিনি সত্তর (৭০) বছরের উপরে জীবন লাভ করেন। শেষ জীবনে মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল, তাই মেহেদীর খিজাব লাগতেন।[১৭]

---

১৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৮

১৭. তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/২৬৬

মুসলিম ইবন ইয়াসার (রহ)

ইসলাম সাম্য ও সমতার ধর্ম। এতে উঁচু-নীচু, দাস-মনিবের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এখানে সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হলো তাকওয়া ও 'আমল। এর নজীর ইসলামের ইতিহাসে সর্বত্র পাওয়া যায়। তেমনই একটি দৃষ্টান্ত মুসলিম ইবন ইয়াসার। তাঁর ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত তালহা ইবন 'উবায়দিল্লাহ, মতান্তরে 'উছমান ইবন 'আফ্ফানের (রা) দাস ছিলেন।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত তালহা (রা) ছিলেন "আশারা মুবাশ্শারা" অর্থাৎ জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন মানুষের একজন। তাঁর ব্যক্তি সত্তাটি ছিল 'ইল্ম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের দুই সাগরের সঙ্গম স্থলের মত। তাঁর দাসত্বের কল্যাণে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) শহর মদীনায় অবস্থানের সুযোগে মুসলিমও 'ইল্ম ও 'আমলের ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। ইবন সা'দ বলেন :[২] كان مسلم ثقة فاضلا عابدًا ورعًا – "মুসলিম ছিলেন বিশ্বস্ত, জ্ঞানী, তাপস ও আল্লাহভীরু।" ইবন আওন বলেন, সেই সময়ে মুসলিমের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হতো না।[৩]

হাদীছ

মদীনায় অবস্থানের কারণে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) মত উম্মাতের শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং আবুল আশ'আছ সান'আনী, হামরান ইবন আবান (রহ) প্রমুখের নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। আর ছাবিত আল-বানানী, ইয়া'লা ইবন হাকীম, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, আইউব সাখতিয়ানী, আবূ নাদরা ইবন কাতাদা, সালিহ, আবুল খায়ল, মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি', 'আমর ইবন দীনার, আবান ইবন আবী' 'আয়্যাম (রহ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন।[৪]

ফিক্হ শাস্ত্রেও তিনি অতি উঁচু স্থানের অধিকারী ছিলেন। খলীফা ইবন খায়্যাত বলেন : তিনি বসরার সেই পাঁচজন ফকীহ্র মধ্যে গণ্য ছিলেন যাঁদেরকে তাঁদের যুগের ফকীহ বলে মানা হতো।[৫]

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৮/৯৫; তাবি'ঈন-৪৭৮

২. আত-তাবাকাত-৭/১৩৭; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৯৫

৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১৪০

৪. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৯৪

৫. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৯৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৯৫

নৈতিক গুণাবলী

'ইল্‌মের তুলনায় তাঁর 'আমল ছিল বেশী। ইবন সা'দ তো তাঁকে একজন 'আবিদ ও আল্লাহ্‌ ভীরু বলেছেন। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি বসরার ইবাদতকারী মহান ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন।[৬]

তিনি মনে করতেন, আল্লাহর প্রতি ঈমানের জন্য অপরিহার্য হলো তাঁর অপছন্দের সকল কথা-কাজ পরিহার করা। তিনি বলতেন, আমার বুঝে আসে না যে, বান্দা যদি আল্লাহর অপছন্দের সবকিছু ছেড়ে না দেয় তাহলে তার ঈমান কোন কাজে আসবে?[৭]

নামাযে আগ্রহ ও একাগ্রতা

তাঁর নামাযে এক বিশেষ অবস্থা ও তন্ময়ভাবের সৃষ্টি হতো। তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন এমন মনে হতো যে, তাঁর ওপর আলোকধারা নামছে। ইবন 'আওন বলেন, যখন তিনি নামাযের মধ্যে থাকতেন তখন তাঁকে প্রাণহীন কাঠের মত মনে হতো, শরীর ও কাপড়-চোপড় একটুও নড়াচড়া করতো না। নামাযরত অবস্থায় যত মারাত্মক ও ভয় পাইয়ে দেওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হোক না কেন সে ব্যাপারে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়াই থাকতো না। একবার তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় পাশেই আগুন লাগে এবং অল্পক্ষণ পরে নিভেও যায়; কিন্তু তিনি মোটেও টের পাননি।[৮]

অসুস্থতার কারণে মানুষ যখন একেবারেই অপারগ হয়ে যায় সে সময় ছাড়া আর কোন অবস্থায় বসে নামায আদায় করা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার জনৈক ব্যক্তি নৌকায় বসে বসে নামায আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, এ আমার মোটেই পছন্দ নয় যে, কোন রোগ ছাড়া আল্লাহ্‌ আমাকে বসা অবস্থায় নামাযে দেখুক। নামাযের দিকে আহ্বানের এত গুরুত্ব দিতেন যে, যদি বহু দূর থেকেও আযানের ধ্বনি কানে ভেসে আসতো, সেই মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন। একবার তিনি কোন এক মসজিদ থেকে ফিরছেন। কিছু দূর যাওয়ার পর আযানের ধ্বনি কানে ভেসে এলো। তিনি আবার সেই মসজিদে ফিরে গেলেন। মুয়াযযিন জিজ্ঞেস করলো, আপনি আবার ফিরে এলেন কেন? বললেন : তুমিই তো ফিরিয়ে আনলে।[৯]

মসজিদের খিদমত ছিল তাঁর বিশেষ কাজ। মসজিদে তিনি বাতি জ্বালাতেন। এ কারণে লোকেরা তাঁকে مسلم المُصْبِحُ (বাতি প্রজ্জ্বলনকারী মুসলিম) বলতো।[১০]

সুন্নাহর অনুসরণ

সুন্নাহর অনুসরণের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। অতি মামুলি ধরনের সুন্নাতও ছুটে যেতে পারতো না। শুধু একটি সুন্নাতের অনুসরণ হবে এ চিন্তায় জুতাপরা অবস্থায় নামায আদায় করতেন। তিনি বলতেন, জুতা খোলা আমার জন্য খুবই সহজ কাজ, কিন্তু

---

৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/১৪১

৭. আত-তাবাকাত-৭/১৩৬

৮. প্রাগুক্ত-৭/১৩৫

৯. প্রাগুক্ত-৭/১৩৬

১০. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/১৪০; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৯৫

শুধুমাত্র সুন্নাতের অনুসরণ হবে এ চিন্তায় জুতো পরা অবস্থায় নামায আদায় করি। হযরত রাসূলে কারীম (সা) খোরমা দিয়ে ইফতার করতেন। এ কারণে খোরমা দিয়েই তাঁর ইফতার হতো।[১১]

কুরআনের প্রতি সম্মান

আল্লাহর কিতাব আল-কুরআনের প্রতি এত বেশী সম্মান প্রদর্শন করতেন যে, যে হাত দিয়ে কুরআন ধরতেন সে হাত দিয়ে নাজাসাতের স্থান স্পর্শ করতেন না। বলতেন, আমি ডান হাত দিয়ে যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা খারাপ কাজ মনে করি। কারণ, ঐ হাত দিয়ে আমি কুরআন ধরি।

রিয়া তথা প্রদর্শনীমূলক মনোভাবকে তিনি মূর্খতা ও শয়তানের মন্ত্র বলে মনে করতেন। বলতেন, তোমরা আত্মপ্রদর্শনী থেকে দূরে থাক। কারণ, তা একজন 'আলিমকে মূর্খের পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং তার মাধ্যমেই শয়তান ভুল পথে চালিত করে।[১২]

তিনি অত্যন্ত ধীর-স্থির ও সহনশীল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রাগের সময়ও মুখ থেকে অসমীচীন কথা উচ্চারিত হতো না। কখনো কাউকে গালি দেননি। সর্বাধিক উত্তেজিত অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে যে কথাটি উচ্চারিত হতো তা হলো : "এখন আমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নাও।" একথা উচ্চারিত হলে মানুষ বুঝে যেত তিনি তাঁর রাগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন।

এত ধীর-স্থির ও ধৈর্য-সহনশীল হওয়ার কারণে সকল হৈ-হাঙ্গামা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে তিনি দারুণ অপছন্দ করতেন। সে সময় মুহাম্মাদ ইবন আল-আশ'আছের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাতে অনেক উঁচু স্তরের তাবি'ঈ জড়িয়ে পড়েন। অন্যদের মত মুসলিমও তাতে অংশ গ্রহণ করেন। তবে তিনি কারো উপর তরবারি উঠাননি। শুধু এই অংশ গ্রহণের জন্য পরবর্তীতে অনুশোচনায় জর্জরিত হন। আবূ কিলাবা বলেন, একবার মক্কার সফরে আমি ও মুসলিম এক সাথে ছিলাম। তখন একদিন তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-আশ'আছের বিদ্রোহের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : আলহামদু লিল্লাহ, আমি এই বিশৃঙ্খলায় না একটি তীর ছুড়েছি, না তরবারি চালিয়েছি, আর না একটি বর্শা নিক্ষেপ করেছি। আমি বললাম, কিন্তু আপনি বলুন তো, ঐ সকল লোকদের পরিণতি কি হবে যারা আপনাকে সারিতে দাঁড়ানো দেখে বলেছিল, মুসলিম ইবন ইয়াসার এই যুদ্ধে আছেন এবং তিনি কোন অন্যায় কাজে যুক্ত হতে পারেন না এবং এই বিশ্বাসে তারা যুদ্ধ করে মারা গেছে? আমার একথা শুনে তিনি ব্যাকুলভাবে কাঁদতে থাকেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে আমি লজ্জিত হলাম, তাঁকে এমন কথা বলার জন্য।[১৩]

ওফাত

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতকালে হিজরী ১০০ অথবা ১০১ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৪]

---

১১. আত-তাবাকাত-৭/১৩৬

১২. প্রাগুক্ত

১৩. প্রাগুক্ত-৭/১৩৭

১৪. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৯৫

মিস'আর ইবন কিদাম (রহ)

হযরত মিস'আরের (রহ) ডাকনাম আবূ সালামা। পিতা কিদাম ইবন জুহাইর। কুরায়শ গোত্রের আল-'আমিরী শাখার সন্তান এবং কূফার অধিবাসী।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি জ্ঞান ও ধর্মচর্চা উভয় দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে ছিলেন। ইয়া'লা বলেন :[২] كان مسعر قد جمع العلم والورع – "মিস'আর জ্ঞান ও ধার্মিকতার সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন।" ইরাকে তাঁর সমকক্ষ 'আলিম খুব কমই ছিলেন। হিশাম ইবন 'উরওয়া (রহ) বলেন, মিস'আর ও আইউবের চেয়ে উত্তম কেউ আমাদের এখানে আসেনি।[৩] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদার ব্যাপারে সকলে একমত।[৪]

হাদীছ

তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে একজন হাফিজ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবন বিশর বলেন :[৫] كان عند مسعر نحو ألف حديث فكتبتها سوى عشرة - "মিস'আরের নিকট প্রায় এক হাজার হাদীছ ছিল। আমি দশটি ছাড়া সবই লিখেছি।" তিনি 'আমর ইবন সা'ঈদ নাখা'ঈ, আবূ ইসহাক আস-সুবায়'ঈ, সা'ঈদ ইবন ইবরাহীম, ছাবিত ইবন 'উবায়দুল্লাহ আল-আনসারী, 'আবদুল মালিক ইবন নুমাইর, হিলাল ইবন জানাব, হাবীব ইবন আবী ছাবিত, 'আলকামা ইবন মারছাদ, কাতাদা, মা'আন ইবন 'আবদির রহমান, মিকদাম ইবন শুরায়হ, আল-আ'মাশ, 'আদী ইবন ছাবিত, আল-হাকাম ইবন 'উতায়বা (রহ)সহ বিশাল সংখ্যক মুহাদ্দিছের নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন।[৬]

তাঁর বর্ণিত হাদীছের মান

তাঁর বর্ণনাসমূহের বিশুদ্ধতার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, হযরত শু'বার মত বিখ্যাত মুহাদ্দিছ তাবি'ঈ বলেন :[৭]

كنا نسمي المصحف من اتقانه. – "তাঁর দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের কারণে আমরা

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৮; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫১

২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৯

৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১১৪

৪. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৮৯

৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৮

৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১১৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫১

৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৮

মিস'আরকে মাসহাফ বলতাম।" তাঁর ব্যক্তি সত্তা ছিল হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের মাপকাঠি। এ কারণে তাঁর উপাধি হয়ে যায় "মীযান" বা পাল্লা।[৮] আল-খুরায়বী বলেন :[৯]

ما من أحد الا وقد أخذ عليه إلا مسعر.

"খুব কম মুহাদ্দিছ এমন পাওয়া যাবে যাঁদের বর্ণনাসমূহ কোন না কোনভাবে সমালোচিত হয়নি। তবে মিস'আর এর ব্যতিক্রম।" হাদীছের ইমামগণ সন্দেহ ও মত পার্থক্যের স্থানে তাঁরই শরণাপন্ন হতেন। সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) বলেন, যখন হাদীছের কোন বিষয়ে আমাদের মধ্যে মত পার্থক্য হতো তখন আমরা মিস'আরকে জিজ্ঞেস করতাম।[১০] ইবরাহীম ইবন সা'দ বলতেন, যখন কারো ব্যাপারে সুফইয়ান ও শু'বার মধ্যে মত পার্থক্য হতো তখন তাঁরা মীযান মিস'আরের নিকট যেতেন।

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর এত জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীছ বর্ণনায় খুব বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতেন। তিনি এ দায়িত্ব পালনে এত ভয় পেতেন যেন তাঁর মাথার উপর কাঁচের বোঝা রয়েছে। একটু অসতর্ক হলেই তা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে। ইবন 'উয়ায়না বলেন, আমি মিস'আরকে একথা বলতে শুনেছি :[১১]

وددت أن الحديث كان قوارير على رأسي فسقطت فتكسرت.

আমি চেয়েছি, হাদীছ যদি আমার উপর কাঁচের বোঝার মত হতো, যা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যায়। অর্থাৎ কারো মাথায় কাঁচের বোঝা থাকলে সে যেমন তা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকে, তাই সব সময় সাবধানতা অবলম্বন করে। তেমনি তিনি হাদীছকে কাঁচ মনে করেছেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। তাঁর এমন মাত্রাতিরিক্ত সাবধানতা সন্দেহের পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। আবূ নু'আইম বলেন, মিস'আর তাঁর হাদীছসমূহের ব্যাপারে বড় সন্দেহপরায়ণ ছিলেন। তবে তিনি কোন ভুল করতেন না। আল-আ'মাশ বলতেন, মিস'আরের শয়তান তাঁকে দুর্বল করে তাঁর মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে থাকে।[১২]

তাঁর এই সন্দেহ তাঁর হাদীছসমূহের মান এত বাড়িয়ে দেয় যে, হাদীছ বিশারদগণ তাঁর সন্দেহকে দৃঢ় প্রত্যয়ের মর্যাদা দিতেন। লোকেরা আ'মাশকে বললো, মিস'আর তো তাঁর নিজের বর্ণিত হাদীছসমূহে সন্দেহ পোষণ করেন। তিনি তাদেরকে বলেন : شكه كيقين غيره – "তার সন্দেহ অন্যদের দৃঢ় প্রত্যয়ের মত।" এমন কথা ইমাম আল-ওয়াকী'ও বলেছেন। তবে ইয়াহইয়া আল-কাত্তান বলেন : ما رأيت أثبت من مسعر – "আমি মিস'আরের চেয়ে বেশী বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল আর কাউকে দেখিনি।"[১৩]

---

৮. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১১৪

৯. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৮

১০. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৮৯

১১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৯

১২. তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫১

১৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৮

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি যদিও কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না, তবুও কূফার মুফতীগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন।[১৪]

দারসের আসর

মসজিদে তাঁর দারসের আসর ছিল। সালাত আদায়ের পর নিয়ম অনুযায়ী মসজিদে বসে যেতেন এবং হাদীছ শুনতে আগ্রহী লোকেরা বৃত্তাকারে তাঁর চার পাশে বসে যেতেন।[১৫] তাঁর সূত্রে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, মুহাম্মাদ ইবন বিশর, ইয়াহইয়া ইবন আদম, আবূ নু'আইম, খাল্লাদ ইবন ইয়াহইয়া, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক, ইয়াযীদ ইবন হারূন, শু'বা আল-হাজ্জাজ, মালিক ইবন মিগওয়াল, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবন বিশর (রহ) ও আরো অনেকে।[১৬]

'ইবাদত-বন্দেগী

তাঁর মা ছিলেন একজন উঁচুস্তরের 'আবিদা। তাঁর পুণ্যময় তত্ত্বাবধানের গভীর প্রভাব পড়ে ছেলের উপর। মা সব সময় মসজিদে সালাত আদায় করতেন। মা ও ছেলে দু'জন অধিকাংশ সময় এক সাথে মসজিদে যেতেন। একটা পশমী চাদর মিস'আর হাতে করে নিতেন এবং মসজিদে পৌঁছে সেটা মা'র বসার জন্য বিছিয়ে দিতেন। তার ওপর দাঁড়িয়ে মা সালাত আদায় করতেন। আর মিস'আর সামনের সারিতে চলে যেতেন এবং সালাত শেষ করে একটি স্থানে বসে যেতেন। তাঁকে ঘিরে হাদীছের জ্ঞান অর্জনে উৎসাহী ছাত্ররা বসে যেত। তিনি তাঁদেরকে হাদীছ শোনাতেন। এর মধ্যে তাঁর মা 'ইবাদত ও যিক্‌র-আযকার শেষ করতেন। আর মিস'আর তাঁর দার্‌স (পাঠদান) শেষ করে মা'র কাছে এসে তাঁর চাদরটি উঠিয়ে মাকে সংগে নিয়ে ঘরে ফিরতেন। তাঁর মাত্র দু'টি ঠিকানাই ছিল; ঘর অথবা মসজিদ।[১৭] অতিরিক্ত 'ইবাদতের কারণে কপালে দাগ হয়ে গিয়েছিল। খালিদ ইবন 'আমর বলেন :[১৮]

رأيت مسعرًا كأن جبهته ركبة عنز من السجود.

"আমি মিস'আরকে দেখেছি, অতিরিক্ত সিজদার কারণে তাঁর কপাল ছাগলের হাঁটুর মত হয়ে গেছে।"

---

১৪. ই'লাম আল-মুওয়াক্‌কি'ঈন-১/২৮

১৫. আত-তাবাকাত-৬/২৫৩

১৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৮৮; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৫২

১৭. আত-তাবাকাত-৬/২৫৩-২৫৪

১৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৮৮

প্রতিদিন অর্ধেক কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ বলেন :[১৯]

كان أبى لا ينام إلا أن يقرأ نصف القرآن.

"আমার আব্বা অর্ধেক কুরআন পাঠ না করে ঘুমোতেন না।"

তিনি কোন একটি স্তরে পৌছে থেমে যেতেন না। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার ধাপ সর্বদাই উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকতো। মা'আন বলেন :[২০]

ما رأيت مسعرا إلا يزداد كل يوم خيرا.

"আমি মিস'আরকে প্রতি দিনই শুভ ও কল্যাণে কেবল উন্নতিই করতে দেখেছি।" তিনি 'ইবাদত-বন্দেগী, আধ্যাত্মিক সাধনা ও নৈতিক গুণাবলীতে এমন উচ্চতর পর্যায়ে পৌছে যান যে, তাঁর জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে মানুষের কোন সন্দেহ ছিল না। যেমন আল-হাসান ইবন 'আম্মারা বলেন :[২১]

إن لم يدخل الجنة مثل مسعر فإن أهل الجنة لقليل.

"যদি মিস'আরের মত মানুষ জান্নাতে না যান তাহলে তো জান্নাতবাসীদের সংখ্যা অতি অল্পই হবে।"

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক (রহ) অথবা তাঁর মত অন্য কেউ হযরত মিস'আরের (রহ) আদত-অভ্যাস ও নৈতিক গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে একটি কবিতায় তা তুলে ধরেন। তার দু'টি চরণ নিম্নরূপ :[২২]

من كان ملتمسا جليسا صالحا + فليأت حلقة مسعر بن كدام

فيها السكينة والوقار وأهلها + أهل العفاف وعليه الأقوام.

"কেউ যদি সৎ সঙ্গী সন্ধান করে, সে যেন মিস'আর ইবন কিদামের আসরে আসে।

সেখানে আছে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য এবং এর সদস্যরা হলো পূতঃপবিত্র এবং জাতির উঁচু স্তরের মানুষ।"

পার্থিব ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি উদাসীনতা

দুনিয়া ও এর শান-শওকতের প্রতি একেবারেই উদাসীন ও বেপরোয়া ছিলেন। রাষ্ট্রীয় কোন পদের প্রতি কখনো চোখ তুলে তাকাননি। একবার মহা প্রতাপশালী আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর তাঁকে কোন একটি অঞ্চলের ওয়ালীর পদে নিয়োগ দিতে চান। তিনি বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা তো আমাকে দুই দিরহামের বাজার করারও যোগ্য মনে করে না। তারা বলে, আমরা তোমার দুই দিরহামের কিছু ক্রয় করাও

---

১৯. প্রাগুক্ত-১/১৮৯; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১০৪

২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৯

২১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৮

২২. প্রাগুক্ত-১/১৮৯-১৯০

পছন্দ করিনে। আর আপনি আমাকে ওয়ালীর পদে নিয়োগ দিতে চান? আল্লাহ্ আপনাকে ঠিক কাজ করার শক্তি দিন। আপনার সংগে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, তাই আমি কিছু বলতে পারছি। খলীফা আবূ জা'ফার তাঁর এই আপত্তি মেনে নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।[২৩]

তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল স্বভাবের মানুষ ছিলেন। অন্যের আবেগ-আগ্রহের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন। কেউ যখন তাঁকে একটি হাদীছ শোনাতো যা তাঁর আগেই জানা থাকতো তখন কেবল সেই লোকটির সন্তুষ্টি ও হাদীছের মর্যাদার খাতিরে চুপ করে শুনে যেতেন, যেন হাদীছটি তিনি পূর্বে কখনো শোনেননি।[২৪]

ওফাত

তিনি হিজরী ১৫৫ মতান্তরে ১৫৩ সনে কূফায় ইনতিকাল করেন।[২৫]

মুস'আব ইবন আল-মিকদাম বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) স্বপ্নে দেখলাম। সুফইয়ান রাসূলের (সা) একটি হাত ধরে আছেন এবং এ অবস্থায় দু'জন কা'বা তাওয়াফ করছেন। সুফইয়ান রাসূলকে (সা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! মিস'আর কি মৃত্যু বরণ করেছেন? বললেন : হাঁ, তাঁর মৃত্যুতে আসমানবাসীরা সুসংবাদ লাভ করেছে।[২৬]

---

২৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১০৪; প্রাগুক্ত-১/১৮৯

২৪. আত-তাবাকাত-৬/২৫৩

২৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৯০; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫১

২৬. তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫৪

মুতার্‌রিফ ইবন 'আবদিল্লাহ্ ইবন আশ-শিখ্‌খীর (রহ)

হযরত আবূ 'আবদিল্লাহ মুতার্‌রিফের (রহ) বংশধারা এরূপ :

مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير بن عوف بن كعب بن وفدان بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه.

'আবদুল্লাহ তাঁর পিতা ও আশ-শিখ্‌খীর দাদা। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় তাঁর জন্ম। কিন্তু অল্প বয়স অথবা দূরে অবস্থানের কারণে মহানবীর সাক্ষাৎ ও সাহচর্যের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যান।[১] ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল্লাহ্ আশ-শিখ্‌খীর ও হানী ইবন 'আবদিল্লাহ আশ-শিখ্‌খীর তাঁর দু'ভাই।[২]

জ্ঞান অর্জন

জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর ছিল তীব্র আবেগ ও আগ্রহ। জ্ঞানের গুণ-ফযীলতকে 'ইবাদতের গুণ-ফযীলতের উপর প্রাধান্য দিতেন।[৩] এই প্রবল আগ্রহ ও আবেগ তাঁকে জ্ঞানীদের উচ্চাসনে বসায়। খোদাভীতি, ভদ্রতা, শিষ্টাচারিতা তথা যাবতীয় নৈতিক গুণ ও উৎকর্ষে ছিলেন আদর্শ স্থানীয়। ইবন সা'দ বলেন, তাঁর ব্যক্তি সত্তায় খোদাভীতি, মহৎ গুণ, বর্ণনা ক্ষমতা, প্রজ্ঞা ও সাহিত্য প্রতিভা ইত্যাদি গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি তাঁকে বসরার মনীষীদের তৃতীয় তবকায় স্থান দিয়েছেন।[৪] ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি 'ইল্‌ম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের চূড়া সমতুল্য ছিলেন। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে মানুষের অন্তরে বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৫]

হাদীছ

তাঁর সময়ে বিশাল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম (রা) জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁদের জ্ঞানের ঝর্ণাধারা থেকে পরিতৃপ্ত হন। হযরত 'উছমান, 'আলী, আবূ যার, 'আম্মার ইবন ইয়াসির, 'আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্‌ফাল, 'উছমান ইবন আবিল 'আস, 'ইমরান ইবন হুসাইন, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান (রা) প্রমুখ উঁচু মর্যাদার সাহাবায়ে কিরামের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভে যাঁরা ধন্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন : তাঁর ভাই আবুল 'আলা' ইয়াযীদ, ভাতীজা 'আবদুল্লাহ্

---

১. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/১৭৪

২. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/১৪৩

৩. আত-তাবাকাত-৭/১০৩

৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/১৪৩

৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৫

ইবন হানী এবং হাসান আল-বসরী, হুমায়দ ইবন হিলাল, আবূ নাসর, গায়লান ইবন জারীর, সা'ঈদ ইবন আবী হিন্দ, মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি', আবুত তায়য়াহ, ছাবিত আল-বানানী, 'আবদুল কারীম ইবন রুশাইদ, সা'ঈদ আল-হারীরী, আবূ সালামা, সা'ঈদ ইবন ইয়াযীদ (রহ) ও আরো অনেকে।[৬] ফিক্হ শাস্ত্রেও তাঁর পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন বসরার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফতী।[৭]

তাঁর এই জ্ঞান ও মনীষার তুলনায় তাঁর আমল, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি নির্মোহ ভাব এবং খোদাভীরুতার পাল্লা ভারী ছিল। ইবন সা'দ তাঁকে অত্যধিক আল্লাহ ভীরু লোকদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] 'আজলী তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ এবং সত্যনিষ্ঠ মানুষ বলেছেন। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি ছিলেন বসরার একজন 'আবিদ ও যাহিদ (তাপস ও দুনিয়া বিরাগী) মানুষ।[৯]

দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা পরিহার

তাঁর এমন দুনিয়া বিরাগী মনোভাব ও আল্লাহ ভীরুতার কারণে তিনি সব ধরনের হৈ-হাঙ্গামা ও বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলাকে দারুণ ভয় করতেন। এ জাতীয় কাজকে তিনি একটা পরীক্ষা বলে মনে করতেন। বলতেন, ফিতনা-ফাসাদ পথ প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং ঈমানদার ব্যক্তিকে তার নিজের নফসের সংগে সংঘাত-সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়ার জন্য মাথা তুলে দাঁড়ায়। তাঁর জীবনকালে বড় বড় বিপ্লব ও ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তিনি সবকিছু থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে রেখেছেন। সাধারণতঃ ফিতনা-ফাসাদের সময় তিনি সে স্থান ত্যাগ করে কোন অজ্ঞাত স্থানে চলে যেতেন। যদি যাওয়ার সুযোগ না পেতেন তাহলে ঘরে চুপ করে বসে থাকতেন। এমনকি জুম'আ ও জামা'আতের জন্যও বের হতেন না। 'উকবা বলেন, আমি মুতাররিফের ভাই ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, ফিতনা বা বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো তখন মুতাররিফ কী করতেন? তিনি বললেন, ঘরের অভ্যন্তরে একেবারে নির্জনবাস অবলম্বন করতেন।

আর যতদিন বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলার অগ্নিশিখা প্রশমিত না হতো ততদিন তিনি মানুষের জুম'আ ও জামা'আতে শরীক হতেন না। অন্যদেরকেও তিনি এই ফিতনা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। হযরত কাতাদা (রহ) বলেন, যখন কোন ফিতনা-ফাসাদ দেখা দিত তখন মুতাররিফ মানুষকে তাতে জড়িত হতে বাধা দিতেন এবং নিজে কোথাও পালিয়ে যেতেন। হাসান আল-বাসরীও মানুষকে বাধা দিতেন, তবে তিনি স্থান ত্যাগ করতেন না। এ কারণে মুতাররিফ তাঁর সম্পর্কে বলতেন, হাসান আল-বাসরী সেই ব্যক্তির মত যে মানুষকে প্লাবন থেকে সতর্ক করে, কিন্তু নিজে তার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে।[১০]

---

৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১৭২; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/১৪৩
৭. ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/৬৭
৮. আত-তাবাকাত-৭/১০৩
৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১৭৩
১০. আত-তাবাকাত-৭/১০৩

চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতার কারণে তিনি সেই সব সংঘাত-সংঘর্ষের অবস্থা সম্পর্কেও কোন কিছু জানতে চাইতেন না। 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়র (রা) ও বানূ উমাইয়্যাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁর সময়ে হয়। তিনি এই বিরোধের কথা কারো কাছে কিছুই জানতে চাইতেন না। মানুষ যেহেতু তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে অবহিত ছিল এ কারণে তারাও তাঁর সামনে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করতো না।[১১]

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ও 'আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে 'আবদুর রহমান ইবন আল-আশ'আছ যে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন তাতে অনেক বড় বড় সাহাবী অংশ গ্রহণ করেন। মানুষ মুতাররিফকেও অংশ গ্রহণের জন্য চাপ দিতে থাকে, কিন্তু তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন : তোমরা যে জিনিসে অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছো তা কি "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ থেকেও উত্তম হবে?" লোকেরা বললো : না। তিনি বললেন, তাহলে আমি ধ্বংসের মধ্যে পতিত হওয়া এবং সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের মধ্যে জুয়া খেলতে চাই না। অর্থাৎ সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ যুদ্ধে জড়াতে চাই না। শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন তাঁর পছন্দ ছিল। বলতেন, শান্তি ও নিরাপদ জীবন লাভ করে শুকরিয়া আদায় করা বিপদ-মুসীবতে ধৈর্য ধারণের চেয়ে আমার নিকট বেশী পছন্দের।[১২] আল-'ইজলী' বলেন, ইবন আল-আশ'আছের ফিত্না থেকে বসরার মাত্র দু'ব্যক্তি রক্ষা পেয়েছিলেন। তারা হলেন : মুতাররিফ ও মুহাম্মাদ ইবন সীরীন।[১৩]

'আকীদা-বিশ্বাস

'আকীদার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন এবং তা সংরক্ষণের জন্য ভীষণ যত্নবান ছিলেন। একবার খারিজীদের একটি উপদল তাঁর নিকট আসে এবং তাদের আকীদাসমূহ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানায়। তিনি তাদেরকে বলেন, যদি আমার দু'টি অন্তর থাকতো তাহলে একটিতে তোমাদের 'আকীদাসমূহ স্থান দিতাম এবং অন্যটি সংরক্ষণ করতাম। তোমরা যা বলছো তা যদি সঠিক হতো তাহলে দ্বিতীয়টি দিয়ে তোমাদের অনুসরণ করতাম। আর যদি ভুল হতো তাহলে একটি ধ্বংস হলেও অন্যটি তো রক্ষা পেত। কিন্তু অন্তর তো মাত্র একটি। এ কারণে আমি তাকে ধোঁকা ও প্রতারণার কাজে লাগাতে পারিনে।[১৪]

যদিও তিনি একজন বড় দুনিয়া বিরাগী খোদাভীরু মানুষ ছিলেন, তাই বলে অদৃষ্টবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কর্মবাদী মানুষ। এ পৃথিবী কার্যকারণ– বিশ্ব বলে জানতেন। তাই বলতেন, এটা বৈধ নয় যে, কোন ব্যক্তি কোন উঁচু স্থান থেকে নিজেকে নীচে ফেলে দিয়ে বলে যে, আল্লাহ আমার তাকদীর এভাবেই নির্ধারণ করেছেন। বরং মানুষের উচিত

---

১১. প্রাগুক্ত-৭/১০৪

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/১৪৩

১৪. আত-তাবাকাত-৭/১০৪; তাবি'ঈন-৪৮৪

বেঁচে থাকা এবং চেষ্টা করা। যদি সকল সতর্কতা ও চেষ্টা-সাধনা সত্ত্বেও তার কোন ক্ষতি হয় অথবা তার উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তাহলে তাকে আল্লাহর তাকদীর বলে বিশ্বাস করা উচিত। আল্লাহর তাকদীর ছাড়া কোন বিপদ-মুসীবত আপতিত হতে পারে না।[১৫] এ কারণে তিনি "তাঊন" (প্লেগ) জাতীয় কোন মহামারী দেখা দিলে জনসমাগমের স্থান থেকে দূরে সরে যেতেন।[১৬]

তাঁর এমন কিছু কথা আছে যা গভীর ভাব ও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলতেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে 'আকল তথা বুদ্ধির চেয়ে ভালো আর কোন জিনিষ দেয়া হয়নি। মানুষের বুদ্ধি তাঁর যুগ ও কাল অনুযায়ী হয়। নিজের খাবার এমন ব্যক্তিকে খাওয়াবে না যার খাওয়ার রুচি নেই।[১৭] অর্থাৎ অহেতুক কোন কিছু বিনষ্ট করবে না।

পার্থিব জাঁকজমক

এ পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষের খাদ্য-খাবারের জন্য যা কিছু দান করেছেন তা ভোগ করা তিনি দোষের কিছু মনে করতেন না। বিশাল ধন-সম্পদ তিনি লাভ করেছিলেন। তাই তিনি বেশ জাঁকজমক ও সম্মানের জীবন যাপন করতেন। ইমাম যাহাবী (রহ) লিখেছেন, মুতাররিফ একজন নেতা ও উঁচু মর্যাদার মানুষ ছিলেন। অতি উন্নত মানের পোশাক পরতেন, শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের দরবারে যাতায়াত করতেন।[১৮] তবে তাঁর এই বাহ্যিক জাঁকজমক তাঁর নৈতিক মানের উপর কোন রকম প্রভাব ফেলতো না। গায়লান ইবন জারীর বলেন, 'তিনি বারানুস (برانس) নামক এক প্রকার টুপি ও মাতারিফ (مطارف) নামক এক বিশেষ ধরনের দামী চাদর পরতেন। ঘোড়ায় চড়তেন এবং শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী আমীর-উমারাদের নিকট যেতেন। তবে তাঁর এই শান-শওকতের জীবনধারা সত্ত্বেও তুমি তাঁর নিকট গেলে তোমার অন্তর ও দৃষ্টিতে প্রশান্তির ভাব সৃষ্টি হবে।'[১৯]

ওফাত

হিজরী ৯৫ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[২০] মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। তিনি পুত্রকে ডেকে কুরআনের অসীয়াতের আয়াতটি পাঠ করে শোনান। পুত্র দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে ডাক্তার ডেকে আনে। ডাক্তারকে দেখে বলেন : তিনি কে? পুত্র বলে : ডাক্তার। তিনি ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বলেন : আমি কঠোরভাবে নিষেধ করছি, আমাকে যেন ঝাড়-ফুঁক করা না হয়, আমার

---

১৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৪
১৬. আত-তাবাকাত-৭/১০৫
১৭. প্রাগুক্ত-৭/১০৪
১৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৫
১৯. আত-তাবাকাত-৭/১০৫
২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৫; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/১৪৪

গায়ে যেন তাবীজ-কবজ ঝোলানো না হয়। তারপর পুত্রকে কবর তৈরির নির্দেশ দেন। সে নির্দেশমত কবর তৈরি করে। তারপর তিনি বলেন, আমাকে কবরের নিকট নিয়ে চলো। সেখানে নেয়া হয়। তিনি কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে দু'আ করেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২১]

তিনি বলতেন :[২২]

إن هذا الـموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيما لاموت فيه.

'এই মৃত্যু বিত্ত-বৈভবের মালিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তালাশ কর যাতে মৃত্যু নেই।'

গায়লান ইবন জারীর বলেন, একবার কোন একটি ব্যাপার নিয়ে এক ব্যক্তির সাথে মুতার্‌রিফের কিছু কথা কাটাকাটি হয়। লোকটি মুতার্‌রিফের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। সাথে সাথে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে যায় এই বদ-দু'আ :

اللـهم إن كـان كاذبًـا فأمتـه. – 'হে আল্লাহ! যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার মরণ দাও।' লোকটি সেখানেই ঢলে পড়ে এবং মারা যায়। ব্যাপারটি যিয়াদের দরবার পর্যন্ত গড়ালো। যিয়াদ তাঁকে বললেন : আপনি লোকটিকে মেরে ফেললেন? মুতার্‌রিফ বললেন : না, আমি মারিনি। তবে আমার দু'আ তার নির্ধারিত সময়ের সাথে মিলে গেছে।[২৩]

---

২১. আত-তাবাকাত-৭/১০৬; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৪

২২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৫

২৩. প্রাগুক্ত-১/৬৪; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/১৪৫-১৪৬

মায়মূন ইবন মিহ্‌রান (রহ)

হযরত মায়মূনের (রহ) ডাকনাম আবূ আইউব। পিতা মিহ্‌রান ছিলেন বানূ নাসর ইবন মু'আবিয়ার মুকাতিব দাস। যে দাস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ মনিবকে দিয়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে বলে মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় তাকে মুকাতিব দাস বলে। মায়মূন হিজরী ৪০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। কূফার আয্‌দ গোত্রের এক মহিলার দাস হিসেবে তাঁর জীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে ঐ মহিলা তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। কূফায় বেড়ে ওঠেন এবং পরবর্তীতে 'রাক্কা' চলে যান। একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) এক প্রশ্নের জবাবে মায়মূন বলেন, আমার মা ছিলেন আয্‌দ গোত্রের দাসী, আর বাবা ছিলেন বানূ নাসর ইবন মু'আবিয়ার মুকাতিব। আমার জন্মের সময়ও তিনি মুকাতিব ছিলেন। কাছীর ইবন হিশাম বলেন, সা'ঈদ ইবন জুবায়রের মেয়ে ছিলেন মায়মূনের স্ত্রী।[১]

জাযীরায় অবস্থান

দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের পর দীর্ঘদিন কূফাতেই অবস্থান করেন। হিজরী ৮০ সনে যখন 'আবদুর রহমান ইবন আল-আশ'আছের বিদ্রোহের কারণে কূফায় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন তিনি কূফা ছেড়ে জাযীরায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।[২]

বায়তুল মাল রক্ষকের পদে

মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান যখন খুরাসানের ওয়ালী তখন তিনি তথাকার বায়তুল মালের রক্ষকের পদে মায়মূনকে নিয়োগ করেন।

খারাজের পদে

বায়তুল মালের রক্ষণাবেক্ষণের ধারাবাহিকতায় অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি যথেষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ কারণে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁকে আল-জাযীরার খারাজ (খাজনা-ট্যাক্স) বিষয়ক দফতরের দায়িত্ব দেন এবং তাঁর পুত্র 'উমারকে উক্ত দফতরের হিসাব রক্ষকের পদে নিয়োগ করেন। স্বভাবগতভাবেই মায়মূন সব ধরনের রাষ্ট্রীয় পদ, বিশেষতঃ অর্থ বিষয়ক দায়িত্ব দারুণ অপছন্দ করতেন। তবে সে সময় তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারেননি। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর

---

১. তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৮/৫৪৫-৫৪৬

২. প্রাগুক্ত-১৮/৫৪৬

পদত্যাগ গ্রহণ করেননি। তিনি মায়মূনকে লেখেন, এই পদের দায়িত্ব তো এতটুকুই যে, বৈধ পন্থায় অর্থ আদায় করবে এবং বৈধ খাতগুলোতে তা ব্যয় করবে। এ কাজে পদ ত্যাগের কি কারণ থাকতে পারে? আর একটু কষ্ট হলেই যদি মানুষ সবকিছু ছেড়ে দেয় তাহলে দীন ও দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা টিকবে কেমন করে।[৩] 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) এ লেখা পেয়ে তিনি পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে বহাল থেকে দায়িত্ব পালন করেন।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের খিলাফতকালের প্রথম কিছুদিন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এ কাজ তাঁর স্বভাবগতভাবেই অপছন্দ ছিল। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পীড়াপীড়িতে তা এই ভিত্তিতে মেনে নেন যে, তাঁর সময়ের রাষ্ট্রীয় সেবা মূলতঃ ইসলামের সেবা ছিল। তবে তাঁর পরে যখন খিলাফতের সকল বিভাগ পার্থিব রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপ ধারণ করে তখন তিনি বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন। ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের সময়ে যে দিনগুলো এ দায়িত্ব পালন করেন তার জন্য আফসোস করতেন। তিনি বলতেন, আমি অন্ধ হয়ে যেতাম তাও আমার জন্য ভালো ছিল, যদি না আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) ও অন্যদের দেয়া পদ গ্রহণ করতাম।[৪]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান মনীষায় তিনি শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ ও আল-জাযীরার উচ্চ পর্যায়ের 'আলিমদের মধ্যে ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম, নেতা ও আল-জাযীরার 'আলিম বলেছেন।[৫] তাঁর সমকালীন 'আলিমদের মধ্যে তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। আবুল মালীহ বলতেন, আমি মায়মূনের চেয়ে উত্তম কাউকে পাইনি।[৬] সুলায়মান ইবন মূসা বলেন, সেই আমলে চারজনকে বড় 'আলিম বলে মানা হতো। মায়মূন ইবন মিহ্রান তাঁদের একজন। অন্য তিনজন হলেন : মাকহূল, হাসান আল-বাসরী ও আয-যুহ্রী।[৭]

হাদীছ

তিনি হাদীছের হাফিজ ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন : كان ثقة قليل الحديث. – 'তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, অল্প সংখ্যক হাদীছের ধারক-বাহক।' সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি হযরত 'আবূ হুরায়রা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা), উম্মুদ দারদা' (রা) এবং তাবি'ঈদের মধ্যে হযরত নাফি' মাওলা ইবন 'উমার, মাকসাম মাওলা ইবন

---

৩. প্রাগুক্ত-১৮/৫৪৯-৫৫০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৭৪

৪. আত-তাবাকাত-৭/১৭৭-১৭৮; 'আসরুত তাবি'ঈন-৫২৫

৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮

৬. প্রাগুক্ত

৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/৩৯১; 'আসরুত তাবি'ঈন-৫২২

'আব্বাস (রা), ইয়াযীদ ইবন 'আসিম (রহ) প্রমুখের নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন।[৮]

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

হুমায়দ আত-তাবীল, আইউব আস-সাখতিয়ানী, জা'ফার ইবন বারকান, জা'ফার ইবন ওয়াহশিয়্যা, হাবীব ইবন শাহীদ, 'আলী ইবন হাকাম আন-নাবানী, হাকাম ইবন 'উতায়বা, আবূ ফারওয়া, ইয়াযীদ ইবন সিনান, হাজ্জাজ ইবন তামীম, সালিম ইবন আবিল মুহাজির, আবুল মালীহ (রহ) প্রমুখ তাঁর কীর্তিমান ছাত্র। আবূ 'আরূবা আল-হার্‌রানী তাঁকে আল-জাযীরার তাবি'ঈদের ১ম স্তরে স্থান দিয়েছেন।[৯]

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি আল-জাযীরার সকল 'আলিমের মধ্যে বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে আল-জাযীরার সকল অধিবাসীদের মধ্যে ফিক্‌হ ও ফাতওয়ায় শীর্ষ স্থানের অধিকারী বলেছেন।[১০] ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর দক্ষতার সবচেয়ে বড় সনদ এই যে, হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) মত বিচক্ষণ খলীফা আল-জাযীরার খারাজ বিভাগের দায়িত্বের পাশাপাশি কাজীর দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পণ করেন।[১১]

জ্ঞানের পাশাপাশি উন্নত নৈতিকতার অধিকারী ছিলেন। শরী'আত নিষিদ্ধ বস্তু ও বিষয় থেকে দূরে থাকার প্রতি দারুণ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর পুত্র বলেন, আব্বা মধ্যপন্থা থেকে বেশি রোযা-নামায করতেন না। তবে আল্লাহর অবাধ্যতাকে ভীষণ অপছন্দ করতেন।[১২] মাঝে মাঝে রাত-দিনে হাজার রাক'আত নফল নামাযও আদায় করতেন। একবার সতের দিনে সতের হাজার রাক'আত নফল নামায আদায় করেন। ১৮তম দিনে পেটে কোন ক্ষতের কারণে ইনতিকাল করেন।[১৩]

বিনীত ও বিনম্রভাব

এত বিনয় ও বিনম্র ছিলেন যে, কোন প্রকার অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার ভাব ফুটে ওঠে এমন আচরণ মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলে, আবূ আইউব! যতদিন আল্লাহ আপনাকে জীবিত রাখবেন ততদিন মানুষ সুখে থাকবে। এর জবাবে তিনি বলেন, এমন কথা উচ্চারণ করবে না। মানুষ ততদিন পর্যন্ত সুখে থাকবে যতদিন তারা তাদের প্রভুকে (রব) ভয় করতে থাকবে।[১৪]

---

৮. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/৩৯০; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯৮; তাহযীব আল-কামাল-১৮/৫৪৫

৯. প্রাগুক্ত

১০. আত-তাবাকাত-৭/১৭৮

১১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯৮

১২. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/৩৯১

১৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯৮; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৫৫৪

১৪. প্রাগুক্ত

হযরত 'আলীর (রা) উপর হযরত 'উছমানকে (রা) প্রাধান্য দান

জীবনের প্রথম পর্বে তিনি হযরত 'উছমানের (রা) বিপরীতে হযরত 'আলীকে (রা) প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) মুখে একটি যুক্তি শোনার পর তিনি হযরত 'উছমানের (রা) শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা হয়ে যান। একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এমন দু'ব্যক্তির মধ্যে কাকে বেশি পছন্দ কর, যাদের একজন অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করেছেন এবং অন্যজন দ্রুততা করেছেন রক্তপাতের ব্যাপারে? প্রশ্নাকারে এ যুক্তি শোনার পর তিনি তাঁর পূর্বের বিশ্বাস থেকে সরে আসেন।[১৫] হযরত 'উছমানের (রা) বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল, তাঁর খিলাফতকালে বায়তুল মালের অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হয়নি, আর হযরত 'আলীর (রা) সময়ে গৃহ যুদ্ধের সূচনা হয়।

মেয়ের বিয়ে

মায়মূন ইবন মিহ্রান প্রথম যৌবনেই বিয়ে করেন এবং বিয়ের পরেই প্রথমে এক কন্যার পিতা হন। পিতা-মাতা অতি আদরে মেয়েকে গড়ে তোলেন। জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও দীনী পরিবেশে বেড়ে ওঠায় তার মধ্যেও সৎ গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। মেয়েটির বিয়ের বয়স হলো। বহু অভিজাত ঘরের বিত্তশালী যুবক বিয়ের পয়গাম পাঠাতে লাগলো। মায়মূন মেয়ের বর হিসেবে আভিজাত্য ও বিত্ত-বৈভবকে মোটেও গুরুত্ব দিলেন না। তিনি গুরুত্ব দিলেন পাত্রের সত্যনিষ্ঠতা ও আল্লাহ্ ভীতিকে। এমন একজন দরিদ্র পাত্রকেই তিনি মেয়ের জন্য নির্বাচন করেন। একজন বিত্তশালী অভিজাত যুবক বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তাকে পরীক্ষার জন্য বলেন : আমার মেয়ে তো প্রচুর সোনা-রূপো পছন্দ করে। সাথে সাথে সে জবাব দেয়, আমার তা আছে। মায়মূন একটু হেসে বলেন : আমি আমার মেয়ের জন্য এমন পাত্র নির্বাচন করতে পারিনে।[১৬]

তাঁর একটি তৎক্ষণিক মন্তব্য

তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী মানুষ। সত্য কথা বলতে কোন রকম ইতস্ততা করতেন না। একদিন তিনি মসজিদে নফল নামায আদায় করছেন। নামায শেষ করতেই এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললো : হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকের স্ত্রী ইনতিকাল করেছেন। মায়মূন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পাঠ করলেন। লোকটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাথা একটু উঁচু করে আবার বললো : আপনি কি জানেন মৃত্যুর আগে অসুস্থ অবস্থায় হিশামের স্ত্রী কী করেছেন? মায়মূন বললেন : না। কী করেছেন? লোকটি বললো : তার মালিকানার সকল দাস-দাসী মুক্ত করে দিয়েছেন। মায়মূন বিস্ময়ের সুরে বললেন : সুবহানাল্লাহ! দুইবার আল্লাহর অবাধ্যতা করেছেন। আল্লাহ অর্থ-সম্পদ খরচ

---

১৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/৩৯১; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫৪৭

১৬. 'আসরুত তাবি'ঈন-৫২৫-৫২৬; তাবি'ঈন-৪৯৫

করার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ তিনি সে ব্যাপারে জীবিত অবস্থায় কার্পণ্য করেছেন, আর যখন সে সম্পদ অন্যের হয়ে যাচ্ছে তখন তা খরচের ব্যাপারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন।[১৭]

হাসান আল-বাসরীর (রহ) সাথে একটি সাক্ষাৎকার

মায়মূন ইবন মিহ্‌রান বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। চোখ-কানও দুর্বল হয়ে গেছে। এখন আর একাকী চলতে-ফিরতে পারেন না। যেখানেই যান ছেলে 'আমর ইবন মায়মূনকে সংগে নিয়ে যান। একদিন 'আমর পিতাকে নিয়ে বসরার একটি পথে বের হয়েছেন। পথে সরু একটি নালা। বৃদ্ধ পিতা তা ডিঙ্গিয়ে পার হতে পারলেন না। 'আমর আড়াআড়িভাবে নালার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো, আর পিতা মায়মূন ছেলের পিঠের উপর দিয়ে নালা পার হলেন। তারপর 'আমর উঠে দাঁড়িয়ে আবার পিতার হাত ধরে চলতে লাগলেন।

মায়মূন ছেলেকে হাসান আল-বাসরীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য বললেন। তাঁরা হাসানের দরজায় পৌছে তাঁদের উপস্থিতি জানালেন। হাসানের এক দাসী এসে জিজ্ঞেস করলো : এ বৃদ্ধ কে? 'আমর বললো : মায়মূন ইবন মিহ্‌রান এসেছেন হাসান আল-বাসরীর সাথে সাক্ষাৎ করতে। দাসী বললো : কোন মায়মূন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কাতিব (সেক্রেটারী)? 'আমর বললো : হাঁ, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সেক্রেটারী। দাসী সাথে সাথে বলে উঠলো : হায় আমার দুর্ভাগ্য! এমন মন্দ সময়েও আপনি বেঁচে আছেন? দাসীর কথা শুনে মায়মূন কেঁদে দিলেন এবং এত বেশি কাঁদলেন যে তাঁর সারা দেহ কাঁপতে থাকলো। দাসী চলে যাওয়ার পর হাসান আল-বাসরী ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মায়মূনকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করেন। তারপর তাঁরা সকলে ভিতরে প্রবেশ করেন। বসার পর একটু স্থির হয়ে মায়মূন হাসান আল-বাসরীকে লক্ষ্য করে বলেন : আবূ সা'ঈদ! আমি আমার অন্তরে কঠোরতা অনুভব করছি, এর প্রতিকার কিসে হয় তা বলে দিন। মায়মূনের কথা শুনে হাসান সোজা হয়ে বসলেন, তারপর পাঠ করলেন :[১৮]

بسم الله الرحمن الرحيم ـ أَفَرَءَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ. ثُمَّ جَاءَهُمْ مَّاكَانُوْا يُوْعَدُوْنَ. مَا أَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ.

'তুমি ভেবে দেখ যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে, তখন তাঁদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি?' তিলাওয়াত শেষ করে হাসান দীর্ঘক্ষণ অবচেতন অবস্থায় থাকলেন, তারপর সম্বিত ফিরে পেলেন। তখন দাসীটি এসে বললো : আপনারা এই বৃদ্ধকে কষ্ট দিচ্ছেন, এবার উঠুন, যান!

---

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৭৬

১৮. সূরা আশ-শু'আরা'-২০৫-২০৭

'আমর পিতার হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। চলতে চলতে 'আমর বলে : 'আব্বা! আমার ধারণা ছিল হাসান এর চেয়ে বেশি সবল আছেন। মায়মূন ছেলের বুকে হাত দিয়ে গুঁতো মেরে বলেন : বেটা! তিনি এমন একটি আয়াত আমাদের সামনে পাঠ করেছেন, তুমি যদি তার অর্থ বুঝতে তাহলে তোমার জন্য তার মধ্যে খুব বড় উপদেশ রয়েছে।[১৯]

তারপর তিনি ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, এই কুরআন বহু মানুষের অন্তরে অনেক কিছু সৃষ্টি করেছে এবং তারা এর বাইরে হাদীছ তালাশ করেছে। তাদের অনেকে তাদের অর্জিত এই জ্ঞানকে পণ্য বানিয়ে তার বিনিময়ে দুনিয়ার প্রত্যাশী যেমন হয়েছে তেমনি অনেকে চেয়েছে মানুষ তার দিকে আংগুল দিয়ে ইশারা করুক, আবার অনেকে চেয়েছে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ করে প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হতে। তবে সেই ব্যক্তিই ভালো যে জ্ঞান অর্জন করে এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য করে। যে কুরআনের অনুসরণ করবে, কুরআন তাকে পথ দেখিয়ে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে। আর যে কুরআন ত্যাগ করবে, কুরআন তাকে ত্যাগ না করে তার পিছে পিছে চলতে থাকবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। তারপর তিনি ছেলেকে বলেন : আল্লাহকে ভয় কর। কোন লোভ ও ক্রোধ যেন তোমাকে বিকৃত না করে।[২০]

তাঁর কিছু ওয়াজ-নসীহত

একদিন 'আমর তার পিতাকে মসজিদে নিয়ে গেল। এক কোণে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানটিতে তিনি বসলেন। মানুষের ভীড় জমে গেল এবং তাঁর চারপাশে বৃত্তাকারে বসে গেল। মায়মূন তাঁর অভ্যাস মত আল্লাহর হামদ ও রাসূলের (সা) প্রতি দরূদ ও সালাম পেশের মাধ্যমে বলতে আরম্ভ করলেন : ওহে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের শক্তিকে তোমরা তোমাদের যুবকদের মধ্যে পুঞ্জিভূত কর এবং আল্লাহর আনুগত্যের জন্য তোমাদের কর্ম তৎপরতা পরিচালিত কর। ওহে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ! আর কত দিন মরীচিকার পিছনে ছুটবে?[২১]

আল্লাহর যিক্‌র বা স্মরণ দু'প্রকার। মুখে আল্লাহকে স্মরণ করা, আর এক প্রকার স্মরণ হলো, যখন তুমি কোন পাপ কাজের কাছাকাছি যাবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করে বিরত থাকা। আর এটাই আল্লাহর সর্বোত্তম যিক্‌র বা স্মরণ।

তিনটি জিনিসের ব্যাপারে মু'মিন ও কাফির উভয়ে সমান :

ক. কেউ কোন কিছু আমানত (গচ্ছিত) রাখলে তা ফেরত দেয়া।

খ. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আল্লাহ বলেন :[২২]

---

১৯. হিলয়াতুল আওলিয়া-৪/৮২-৮৩

২০. 'আসরুত তাবি'ঈন-৫২৯-৫৩১

২১. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৫৫০

২২. সূরা লুকমান-১৫

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।'

গ. অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করা।

অধীনস্থ দাস-দাসীকে শাস্তি দিবে না, মারপিট করবে না। তবে তার অপরাধ মনে রাখবে। যদি সে কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করে তখন তার এই পাপের জন্য শাস্তি দিবে। তখন তাকে তোমার সাথে করা তার অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।

মজলিসের ভিতর থেকে এক যুবক দাঁড়িয়ে বললো : ওহে শায়খ, আল্লাহ আপনাকে সহীহ-সালামাতে রাখুন! আপনি একজন বান্দাহ্ ও তার পাপ সম্পর্কে কিছু বলুন। মায়মূন মাথা নেড়ে যুবকের কথায় সায় দিলে সে বসে পড়ে। তারপর তিনি বলেন : একজন বান্দাহ যখন কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি তাওবা করে তাহলে দাগটি উঠে যায়। মু'মিন ব্যক্তি তা আয়নায় দেখার মত পরিষ্কার দেখতে পায়। শয়তান যে পাশ দিয়েই আসুক না কেন সে তাকে দেখতে পায়। আর যে ক্রমাগত পাপ করতে থাকে, তার প্রতিটি পাপের জন্য তার অন্তরে একটি করে কালো দাগ পড়তে পড়তে তার গোটা অন্তরটিই কালো হয়ে যায়। তখন সে আর কোন দিক দিয়েই শয়তানকে দেখতে পায় না।

আরেকজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে বললো : শায়খ! আমাদেরকে ধন-সম্পদ সম্পর্কে কিছু কথা শোনান। তিনি বললেন : ধন-সম্পদের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। যদি কোন ব্যক্তি তিনটির একটি বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তি পায়, তাহলে তৃতীয়টি থেকে খুব কমই মুক্তি পাবে। অর্থ-সম্পদের জন্য অপরিহার্য হলো পবিত্র হওয়া। আর তা হবে বৈধভাবে উপার্জনের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে সে যদি পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে তার উচিত হবে অর্থ-সম্পদের হক বা অধিকারসমূহ আদায় করা। এ ক্ষেত্রেও সে যদি পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে তার উচিত হবে তা ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। বেশিও করবে না, আবার কৃপণতাও করবে না।

নিম্নের কথাগুলো বলার মাধ্যমে মায়মূন তাঁর মজলিস শেষ করেন :

এই পৃথিবী অত্যন্ত মিষ্টি-মধুর ও প্রাণবন্ত যা কামনা-বাসনার চাদর দ্বারা আবৃত। আর শয়তানও সর্বক্ষণ উপস্থিত অতি চালাক শত্রু। আখিরাতের বিষয়টি বিলম্বিত এবং দুনিয়ার বিষয়টি তাৎক্ষণিক। কেউ যদি তার পরকালের স্থানটি জানতে চায় সে যেন দুনিয়াতে তার আমলের দিকে দৃষ্টিপাত করে।[২৩]

ফুরাত ইবন সালমান বলেন, একবার আমরা মায়মূন ইবন মিহ্রানের সংগে চলতে চলতে

---

২৩. হিলয়াতুল আওলিয়া-৮৮-৮৯; আসরুত তাবি'ঈন-৫৩১-৫৩৩

একটি গীর্জার কাছে গিয়ে থামলাম। তিনি একজন পাদ্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন : আচ্ছা বলতো, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে এই পাদ্রীর সমান 'ইবাদত-বন্দেগী করে? সবাই বললাম : না। তিনি বললেন : মুহাম্মাদের (সা) প্রতি ঈমান না এনে তার এই 'ইবাদতে কি কোন ফল হবে? বললাম : কোন ফল হবে না। তিনি বললেন : তেমনিভাবে 'আমল ব্যতিরেকে শুধু কথায় কোন উপকার হবে না।[২৪]

আবুল মালীহ্ আর-রাক্কী থেকে বর্ণিত হয়েছে, মায়মূন ইবন মিহ্‌রান বলতেন :[২৫] الظَّالِمُ وَالْمُعِيْنُ عَلَى الظُّلْمِ وَالْمُحِبُّ لَه سَوَاءٌ – 'অত্যাচারী, অত্যাচারের সহযোগী এবং অত্যাচারকে যে ভালো মনে করে সকলে সমান।' তিনি আল কুরআনের ধারক-বাহকদের লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা তো দুনিয়াতে কিছু লাভের আশায় কুরআনকে পণ্য বানিয়ে নিয়েছো। তোমরা দুনিয়াকে দুনিয়ার দ্বারা এবং আখিরাতকে আখিরাতের দ্বারা সন্ধান কর। একবার তিনি ছেলেকে লিখলেন : তুমি তোমার অর্থ থেকে অমুককে ভালোমত সাহায্য করবে এবং মানুষের কাছে কিছু চাইবে না। কারণ তা লজ্জা দূর করে দেয়। তিনি সকলকে বলতেন : তোমার গৃহে কোন অতিথি আসলে তোমার সাধ্যের বাইরে তার জন্য কোন কৃত্রিম তোড়জোড় করবে না। পরিবারের লোকেরা যা খাবে তাই খেতে দেবে এবং হাসিমুখে তার সাথে কথা বলবে। আর যদি তোমার সাধ্যের অতিরিক্ত তার জন্য কিছু করতে যাও তাহলে তোমার চেহারায় এমন বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠবে যা দেখে সে কষ্ট পাবে। তিনি বলতেন :[২৬]

من أساء سرًّا فليتب سرًا، ومن أساء علانيةً فليتب علانية، فإن النـاس يُعَـيِّرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يعيِّرُ.

'কেউ গোপনে কোন পাপ করলে গোপনেই তার তাওবা করা উচিত, আর কেউ প্রকাশ্যে কোন পাপ করলে প্রকাশ্যে তার তাওবা করা উচিত। কারণ, মানুষ হেয় ও অপমান করে, ক্ষমা করে না। আর আল্লাহ ক্ষমা করেন, হেয় ও অপমান করেন না।'

তিনি বলতেন : কেউ যদি কোন প্রয়োজন পূরণের আশায় কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দরজায় যায় এবং দ্বার রক্ষী তার সাথে সাক্ষাতে বাধা দেয়, তাহলে তার উচিত আল্লাহর ঘর মসজিদে ফিরে আসা। কারণ আল্লাহর ঘরের দরজা সবার জন্য সর্বক্ষণ খোলা। সেখানে দু'রাক'আত নামায আদায় করে নিজের প্রয়োজনের কথা আল্লাহকে বলবে।

ইউনুস ইবন 'উবায়দ বলেন, একবার মায়মূনের আবাসভূমিতে মহামারি আকারে 'তা'উন' (প্লেগ) দেখা দিল। আমি তাঁর নিজের ও পরিবারের অবস্থা জানতে চেয়ে তাঁকে একটি চিঠি দিলাম। জবাবে তিনি লিখলেন : তোমার চিঠি পৌছেছে। তুমি আমার পরিবারের লোকদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছো। হাঁ, আমার পরিবার ও ঘনিষ্ঠজনদের

---

২৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৫৪৯

২৫. প্রাগুক্ত-১৮/৫৫০

২৬. প্রাগুক্ত-১৮/৫৫২

মধ্য থেকে সতের (১৭) জন মারা গেছে। এই বালা-মুসীবত যখন আসে তখন আমার খুব খারাপ লেগেছিল, কিন্তু এখন তা নেই সে জন্য আমি উৎফুল্লও নই। তোমরা আল্লাহর কিতাব শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে। মানুষ এখন আল্লাহর কিতাব ভুলে মানুষের কথা মানতে শুরু করেছে। দীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করবে। না কোন 'আলিমের সংগে ঝগড়া করবে, আর না কোন জাহিলের সংগে। যদি কোন জাহিলের সংগে ঝগড়ায় লিপ্ত হও তাহলে তোমার অন্তর কঠিন হয়ে যাবে, আর সেও তোমার কথা শুনবে না। অন্যদিকে কোন 'আলিমের সংগে ঝগড়া করলে তিনি তাঁর 'ইল্ম (জ্ঞান) তোমাকে দান করবেন না এবং তোমার কোন কাজে তিনি মনোযোগী হবেন না।[২৭]

সাওয়ার ইবন 'আবদিল্লাহ আল-আনবারী বলেন, একদিন মায়মূন ইবন মিহ্রান বসে আছেন। তখন তাঁর পাশে বসা ছিলেন শামের একজন কারী (কুরআন পাঠ বিশেষজ্ঞ)। মায়মূন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : কিছু ক্ষেত্রে সত্য বলার চেয়ে মিথ্যা বলা উত্তম। শামী লোকটি প্রতিবাদের সুরে বললেন : না, সকল ক্ষেত্রে সত্য বলা উত্তম। মায়মূন বললেন : মনে কর কোন ব্যক্তি তরবারি হাতে নিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে কাউকে তাড়া করলো এবং তাড়িত ব্যক্তি প্রাণ বাঁচাতে তোমার ঘরে এসে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাড়াকারী এসে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে : লোকটিকে কি আপনি দেখেছেন? তখন তুমি কী বলবে? শামী লোকটি বললেন : আমি বলবো : না, আমি দেখিনি। মায়মূন বললেন : দেখ, এ ক্ষেত্রে তুমি মিথ্যা বলা উত্তম মনে করছো।[২৮]

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দিওয়ান বা বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা)। এ দিওয়ান ব্যবস্থাপনা ইসলামী খিলাফতে দারুণ সুফল বয়ে আনে। একটি দিওয়ানে মুসলিম নাগরিকদের নাম ও পরিচয় লেখা থাকতো। এই দিওয়ানে যাদের নাম থাকতো কেবল তারাই রাষ্ট্রের ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করতো। মায়মূনের সময়ও এ নিয়ম প্রচলিত ছিল। তখন এই দিওয়ানের প্রধান ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন মারওয়ান ইবন আল-হাকাম। তিনি একদিন লক্ষ্য করলেন মায়মূনের মত একজন বিশিষ্ট 'আলিমের নাম দিওয়ানে ওঠেনি। ফলে তিনি ইসলামী ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একদিন মায়মূনকে ডেকে বললেন : আপনি দিওয়ানে নাম লেখাচ্ছেন না কেন? নাম লেখালে ইসলামে আপনার যে অংশ রয়েছে তা লাভ করতেন।

মায়মূন বললেন : আমিও চাই ইসলামে আমার অংশ থাকুক। মুহাম্মাদ বললেন : তা কীভাবে সম্ভব, দিওয়ানে তো আপনার নাম নেই? মায়মূন বললেন : ইসলামে আমার অংশ হলো এ রকম : আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই– একথার সাক্ষ্য দেয়া একটি অংশ, সালাত একটি অংশ, যাকাত একটি অংশ, রমাদান মাসে সিয়াম পালন একটি

---

২৭. প্রাগুক্ত-১৮/৫৫২, ৫৫৩

২৮. প্রাগুক্ত

অংশ এবং বায়তুল্লাহতে হজ্জ আদায় একটি অংশ।[২৯] মুহাম্মাদ বললেন : আমি ধারণা করতাম, দিওয়ানে যাঁদের নাম আছে ইসলামে কেবল তাঁদের অংশ আছে। মায়মূন বললেন : এই যে আপনার পূর্ব পুরুষ হাকীম ইবন হিযাম (রা) দিওয়ান থেকে কোন দিন কোন কিছুই গ্রহণ করেননি। কারণ, তিনি একবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কোন কিছু সাহায্য চান, রাসূল (সা) তাঁকে বলেন : ওহে হাকীম, এই চাওয়া থেকে বিরত থাকা তোমার জন্য ভালো। হাকীম (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট চাওয়া থেকেও বিরত থাকবো? বললেন : হাঁ, আমার নিকট চাওয়া থেকেও। হাকীম (রা) বললেন : কোন পরোয়া নেই। আপনার ও অন্য কারো নিকট কখনো কিছু চাইবো না। তবে আপনি আল্লাহর নিকট আমার ব্যবসায় উন্নতির জন্য একটু দু'আ করুন। রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেন।[৩০]

এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কোন কিছু না চাওয়া– এই ছিল মায়মূনের নীতি। আর এ ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিলেন হাকীম ইবন হিযাম (রা)। মায়মূনের মৃত্যু সন নিয়ে মত পার্থক্য আছে। হিজরী ১০৬ থেকে ১১২ সনের মধ্যে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।[৩১]

---

২৯. 'আসরুত তাবি'ঈন-৫২৭-৫২৮

৩০. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাব আল-ওয়াসাইয়া, হাদীছ নং-২৭৫০; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-৫, হাদীছ নং- ১৫৫৭৪; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫৫৩

৩১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৯; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫৫৫

খারিজা ইবন যায়দ (রহ)

হযরত খারিজার (রহ) ডাকনাম আবূ যায়দ। বিখ্যাত সাহাবী হযরত যায়দ ইবন ছাবিতের (রা) পুত্র। মদীনার প্রসিদ্ধ খাযরাজ গোত্রের বানূ নাজ্জার শাখার সন্তান। তাঁর মা উম্মু সা'দ 'আকাবার দ্বিতীয় শপথে উপস্থিত ও রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নিয়োগকৃত 'নাকীব' মহান সাহাবী সা'দ ইবন রাবী'র কন্যা।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত খারিজার মহান পিতা হযরত যায়দ ইবন ছাবিত (রা) একজন 'আলিম সাহাবী ছিলেন। যে সকল সাহাবী কুরআনের হাফিজ ছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে বিশেষ স্থানের অধিকারী। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর কুরআনের সংগ্রহ ও সংকলন তাঁরই তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। এমন একটা জ্ঞান চর্চার পরিবেশে হযরত খারিজা প্রতিপালিত হন। পিতার নিকট থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে তিনি তাঁর সমকালের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে পরিগণিত হন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে ছিলেন।[২] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, জ্ঞানে তিনি একজন দক্ষ ইমাম ছিলেন এবং তাঁর বিশ্বস্ততা ও শ্রেষ্ঠতার ব্যাপারে সকলে একমত।[৩] ইবন সা'দ মদীনার মনীষীদের দ্বিতীয় স্তরে বা তবকায় তাঁর নাম সন্নিবেশ করেছেন।[৪]

হাদীছ

পিতা যায়দ, মা উম্মু সা'দ ইবন সা'দ, চাচা ইয়াযীদ, উসামা ইবন যায়দ, সাহ্ল ইবন সা'দ, 'আবদুর রহমান ইবন আবী 'উমারা উম্মুল 'আলা' (রা) প্রমুখের নিকট থেকে তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। আর তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শোনেন তাঁদের মধ্যে তাঁর পুত্র সুলায়মান, ভাতিজা সা'ঈদ ইবন সুলায়মান ও কায়স ইবন সা'দ এবং অন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'উছমান, মুত্তালিব ইবন 'আবদিল্লাহ, ইয়াযীদ ইবন কাসীত (রহ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৫]

ফিক্হ

ফিক্হ ছিল তাঁর বিশেষ অধীত বিষয়। এ শাস্ত্রে তিনি ইমাম ও মুজতাহিদের মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ্র মধ্যে তাঁর নামটিও আছে।[৬] আবুয যানাদ বলেন :[৭]

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-৫/৩১৮
২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯১
৩. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৪২
৪. তাহ্যীব আল-কামাল-৫/৩১৮
৫. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/৭৫
৬. প্রাগুক্ত
৭. তাহ্যীব আল-কামাল-৫/৩১৮

كان السَّبْعَة الذين يسألون بالمدينة ويُنْتَهى إلى قولهم : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار.

'মদীনার যে সাত ব্যক্তির নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হতো এবং যাঁদের কথা চূড়ান্ত বলে গণ্য হতো তাঁরা হলেন :

সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যাব, আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ, 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা, আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, খারিজা ইবন যায়দ ও সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহ)।'

ইসলামী জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা ফারায়েজ (দায় ভাগ) শাস্ত্র)। এ বিষয়ে তাঁর পিতা যায়দ ইবন ছাবিত একজন বড় 'আলিম ছিলেন। এ কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে খারিজা এ জ্ঞানের অধিকারী হন। মদীনার 'আলিমদের মধ্যে তিনি এবং তালহা ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আওফ উত্তরাধিকার (মীরাছ) বণ্টন করতেন এবং বণ্টনের লিখিত সনদ দিতেন। এ বিষয়ে তাঁর কথা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হতো।[৮] 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার বলেন, মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের পরে ফিক্‌হ বিষয়টি যাঁদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাঁদের একজন হলেন খারিজা ইবন যায়দ।[৯]

ওফাত

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতকালে হিজরী ১০০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি সত্তরটি সিঁড়ি বানানোর পর তাঁর থেকে পড়ে গেছেন। সেই বছর মৃত্যু হয় এবং তখন তাঁর বয়স পূর্ণ সত্তর বছর। তৎকালীন মদীনার ওয়ালী আবূ বাকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন হায্‌ম তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পাঠ করেন।[১০]

তাঁর দৈহিক অবয়ব সুগঠিত ও সুন্দর ছিল। "খুয" (রেশম ও পশম মিশ্রিত এক প্রকার সূতা)-এর চাদর গায়ে জড়াতেন। মাথায় কালো পাগড়ী এবং বাঁ হাতে আংটি পরতেন।[১১] মৃত্যুর সময় অনেকগুলো পুত্র-কন্যা রেখে যান। পুত্ররা হলেন : যায়দ, 'উমার, 'আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ এবং কন্যারা হলেন : হাবীবা, হামীদা, উম্মু ইয়াহইয়া ও উম্মু সুলায়মান। উল্লেখিত সন্তানদের সকলের মা ছিলেন উম্মু 'আমর বিনত হায্‌ম।[১২]

---

৮. প্রাগুক্ত-৫/৩১৯; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৩/৭৫

৯. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৫/৩১৯

১০. প্রাগুক্ত-৫/৩২০; আত-তাবাকাত-৫/১৯৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪৪০

১১. আত-তাবাকাত-৫/১৯৪

১২. প্রাগুক্ত

খালিদ ইবন মা'দান (রহ)

হযরত খালিদের (রহ) ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। তাঁর বংশধারা এরূপ : খালিদ ইবন মা'দান ইবন আবী কারব আল-কিলা'ঈ। শামের হিমসের অধিবাসী ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে শামের তাবি'ঈদের তৃতীয় তবকায় (স্তর) স্থান দিয়েছেন।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান অর্জন ও চর্চার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। জ্ঞান চর্চাই তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান ও কর্মে পরিণত হয়। বুহাইর বলেন, আমি তাঁর চেয়ে বেশি কাউকে জ্ঞান চর্চায় নিমগ্ন থাকতে দেখিনি। তাঁর এই আগ্রহ-উদ্দীপনা তাঁকে হিমসের বিশিষ্ট 'আলিমে পরিণত করে।[২]

হাদীছ

তিনি হাদীছের একজন বড় হাফিজ ছিলেন। সত্তর (৭০) জন মহান সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভের গৌরব অর্জন করেন।[৩] তাঁদের মধ্যে হযরত ছাওবান, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'উতবা ইবন 'আবদুস সালমী, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, মিকদাম ইবন মা'দিকারিব ও আবূ উমারের (রা) নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। হযরত 'উবাদা ইবন আস-সামিত, আবুদ দারদা', মু'আয ইবন জাবাল, আবূ 'উবায়দা, আবূ যার আল-গিফারী ও 'আয়িশা সিদ্দীকার (রা) নিকট থেকে শোনা হাদীছ "মুরসাল"[৪] হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৫]

ফিক্হ শাস্ত্রেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। ফকীহ সাহাবায়ে কিরামের পরে শামের ফকীহ্দের তৃতীয় স্তরে তাঁকে গণ্য করা হতো। তাঁর একটি নিজস্ব দারসের আসর ছিল। কিন্তু খ্যাতিকে এত পরিমাণ ভয় করতেন যে, আসরে উপস্থিতির সংখ্যা বেড়ে গেলে নাম-কামের ভয়ে পঠন-পাঠনের এই আসরটি ভেঙ্গে দেন।[৬]

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল-৫/৪০৯, ৪১১

২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১; তাবি'ঈন-১০২

৩. তাহ্যীব আল-কামাল-৫/৪১১

৪. হাদীছের সনদের শেষাংশ থেকে তাবি'ঈর পরে সাহাবী বাদ পড়াকে 'আল-মুরসাল' বলে। যেমন, কোন তাবি'ঈর উক্তি : 'রাসূল (সা) এরূপ বলেছেন, বা এরূপ করেছেন অথবা তাঁর সামনে এরূপ করা হয়েছে' ইত্যাদি। এখানে তাবি'ঈ যে সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছটি শুনেছেন তাঁর নাম বাদ দিয়েছেন, তাই হাদীছটি 'আল-মুরসাল' হবে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ ছেড়ে দেয়া, বাদ দেয়া।

৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/১১৯

৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১; তাহ্যীব আল-কামাল-৫/৪১১

ছাত্র

তাঁর কয়েকজন খ্যাতিমান ছাত্র হলেন : বুহায়রা ইবন সা'ঈদ, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম তায়মী, ছাওর ইবন ইয়াযীদ, হুরায়য ইবন 'উছমান, 'আমির ইবন হাশীব, হাসসান ইবন 'আতিয়্যা, ফুদায়ল ইবন ফুদালা (রহ) ও আরো অনেকে।[৭]

তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞান সবই লিখে নিতেন। তাঁর ছাত্র বুহায়র বলেন, তাঁর অর্জিত সকল জ্ঞান একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।[৮] তাঁর সমকালীন সকল বড় বড় ইমাম তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকার করেছেন। সুফইয়ান ছাওরী বলতেন, আমি খালিদ ইবন মা'দানের উপর দ্বিতীয় কাউকে প্রাধান্য দিই না।[৯] ইমাম আওযা'ঈ (রহ) তাঁর প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং মানুষকে খালিদের কন্যা "আবাদা"র নিকট পাঠিয়ে তাঁর রীতি-পদ্ধতি অবগত হতেন।[১০]

'ইবাদত

'ইলমের সাথে সাথে তিনি 'আমলেও ঋদ্ধ ছিলেন। ইবন হিব্বান তাঁকে আল্লাহর উত্তম বান্দাদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[১১] রাত-দিনে সত্তর হাজার বার তাসবীহ পাঠ করতেন। এছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[১২] অত্যধিক 'ইবাদত-বন্দেগীর চিহ্ন তাঁর কপালে দীপ্তিমান ছিল।[১৩] তাঁর মৃত্যুর পর গোসলের জন্য লাশ খাটিয়ায় রাখা হলে দেখা গেল ডান হাতের আংগুল তাসবীহ পাঠরত ভঙ্গিতে রয়েছে।[১৪]

মরণের প্রতি তীব্র আকাঙ্খা

সাধারণ মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়। কিন্তু আল্লাহ প্রেমিক বান্দারা মৃত্যুকে মিলনের বার্তা বলে মনে করে। আর এ কারণে হযরত খালিদ (রহ) ভীত হওয়ার পরিবর্তে মৃত্যুর অধীর আগ্রহে থাকতেন। তিনি বলতেন, যদি মৃত্যু এমন কোন জ্ঞান হতো যা অর্জনের জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা হতো তাহলে সবার আগে তার কাছে পৌঁছে যেতাম। শক্তির জোরে আমাকে অতিক্রম করতে পারতো এমন ব্যক্তি ছাড়া কেউ আমাকে হারাতে পারতো না। ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের খিলাফতকালে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ১০৩ অথবা ১০৪ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি রোযা ছিলেন।[১৫]

---

৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/১১৮

৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১

৯. প্রাগুক্ত

১০. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/১১৯

১১. প্রাগুক্ত

১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১; তাহ্যীব আল-কামাল-৫/৪১৩

১৩. আত-তাবাকাত-৭/১৬২

১৪. তাহ্যীব আল-কামাল-৫/৪১৩

১৫. প্রাগুক্ত-৫/৪১২, ৪১৩; আত-তাবাকাত-৭/১৬২

আবূ বুরদা ইবন আবী মূসা আল-আশ'আরী (রা)

আবূ বুরদা ডাকনাম, আসল নাম 'আমির মতান্তরে আল-হারিছ। ডাক নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরীর (রা) পুত্র। কূফার একজন বিখ্যাত ফকীহ্ তাবি'ঈ। তথাকার কাজীও ছিলেন।[১] আল-মাদায়িনী বলেন, তাঁর পিতা আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) 'উমার অথবা 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে যখন বসরার আমীর ছিলেন তখন আবূ বুরদার জন্ম হয়।[২]

তাঁর মহান পিতা হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ছিলেন একজন উঁচুমানের সাহাবী। তিনি তাঁর এই পুত্রকে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) নিকট পাঠিয়ে দেন। উল্লেখ্য যে, ইসলাম পূর্ব জীবনে এই 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম ছিলেন মদীনায় ইহুদীদের একজন বড় 'আলিম। তাঁর নিকট যাওয়ার ঘটনাটি আবূ বুরদা বর্ণনা করেন এভাবে : আমার মুহতারাম পিতা আমাকে জ্ঞান অর্জনের জন্য 'আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) নিকট পাঠান। আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম, তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ভাতিজা! তোমরা এক ব্যবসা কেন্দ্রে বসবাস কর। এ কারণে এদিকে দৃষ্টি রাখবে যে, যখন কারো উপর তোমাদের কিছু অর্থ-সম্পদ পরিশোধ করা ওয়াজিব হয় তখন যদি সে তোমাদেরকে খুশী করার জন্য অতিরিক্ত এক আটি ঘাসও দেয় তাহলে তা গ্রহণ করবে না। কারণ তা সুদ হবে।[৩]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, আমি যখন মদীনায় গেলাম এবং 'আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি বললেন, চলো, যে ঘরে রাসূল (সা) প্রবেশ করে সালাত আদায় করেন তুমিও সেখানে গিয়ে সালাত আদায় করবে। তোমাকে খেজুর ও ছাতু খাওয়াবো। তারপর বলেন : ভাতিজা! তোমরা এমন এক স্থানে বসবাস কর যেখানে সুদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তোমরা এমন মানুষ যে, যখন তোমাদের ওখানে কেউ কোন ব্যক্তিকে করজ (ঋণ) দেয় এবং তা পরিশোধের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যায় তখন মাকরূজ (ঋণ গ্রহীতা) খাদ্য-খাবারের একটি পুটলি এবং ঘাসের একটি বোঝা সংগে নিয়ে হাজির হয়। এটা সুদ হবে।[৪]

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) শিক্ষা ও

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৪৮

২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/২২

৩. আত-তাবাকাত-৫/১৮৭

৪. প্রাগুক্ত

প্রশিক্ষণে এবং অন্য সব মহান ব্যক্তির সাহচর্যের কল্যাণে আবূ বুরদা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :[৫]

أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى الفقيه أحد ائمة الأثبات.

"আবূ মূসা আল-আশ'আরীর (রা) পুত্র আবূ বুরদা একজন ফকীহ্ ও দৃঢ়পদ ইমামদের একজন।"

ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা ও মহত্ত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।[৬]

হাদীছ

তিনি ছিলেন হাদীছের বিশিষ্ট হাফিজদের মধ্যে একজন। ইবন সা'দ বলেন : كان ثقة كثير الحديث. - 'তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, বহু হাদীছের ধারক-বাহক।'[৭] এ বিষয়ে তিনি আবূ মূসা আল-আশ'আরী, 'আলী ইবন আবী তালিব, হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান, 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম, আ'য়ায আল-মুযানী, মুগীরা ইবন শু'বা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'উরওয়া ইবন যুবায়র, আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ আত-তায়মী (রা) প্রমুখ সাহাবী ও তাবি'ঈর নিকট থেকে ফায়দা হাসিল করেন।[৮]

তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : তাঁর পুত্র সা'ঈদ ও বিলাল, পৌত্র ইয়াযীদ এবং অন্যদের মধ্যে ইমাম শা'বী, ছাবিত আন-নাবানী, হুমায়দ ইবন হিলাল, 'আবদুল মালিক ইবন নুমায়র, কাতাদা, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ (রহ) প্রমুখ।[৯]

ফিক্হ শাস্ত্রে তিনি বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম ও ফকীহ বলেছেন। ফিক্হ বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের কারণে কাজী শুরায়হ-এর পরে তিনি কূফার কাজীর পদে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। পরে তাঁর পুত্র বিলাল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[১০]

নৈতিক গুণাবলী

নৈতিক গুণাবলীর তিনি বাস্তব রূপ ছিলেন। তাঁর ব্যক্তি সত্তায় সকল নৈতিক গুণ ও সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটেছিল। ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব যখন খুরাসানের ওয়ালী ছিলেন তখন তাঁর বহু গুণ বিশিষ্ট একজন লোকের প্রয়োজন পড়ে। তিনি লোকদের বললেন,

---

৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৫
৬. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৭৯
৭. প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাত-৫/১৮৭; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৫০
৮. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/১৮
৯. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৫০
১০. আত-তাবাকাত-৫/১৮৭; শাজারাত আয-যাহাব-১/১২৬

আমাকে এমন একজন লোক দাও যার মধ্যে উত্তম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। লোকেরা আবূ বুরদার নাম বলে। ইয়াযীদ তাঁকে ডেকে এনে কথা বলেন এবং তাঁকে উত্তম ব্যক্তি রূপে দেখতে পান। আবূ বুরদার কথায় তিনি দারুণ মুগ্ধ হন। পরীক্ষার পর তিনি তাঁকে বলেন, আমি আপনাকে অমুক অমুক পদে নিয়োগ করলাম। আবূ বুরদা তা গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ইয়াযীদ তাঁর কথা মানলেন না। তখন আবূ বুরদা নিজের অক্ষমতার সপক্ষে এ দলীল উপস্থাপন করেন যে, আমার মহান পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন, যে ব্যক্তি এমন কোন পদ গ্রহণ করে যে সম্পর্কে নিজেই জানে যে সে তার উপযুক্ত নয়, তাহলে জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা বানানোর জন্য তার প্রস্তুত থাকা উচিত হবে। হিজরী ১০৩ অথবা ১০৪ সনে কূফায় তাঁর ইনতিকাল হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছরের উপরে।[১১]

---

১১. আত-তাবাকাত-৫/১৮৭; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৫২; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৫

কা'ব আল-আহ্বার (রহ)

হযরত কা'ব-এর (রহ) ডাকনাম আবূ ইসহাক, পিতার নাম মাতি' ইবন হানয়্‌'। তিনি ছিলেন ইয়ামনের বিখ্যাত হিময়ার গোত্রের শাখা গোত্র "আলে যী রু'আইন" -এর সন্তান।[১]

ইসলাম গ্রহণ ও মদীনায় আগমন

হযরত কা'ব (রহ) একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি একজন ইহূদী 'আলিম ছিলেন।[২] হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায়ও তিনি বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু সঠিক বর্ণনা মতে সে সময় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। একটি বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, সে সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইমাম আশ-শাতিবী বর্ণনা করেছেন, কা'ব বলেন : হযরত 'আলী (রা) যখন ইয়ামন আসেন তখন আমি তাঁর নিকট যেয়ে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পরিচয় ও গুণ-বৈশিষ্ট্য জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন। আমি তা শুনে একটু মৃদু হাসি। 'আলী (রা) আমার এ মৃদু হাসির কারণ জিজ্ঞেস করেন। আমি বলি : আমাদের ধর্মে শেষ যামানার নবীর যে সব আলামত বলা হয়েছে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে তার মিল থাকায় হেসেছি। এরপর আমি মুসলমান হয়ে যাই এবং মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে থাকি। তবে ইয়ামনেই থেকে যাই। 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরাত করে মদীনায় যাই। আফসোস! আমি যদি সেই পূর্বেই হিজরাত করতাম। আরেকটি বর্ণনা এ রকম এসেছে যে, তিনি হযরত আবূ বাকরের (রা) খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

উপরের দু'টি বর্ণনাই দুর্বল বলে মুহাদ্দিছগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সঠিক বর্ণনা সেটাই যা ইবন সা'দ কা'বের হালীফ তথা চুক্তিবদ্ধ আশ্রয়দাতা হযরত 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা দ্বারা খোদ কা'বের বক্তব্যেই হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রমাণিত হয়। সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) বর্ণনা করেছেন। হযরত 'আব্বাস (রা) কা'ব ইসলাম গ্রহণের পর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আবূ বাকরের (রা) সময়ে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকার এমনকি কারণ ছিল যে, এখন 'উমারের (রা) সময় ইসলাম গ্রহণ করছেন? জবাবে তিনি বলেন : আমার পিতা তাওরাত থেকে কিছু অংশ লিখে আমাকে দেন এবং উপদেশ দেন আমি যেন তার উপর 'আমল করি। তারপর ধর্মীয় সকল গ্রন্থের উপর সীল-মোহর লাগিয়ে

---

১. তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৫/৩৯৯, ৪০০

২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫২

৩. আল-ইসাবা ফী তাময়ীম আস-সাহাবা-৩/৩১৫-৩১৬; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/৩৯৯

আমাকে পিতৃত্বের অধিকারের কসম করিয়ে অঙ্গীকার নেন, আমি যেন এই সীল-মোহর না খুলি। এজন্য আমি তা খুলিনি এবং পিতার দেয়া লেখার উপর 'আমল করতে থাকি। যখন ইসলামের প্রচার-প্রসার ও তার প্রাধান্য পেতে থাকে এবং কোন ভয়-ভীতির অবকাশ থাকলো না তখন আমার মনে হলো, আমার পিতা আমার নিকট কিছু 'ইল্ম গোপন করে গেছেন। এখন আমার এই সীল-মোহরকৃত গ্রন্থগুলো খুলে দেখা উচিত। অতঃপর আমি সীল-মোহর ভেঙ্গে গ্রন্থগুলো পাঠ করি। তাতে আমি মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর উম্মাতের পরিচয় ও গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। সেই সময় আমার নিকট প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায়। এজন্য আমি এখন এসে ইসলাম গ্রহণ করেছি।[৪] ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত 'আব্বাসের (রা) সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকেন।

তাঁর জ্ঞান ও মনীষা

হযরত কা'ব (রহ) ছিলেন ইহূদীদের একজন বিশিষ্ট ও বিখ্যাত 'আলিম। ইহূদী ধর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অতি ব্যাপক। ইমাম যাহাবী লিখেছেন, তিনি ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং আহলি কিতাবদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম।[৫] ইমাম নাওবী লিখেছেন, তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলে একমত। অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁকে "কা'ব আল-আহবার" এবং "কা'ব আল-হাবর" বলা হতো। তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য অনেক। তাঁর জ্ঞানগর্ভ অনেক কথা ও মন্তব্য অতি প্রসিদ্ধ।[৬] অনেক বড় বড় সাহাবী তাঁর গভীর জ্ঞানের কথা স্বীকার করতেন। হযরত আবূ দারদা' আল-আনসারী (রা) কা'বের সাথে হিমসে এক সাথে ছিলেন। তিনি বলতেন, ইবন হিময়ারের নিকট বহু জ্ঞান আছে। আমীর মু'আবিয়া (রা) বলতেন, আবুদ দারদা' (রা) হাকীম তথা মহাজ্ঞানীদের অন্তর্গত, আর কা'ব 'আলিমদের অন্তর্গত। তার নিকট সাগরের মত সীমাহীন জ্ঞান ছিল।[৭]

যেহেতু তিনি একটি ধর্মের একজন বড় 'আলিম ছিলেন, এ কারণে ইসলামী জ্ঞানের সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান লাভ করেন মদীনায় সাহাবায়ে কিরামের (রা) নিকট থেকে এবং অন্যদিকে সাহাবায়ে কিরামও তাঁর নিকট আহ্লি কিতাবের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান তিনি লাভ করেন হযরত 'উমার, সুহায়ব ও উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) নিকট থেকে। অন্যদিকে তাঁর নিকট ইসরাঈলিয়াত বা বনী ইসরাঈলের জ্ঞান লাভ করেন সাহাবীদের মধ্যে আবূ হুরায়রা, মু'আবিয়া, ইবন 'আব্বাস (রা) এবং তাবি'ঈদের মধ্যে মালিক ইবন

---

৪. আত-তাবাকাত-৭/১৫৬; তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/৪০০

৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫২

৬. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৯

৭. আল-ইসাবা-৩/৩১৫

আবী 'আমির আসবাহী, 'আতা ইবন আবী রাবাহ, আবদুল্লাহ ইবন রিয়াহ আনসারী, 'আবদুল্লাহ ইবন হামযা সুলূলী, আবূ রাফে' সায়িগ, 'আবদুর রহমান ইবন শু'আয়ব (রহ)সহ বিরাট একটি দল।[৮]

'ইল্ম, 'উলামা ও 'ইল্মের ক্ষয় ও পতন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য

একবার প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : কা'ব! প্রকৃত 'আলিম কারা? জবাব দেন : যারা 'ইল্ম অনুযায়ী 'আমল করে। ইবন সালাম আবার জিজ্ঞেস করেন : 'আলিমদের অন্তর থেকে 'ইল্ম দূর করে দেবে কোন জিনিস? বলেন : লোভ এবং মানুষের সামনে নিজের অভাব ও প্রয়োজনের কথা বলা ও প্রত্যাশা করা। 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম বলেন : আপনি সত্য বলেছেন।[৯]

শামে অবস্থান

কা'বের পৈত্রিক ধর্ম ছিল ইহূদী। এ কারণে প্রথম থেকেই শামের সাথে তাঁর হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল। ইসলামের দৃষ্টিতেও এ ভূমি অতি পবিত্র ও সম্মানিত। এ কারণে কিছুকাল মদীনায় থাকার পর তিনি শামে চলে যান এবং হিমসে আবাসন গড়ে তোলেন।[১০]

জনগণকে উপদেশ দান

শামে অবস্থানকালে তাঁর প্রধান কাজ ছিল ইসরাঈলী কিস্‌সা-কাহিনী ভিত্তিক মানুষকে উপদেশ দান করা। একবার 'আওফ ইবন মালিক (রা) উপদেশ দানরত অবস্থায় তাঁকে বললেন : আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শুনেছি, আমীর, দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ও বয়স্কদের সামনে ছাড়া আর কাউকে কিস্‌সা-কাহিনী শোনানো উচিত নয়। এরপর তিনি ওয়াজ ছেড়ে দেন। অবশ্য পরে স্থানীয় আমীরের নির্দেশে আবার একাজ আরম্ভ করেন।[১১]

ইসলামী বর্ণনার মধ্যে ইসরাঈলী বর্ণনার প্রবেশ

হযরত কা'বের গভীর জ্ঞান ও মনীষার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই। তিনি ইহূদী ধর্মের একজন খ্যাতিমান 'আলিম ছিলেন। তবে ইহূদীদের জ্ঞানের বেশির ভাগ উৎস ছিল কিস্‌সা-কাহিনী। হযরত কা'বের জ্ঞানের উৎসও ছিল তাই। এ কারণে একটি বড় ক্ষতি এই হয়েছে যে, অনেক ভিত্তিহীন ইসরাঈলী কাহিনী ইসলামী গ্রন্থাবলীতে ঢুকে গেছে। তাই কোন কোন ইমাম কা'বের বর্ণনাসমূহকে অগ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আমাদের শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, আমাদের পূর্ববর্তীকালের পণ্ডিত-

---

৮. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/৪৩৮; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/৩৯৯

৯. আল-ইসাবা-৩/৩১৬; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/৪০১

১০. প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাত-৭/১৫৬

১১. আল-ইসাবা-৩/৩১৬; তাবি'ঈন-৩৯২

মনীষীগণ বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন এবং তাঁরা যথাসময়ে এবং যথাস্থানে তা চিহ্নিতও করে গেছেন।

ওফাত

হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফাতকালে হিজরী ৩২ সনে তিনি হিমসে ইনতিকাল করেন। অপর একটি বর্ণনায় হিজরী ৩৪ সনের কথা এসেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৪ বছর।[১২]

কা'ব বলতেন, আমার ওজনের সমপরিমাণ সোনা আমি সাদাকা হিসেবে দান করি– তার চেয়ে আল্লাহর ভয়ে আমি কাঁদি– এ আমার অধিকতর প্রিয়। পার্থিব জীবনে যে দু'টি চোখ আল্লাহর ভয়ে কেঁদে পানি ঝরায় পরকালীন জীবনে সেই দু'টি চোখকে উৎফুল্ল রাখা আল্লাহর দায়িত্ব।[১৩]

---

১২. আত-তাবাকাত-৭/১৫৬; তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/৪০০

১৩. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/৪০১

আবূ 'উছমান আন-নাহ্‌দী (রহ)

হযরত 'আবদুর রহমানের (রহ) ডাকনাম আবূ 'উছমান এবং এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন একজন "মুখাদরাম" ব্যক্তি অর্থাৎ জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ লাভ করেন।[১] জাহিলী যুগে সাধারণ আরববাসীর মত মূর্তিপূজক ছিলেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দর্শন ও সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থেকে যান। কিন্তু যাকাত-সাদাকা সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) তাহসীলদারের হাতে তুলে দিতেন।[২] আবূ 'উছমানের পিতার নাম মাল্লু ইবন 'আমর। আবূ 'উছমান কূফার অধিবাসী ছিলেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আবির্ভাবের খবর প্রথম যে ভাবে লাভ করেন সে সম্পর্কে তিনি পরবর্তীকালে বলতেন : আমি তখন ১৭ বছরের এক তরুণ। একদিন আমি একটি উপত্যকায় আমাদের উট চরাচ্ছিলাম, তখন সেই পথে আমার পাশ দিয়ে তিহামার একজন লোক যাচ্ছিলেন। আমি তাকে বললাম, শুনেছি আপনাদের মাঝে নাকি একজন 'সাবী' বা ধর্মত্যাগীর আবির্ভাব হয়েছে? ব্যাপারটা কী একটু বলুন তো? তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যে মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায়। সে নিজেদের পারস্পারিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে ফেলেছে।[৩]

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে তাঁর অবস্থান ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে প্রথম মদীনায় আসেন[৪] এবং ইরাকের অধিকাংশ অভিযান যথা : কাদেসিয়া, জালূলা, তুসতার, নিহাওয়ান্দ, সারওয়ান্দ, ইয়ারমূক প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করেন।[৫]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের জগতে তেমন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না। তবে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান আল-ফারেসীর (রা) সাহচর্যে বারো বছর ছিলেন।[৬] এই মোবারক সাহচর্যের কল্যাণে তিনি এত পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হন যে, তাঁকে বড় বড় 'আলিমদের মধ্যে গণ্য করা হতে থাকে।

---

১. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৬/২৭৭

২. খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ-১০/২০৪; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৫

৩. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১১/৩৮৪

৪. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৬/২৭৮

৫. তারীখু বাগদাদ-১০/২০৪

৬. শাজারাত আয-যাহাব-১/১১৮; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৬

হাদীছ

হযরত 'উমার, 'আলী, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, তালহা, সালমান আল-ফারেসী, আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, হুযায়ফা, আবূ যার আল-গিফারী, উবায় ইবন কা'ব, উসামা ইবন যায়দ, বিলাল, হানজালা আল-কাতিব, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের সূত্রে বর্ণিত তাঁর হাদীছ পাওয়া যায়।

ছাবিত আল-বানানী, কাতাদা, আসিম আল-আহওয়াল, সুলায়মান আত-তায়মী, খালিদ আল-হায্যা', আইউব আস-সাখতিয়ানী, হুমায়দ আত-তাবীল (রহ) প্রমুখের মত বিশিষ্ট 'আলিম তাবি'ঈগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন।[৭]

'ইবাদত-বন্দেগী

'ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযগারী ছিল হযরত আবূ 'উছমানের বিশেষ গুণ। এ ক্ষেত্রে তিনি সমকালীনদের মধ্যে বিশিষ্ট বলে গণ্য হতেন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন, তিনি ছিলেন একজন 'আলিম, কায়িমুল লায়ল ও সায়িমুন নাহার– অর্থাৎ জ্ঞানী, রাতে সালাত আদায়কারী ও দিনে সাওম পালনকারী। এত বেশি সালাত আদায় করতেন যে, মাঝে মাঝে অচেতন হয়ে পড়তেন।[৮]

সকল প্রকার পাপ থেকে সব সময় দূরে থাকতেন। তাঁর ছাত্র সুলায়মান আত-তায়মী বলেন, তাঁর এমন অবস্থা দেখে আমার ধারণা হয়, তাঁর দ্বারা কখনো কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়নি।[৯]

আল্লাহর যিক্র

তিনি বলতেন, আমি জানি, আল্লাহ আমাকে কখন স্মরণ করেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন : কিভাবে? বললেন : আল্লাহ বলেছেন :[১০] فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ – 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো।' এ কারণে আমি যখন তাকে স্মরণ করি তিনিও আমাকে স্মরণ করেন এবং যখন আমরা তাঁর নিকট দু'আ করি তখন তিনি তা কবুল করেন। কারণ, তিনি বলেছেন :[১১]

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

"তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।"[১২]

---

৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৬/২৭৮; তাহ্যীব আল-কামাল-১১/৩৮৩-৩৮৪

৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৬; তাহ্যীব আল-কামাল-১১/৩৮৪

৯. প্রাগুক্ত

১০. সূরা আল-বাকারা-১৫২

১১. সূরা গাফির-৬০

১২. আত-তাবাকাত-৭/৬৯; তাহ্যীব আল-কামাল-১১/৩৮৫

আহলি বায়ত বা নবী-বংশের সাথে সম্পর্ক

আহলি বায়তের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড ভক্তি ও ভালোবাসা। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। কিন্তু কারবালায় ইমাম হুসায়নের (রা) শাহাদাতের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর তিনি চিরদিনের জন্য কূফা ছেড়ে বসরায় আবাসন গড়ে তোলেন। কারণ হিসেবে বলতেন, আমি এমন শহরে অবস্থান করতে পারিনে যেখানে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দৌহিত্র শাহাদাত বরণ করেছেন।[১৩]

ওফাত

মৃত্যু সন নিয়ে মতপার্থক্য আছে। সঠিক বর্ণনা মতে হিজরী ১০০ সন অথবা এর কাছাকাছি সময়ে ইনতিকাল করেন। প্রায় এক শো তিরিশ বছর জীবন লাভ করেন। হিজরী ৯৫ সনের কথাও বর্ণিত হয়েছে।[১৪]

---

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. তারীখু বাগদাদ-১০/২০৫; তাহ্যীব আল-কামাল-১১/৩৮৫

ইউনুস ইবন 'উবায়দ (রহ)

হযরত ইউনুসের (রহ) ডাকনাম আবূ 'উবায়দ মতান্তরে আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি বানূ 'আবদিল কায়সের দাস ও বসরার অধিবাসী ছিলেন।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

যদিও দাসত্বের বেড়ী তাঁর কণ্ঠে ঝোলানো ছিল, কিন্তু তা জ্ঞানের আলো থেকে তাঁকে দূরে রাখতে পারেনি। তিনি তাবি'ঈকূল শিরোমণি হযরত হাসান আল-বাসরীর (রহ) খাস সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ছিলেন। আর এই সাহচর্য ও এক সাথে উঠাবসা তাঁকে জ্ঞান ও কর্মে ঐশ্বর্যবান করে তোলে। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম, হুজ্জাত (প্রমাণ) ও অনুসরণীয় নেতা বলেছেন।[২] ইমাম নাওবী (রহ) তাঁর বিশ্বস্ততা, দৃঢ়তা ও মহত্ত্বের ব্যাপারে সকলের ঐকমত্যের কথা বলেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, ইউনুস ছিলেন একজন উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন তাবি'ঈ।[৩] ইবন হিব্বান বলেছেন, তিনি জ্ঞান, মনীষা, স্মৃতিতে ধারণশক্তি, দৃঢ়তা, সুন্নাহর অনুসরণ, বিদ'আতীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ, দিব্যদৃষ্টি, দীনী বিষয়ে গভীর অনুধাবন শক্তি এবং বহু হাদীছ স্মৃতিতে ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর যুগের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন।[৪]

হাদীছ

তিনি তাঁর যুগের হাদীছের বিশিষ্ট হাফিজদের মধ্যে ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন : كان ثقة كثير الحديث. – 'তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, বহু হাদীছের ধারক-বাহক। তিনি তাঁকে বসরাবাসী মুহাদ্দিছগণের চতুর্থ তবকায় স্থান দিয়েছেন।'[৫]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি হযরত আনাস ইবন মালিকের দর্শন ও সাক্ষাৎ লাভ করেন, তবে তাঁর থেকে কোন হাদীছ শোনার সৌভাগ্য হয়নি। তিনি হযরত হাসান আল-বাসরীর (রহ) জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে সবচেয়ে বেশি অর্জন করেছেন। তারপর মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, ছাবিত আন-নাবানী, 'আবদুর রহমান ইবন আবী বাকরা, হাকীম ইবন 'আন-আ'রাজ, নাফি' মাওলা ইবন 'উমার (রা), হুমায়দ ইবন বিলাল, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ (রহ) প্রমুখের নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন।[৬]

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/৫৪২

২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৪৫

৩. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৬৮

৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৪৪৫

৫. আত-তাবাকাত-৭/২৩; তাহ্যীব আল-কামাল-২০/৫৪৩

৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৪৫; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৪৪২

হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অধিকাংশ সমকালীনের শীর্ষে ছিলেন। সা'ঈদ ইবন 'আমির বলেন, আমি ইউনুস ইবন 'উবায়দের চেয়ে উত্তম কাউকে পাইনি। সকল বসরাবাসীর এই মত। আবূ হাতিম বলতেন, তিনি সুলায়মান আত-তায়মীর চেয়েও উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তায়মী তাঁর স্থানে পৌঁছাতে পারতেন না। সালামা ইবন 'আলকামা বলেন, 'আমি ইউনুসের মজলিসে বসেছি, কিন্তু তাঁর একটি কথাও ভুল ধরতে পারিনি।[৭]

এত জ্ঞান ও যোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি হাদীছ বর্ণনায় দারুণ সতর্ক ছিলেন। হাদীছ বর্ণনার পর সব সময় তিনবার "আস্তাগফিরুল্লাহ" পাঠ করতেন। আর এই সতর্কতার কারণেই হাদীছ লিখতেন না। তিনি বলতেন, আমি কখনো কিছু লিখিনি।[৮]

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র হলেন : তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ, শু'বা, ছাওরী, উহাইর, হাম্মাদ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'ঈসা, খায্‌যায, খারিজা ইবন মুস'আব ও আরো অনেকে।[৯]

জ্ঞান অর্জনে তাঁর অকপটতা ও নিষ্ঠা

তাঁর জ্ঞান অর্জন ও চর্চা খ্যাতি ও নাম-কামের জন্য ছিল না; বরং কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ছিল। হিশাম ইবন হুসাম বলেন, আমি ইউনুস ইবন 'উবায়দ ছাড়া এমন কাউকে পাইনি যার জ্ঞান চর্চা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।[১০]

নৈতিক গুণাবলী

অগাধ জ্ঞানের সাথে 'আমলও (কর্ম) সেই পর্যায় ও মানের ছিল। 'আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে ছিলেন ভীষণ কঠোর এবং মত পথের ব্যাপারে ছিলেন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি ছিলেন সুন্নাহর বড় পাবন্দ, বিদ'আতের প্রতি দারুণ ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণকারী এবং দিব্য জ্ঞানের অধিকারী একজন মানুষ। 'আকীদার ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, নতুন কোন চিন্তা-বিশ্বাসকে কাবীরা গুনাহর চেয়েও মারাত্মক মনে করতেন। একবার তিনি তাঁর পুত্রকে বলেন, আমি তোমাকে সুদ, চুরি, মদপান ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলি। কিন্তু 'আমর ইবন 'উবায়দ ও তার সাথীদের চিন্তা-বিশ্বাসকে গ্রহণ করে তাঁদের সাথে মিলিত হওয়ার চেয়ে উপরোক্ত পাপে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়াকে আমি বেশি পছন্দ করি।[১১] উল্লেখ্য যে, 'আমর ইবন 'উবায়দ ছিলেন 'একজন বুদ্ধিবাদী মু'তাযিলা।'

---

৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৪৫; তাহ্‌যীব আল-কামাল-২০/৫৪৪

৮. প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাত-৭/২৩

৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/২৪২

১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৪৬

১১. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/৪৪৪

বিদ'আতীদের 'ইবাদত-বন্দেগীকেও তিনি কোন ছাওয়াবের কাজ বলে মনে করতেন না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আমার একজন মু'তাযিলা প্রতিবেশী অসুস্থ আছে, আমি তাঁকে দেখতে যেতে চাই। বললেন, ছাওয়াবের নিয়্যাতে যাবে না।[১২]

ফরয ব্যতীত খুব বেশি নফল নামায-রোযা করতেন না। তবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অধিকার ও ফরয আদায়ের ব্যাপারে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন। সাল্লাম ইবন মুতী' বলেন, ইউনুস খুব বেশি নামায-রোযা করতেন না। তবে আল্লাহর কসম! যখন আল্লাহর অধিকারের সময় হতো তখন তিনি তা প্রতিপালনের জন্য বিলম্ব করতেন না।[১৩] জিহাদকে সর্বোত্তম 'ইবাদত বলে বিশ্বাস করতেন। কোন কারণে জিহাদে যোগদান করতে না পারলে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়তেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে অস্থিরতা বিদ্যমান থাকতো। ইসহাক ইবন ইবরাহীম বলেন, ইউনুস অন্তিম রোগ শয্যায় শুয়ে তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে কাঁদতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, এ পা আল্লাহর রাস্তায় ধুলিমলিন হয়নি।[১৪] মুখ থেকে সব সময় কালিমায়ে ইস্তিগফার অর্থাৎ আস্তাগফিরুল্লাহ উচ্চারিত হতো। 'আবদুল মালিক ইবন মূসা বলেন, আমি তাঁর চেয়ে বেশি আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনাকারী আর দেখিনি।[১৫]

সততা ও সাধুতা

ব্যবসা ছিল তাঁর পেশা। এর মাধ্যমে তিনি জীবিকা উপার্জন করতেন। রেশমী বস্ত্রের ব্যবসা করতেন। ব্যবসায়িক সততায় এত বাড়াবাড়ি করতেন যে, তাতে ব্যবসা করাই দুঃসাধ্য ছিল। তাঁর ব্যবসায়িক সততা ও সাধুতার বহু ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

একবার এক বিশেষ স্থানে রেশমের মূল্য বৃদ্ধি পায়। তিনি তা জানতে পেরে অন্য এক স্থানের রেশম বিক্রেতার নিকট থেকে তিরিশ হাজার দিরহামের রেশম ক্রয় করেন। পরে কি যেন চিন্তা করে বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করেন, অমুক স্থানে রেশমের মূল্য বৃদ্ধির কথা কি তুমি জান? লোকটি বললো, সে কথা যদি জানতাম তাহলে আমার এ মাল কি বিক্রি করতাম? তাঁর এ জবাব শুনে তিনি প্রদত্ত মূল্য নিয়ে মাল ফেরত দেন।[১৬]

একবার এক মহিলা তাঁর নিকট আসে "খুযের" চাদর বিক্রির জন্য। তিনি জিনিস দেখে দাম জিজ্ঞেস করেন। সে বললো : ষাট দিরহাম। তিনি তাঁর এক প্রতিবেশীকে চাদর দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এর দাম কত হতে পারে? সে বললো : এক শো বিশ পর্যন্ত হতে পারে। দাম যাঁচায়ের পর তিনি মহিলাকে বলেন, বাড়ীর লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করেছি, তারা এর দাম এক শো পঁচিশ বলছে।[১৭]

---

১২. প্রাগুক্ত

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/৫৪৭

১৬. প্রাগুক্ত-২০/৫৪৯; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৪৪৩

১৭. প্রাগুক্ত

আরেকবার এক মহিলা রেশমের একটি জুব্বা বিক্রির জন্য নিয়ে এলো। তিনি দাম জিজ্ঞেস করলেন এবং সে পাঁচশো চাইলো। ইউনুসের দৃষ্টিতে জিনিসটির দাম অনেক বেশি ছিল। এ কারণে তিনি এক হাজার বলেন।[১৮]

এত সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। ইবন শাওযাব বলেন, একবার ইউনুস ও ইবন 'আওন হালাল-হারামের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে উভয়ে বললেন : আমাদের সম্পদে এক দিরহামও হালাল অর্থ নেই।[১৯]

ওফাত

হিজরী ১৩৯ সনে ইনতিকাল করেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) পৌত্র সুলায়মান ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আলী এবং প্রপৌত্র জা'ফার ও মুহাম্মাদ (রহ) তাঁর লাশের খাটিয়া বহন করেন। তখন তাঁরা বলছিলেন : "আল্লাহর কসম! এ একটি সম্মান ও মর্যাদা।"[২০]

---

১৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৪৫

১৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৪৪৪

২০. আত-তাবাকাত-৭/২৪; তাহ্যীব আল-কামাল-২০/৫৫৩

সুলায়মান ইবন ইয়াসার আল-হিলালী (রহ)

হযরত সুলায়মানের (রহ) ডাকনাম আবূ আইউব, মতান্তরে আবূ আবদির রহমান। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনার (রা) দাসত্বের সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত মায়মূনা (রা) তাঁকে মুকাতিব করেন। অর্থাৎ তাঁকে এই শর্তে মুক্তি দানের চুক্তি করেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধের বিনিময়ে তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করবেন। এই দাসত্ব সুলায়মানকে 'ইল্‌ম ও 'আমলের (জ্ঞান ও কর্ম) ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে তোলে। 'আতা', 'আবদুল মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াসার– এ তিনজন ছিলেন তাঁর ভাই।[১]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) অন্দর মহলে যাতায়াত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনার (রা) দাসত্বের সুবাদে সুলায়মান হযরত 'আয়িশা (রা)সহ অন্যদের কাছে যাতায়াত করতেন। তিনি তাঁর দাসত্বকালে তাঁদের থেকে পর্দা করতেন না। সুলায়মান নিজেই বলেন, একবার আমি হযরত 'আয়িশার (রা) দরজায় উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি আওয়ায শুনে বললেন, তুমি দাসত্ব থেকে মুক্তির ব্যাপারে যে চুক্তি করেছিলে তাকি পূরণ করেছো? আমি বললাম : হাঁ, তবে সামান্য কিছু বাকী আছে। বললেন : তাহলে ভিতরে এসো। তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত দাস যতক্ষণ তোমার চুক্তির শর্ত পূরণে কিছু বাকী থাকবে।[২]

জ্ঞান ও মনীষা

সুলায়মান প্রথমতঃ ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়ে অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন।[৩] দ্বিতীয়তঃ উম্মুল মু'মিনীনের দাস হওয়ার সুবাদে মদীনায় বসবাসকারী সাহাবায়ে কিরামের (রা) সাহচর্যের বাড়তি সুবিধাও লাভ করেন। এতদুভয় কারণে তিনি মদীনার একজন বিশিষ্ট 'আলিমে পরিণত হন। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর মহত্ত্ব ও জ্ঞানগত উৎকর্ষের ব্যাপারে সকলে একমত।[৪]

কুরআন ও হাদীছ

কুরআন মাজীদ, হাদীছ, ফিক্‌হ তথা সকল ইসলামী জ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। কুরআনের বিশিষ্ট কারী ছিলেন।[৫] আর যে গৃহের তিনি সেবক ছিলেন সেটাই তো ছিল হাদীছে

---

১. তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-৮/১১৯

২. আত-তাবাকাত-৫/১৩০

৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯১

৪. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২৩৪

৫. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৪/২২৯

নববীর উৎসধারা। এ কারণে স্বাভাবিকভাবে হাদীছের একটা নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার তাঁর অধিকারে চলে আসে। ইবন সা'দ বলেন, তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, ফকীহ ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক ছিলেন।[৬]

তাঁর অর্জিত হাদীছ ভাণ্ডারের মূল উৎস উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) ও মায়মূনা (রা)। তাছাড়া আরো অনেক বড় সাহাবীর (রা) নিকট থেকেও তাঁর হাদীছের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। যেমন : যায়দ ইবন ছাবিত, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, ফাদল ইবন 'আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, মিকদাদ ইবন আওস, 'আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা (রা) ও আরো অনেকে। তাঁর সমকালীন মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকেও তিনি হাদীছ শোনেন। যেমন : জা'ফার ইবন 'আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরী, 'আবদুল্লাহ 'ইবন আল-হারিছ ইবন নাওফাল, 'আবদুর রহমান ইবন জাবির, 'আররাক ইবন মালিক, মালিক ইবন আবী 'আমির আসবাহী (রহ) প্রমুখ।[৭]

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের পরিধি অনেক ব্যাপক। কয়েকজনের নাম এখানে উপস্থাপন করা হলো : 'আমর ইবন দীনার, 'আবদুল্লাহ ইবন দীনার, 'আবদুল্লাহ ইবন ফাদল আল-হাশিমী, আবুয যানাদ, বুকায়র ইবন আল-আশাজ্জ, জা'ফার ইবন 'আবদিল্লাহ, ইবন হাকাম, সালিম, আবুন নাসর, সালিহ ইবন কায়সান, 'আমর ইবন মায়মূন, মুহাম্মাদ ইবন আবী হারমালা, যুহরী, মাকহূল, নাফি', ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, ইয়া'লা ইবন হাকীম, ইউনুস ইবন সায়ফ (রহ) প্রমুখ।[৮]

ফিক্হ

ফিক্হ ছিল তাঁর একান্ত ও বিশেষভাবে অধীত বিষয়। এতে তিনি একজন ইমাম ও মুজতাহিদের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি ফকীহ 'আলিম ও ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ইমাম ছিলেন।[৯] তিনি ছিলেন মদীনার সেই বিখ্যাত সাত ফকীহর অন্যতম যাঁদেরকে সে সময় ফিক্হর ইমাম বলে মানা হতো।[১০] বিশেষ করে তালাকের মাসয়ালার তিনি একজন বড় 'আলিম ছিলেন। কাতাদা বলেন, আমি একবার মদীনায় গিয়ে মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, এখানে তালাকের মাসয়ালার সবচেয়ে বড় 'আলিম কে? তারা সুলায়মান ইবন ইয়াসারের নাম বললো।[১১]

কিছু 'আলিম ফিক্হ বিষয়ে তাঁকে ঐ সকল ইমামদের উপরে, জ্ঞানের জগতে যাঁদের

---

৬. আত-তাবাকাত-৫/১৩০

৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৪/২২৮; তাহ্যীব আল-কামাল-৮/১১৯

৮. প্রাগুক্ত

৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯১

১০. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২৩৫

১১. ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/২১৩

শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ছিল, প্রাধান্য দিতেন। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার (রহ) সুযোগ্য পুত্র হাসান (রহ) তাঁকে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) চেয়েও বেশি বুদ্ধিদীপ্ত মনে করতেন। খোদ সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) তাঁর প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, অনেক সময় কেউ তাঁর কাছে কোন মাসয়ালার সমাধান জানতে চাইলে তিনি তাকে সুলায়মানের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।[১২] বলতেন, জীবিত লোকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বড় 'আলিম।[১৩]

তাকওয়া-পরহেযগারী

দুনিয়া বিরাগী মনোভাব এবং 'ইবাদত-বন্দেগীর দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আবূ যার'আ বলেন, সুলায়মান ইবন ইয়াসার ছিলেন মদীনার একজন জ্ঞানী-গুণী ও তাপস মানুষ।[১৪] আল-'ইজলী তাঁর জ্ঞান-মনীষার সাথে সাথে 'ইবাদত-বন্দেগীরও সাক্ষ্য দিয়েছেন।[১৫]

তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের ছিলেন। যদিও তাবি'ঈদের সেই পূতঃপবিত্র দলটির জন্য এ কোন বড় বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ, তাঁরা সকলেই ছিলেন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, কিন্তু কেউ যদি জীবনের কোন পর্যায়ে কোন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় এবং সফলভাবে উৎরে যায় তাহলে সেটা তার জন্য বিশেষ সাফল্য হিসেবে ধরা হয়। সুলায়মান ছিলেন খুবই সুদর্শন ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। একবার এক সুন্দরী মহিলা সুযোগ মত তাঁর ঘরে ঢুকে যায় এবং তাঁকে সম্ভোগের আহ্বান জানায়। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যান। এরপর একদিন তিনি ইউসুফকে (আ) স্বপ্নে দেখেন।[১৬]

ওফাত

তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে একাধিক মত আছে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মতে হিজরী ১০৭ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। মোট ৭৩ বছর জীবন লাভ করেন। ইমাম আল-বুখারী, বলেন : সুলায়মান ইবন ইয়াসার, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, 'আলী ইবন আল-হুসায়ন ও আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান একই বছর মৃত্যুবরণ করেন। সেই বছরটি হলো হিজরী ৯৪ সন। এ কারণে এ বছরটিকে বলা হয় سنة الفقهاء – ফকীহ্দের বছর।[১৭]

---

১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯১

১৩. শাযারাত আয-যাহাব-১/১৩৪

১৪. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২৩৫

১৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৪/২৩০

১৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯১; তাহ্যীব আল-কামাল-৮/১২১

১৭. প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাত-৫/১৩০

আবুল 'আলিয়া রিয়াহী (রহ)

হযরত আবুল 'আলিয়ার (রহ) আসল নাম রাফী' এবং ডাকনাম আবুল 'আলিয়া। এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পিতার নাম মাহরান। আবুল 'আলিয়া বানূ রিয়াহ ইবন ইয়ারবূ' গোত্রের এক মহিলার দাস ছিলেন। এ কারণে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁকে রিয়াহী বলা হয়। বানূ রিয়াহ হলো বানূ তামীমের একটি শাখা গোত্র।[১] আসলে পারস্যে তাঁর জন্ম। মুসলিম মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়ে বসরায় আসেন এবং দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে পড়েন।[২]

ইসলাম গ্রহণ

তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ লাভ করেন, তাই তিনি একজন 'মুখাদরাম' মানুষ। তবে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণের গৌরব থেকে বঞ্চিত থেকে যান। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের দু'বছর পর ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩] আবূ খালদা বলেন, একবার আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি রাসূলকে (সা) দেখেছেন? বললেন : আমি তাঁর ওফাতের দু'বছরের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছি।[৪]

দাসত্ব থেকে মুক্তি

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইসলাম গ্রহণের পর বেশ কিছুকাল দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। অতঃপর তাঁর মনিবা তাঁকে মুক্ত করে দেয়। দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের ঘটনাটি তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন এভাবে : আমি এক মহিলার দাস ছিলাম। তিনি যখন আমাকে মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তাঁর চাচাতো ভাইয়েরা তাঁকে এই বলে বিরত রাখার চেষ্টা করে যে, যদি তুমি তাকে মুক্তি দাও তাহলে সে কূফায় গিয়ে যোগাযোগ ছিন্ন করে দেবে। কিন্তু তিনি মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, এ কারণে এক জুম'আর দিন আমার কাছে আসেন এবং আমার কাছে জিজ্ঞেস করে জামি' মসজিদের দিকে চলা শুরু করেন। আমিও তাঁর সাথে চললাম। মসজিদের পৌঁছার পর ইমাম সাহেব আমাকে মিম্বরের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। মহিলাটি আমার একটি হাত ধরে এই বাক্যগুলো উচ্চারণের মাধ্যমে আমার মুক্তি ঘোষণা করেন : "হে আল্লাহ! আমি আমার আখিরাতের জন্য তাকে তোমার কাছে জমা রাখলাম। মসজিদে উপস্থিত

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬১; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/২২০

২. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯২

৩. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২২৫

৪. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/২২১

লোকেরা! সাক্ষী থাকুন। এই দাসকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করলাম। ভবিষ্যতে তার উপর কারো কোন অধিকার নেই।" এরপর তিনি আমাকে মসজিদে রেখে চলে যান এবং আর কখনো আমাকে দেখা দেননি।[৫]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি বিশিষ্ট তাবি'ঈদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে ছিলেন।[৬] আবুল কাসিম আত-তাবারী বলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তার ব্যাপারে সকলে একমত।

কুরআন

তাঁর অতি প্রিয় ও বিশেষ অধীত বিষয়টি ছিল কিতাবুল্লাহ। আল-কুরআনের শিক্ষা তিনি লাভ করেন কুরআনের বিখ্যাত 'আলিম রাসূলুল্লাহর (সা) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উবায় ইবন কা'বের (রা) নিকট থেকে। এ শিক্ষার শুরু হয় তাঁর দাসত্বের জীবন থেকেই। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, আমি একজন দাস ছিলাম, মনিব পরিবারের সেবা করতাম। আর সেই সাথে কুরআন ও আরবী বই-পুস্তক পড়া শিখতাম।[৭] তবে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার শুরু হয় বেশ বয়স হলে, ইসলাম গ্রহণের সাত-আট বছর পরে। তিনি বলতেন, আমি তোমাদের নবীর ওফাতের দশ বছর পরে কুরআন পড়েছি।[৮]

এত বেশি আগ্রহ, উদ্দীপনা ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন যে, তাবি'ঈদের মধ্যে কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিমে পরিণত হন। আবূ বাকর ইবন আবী দাউদ বলেন, সাহাবায়ে কিরামের পরে আবুল 'আলিয়ার চেয়ে বড় কুরআনের কোন 'আলিম ছিলেন না।[৯] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী (রহ) তাঁকে মুফাস্সির বলে উল্লেখ করেছেন।[১০]

হাদীছ

ইবন সা'দ তাঁকে كثير الحديث অর্থাৎ বহু হাদীছের ধারক-বাহক বলেছেন।[১১] হযরত 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, আবূ আইউব আল-আনসারী, উবায় ইবন কা'ব, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা, ছাওবান, হুযায়ফা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, রাফি' ইবন খাদীজ, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী,

---

৫. আত-তাবাকাত-৭/৮১; 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯৩
৬. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২২৫
৭. আত-তাবাকাত-৭/৮২
৮. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/২২১
৯. প্রাগুক্ত-৬/২২২; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬১
১০. শাযারাত আয-যাহাব-১/১০২
১১. আত-তাবাকাত-৭/৮৫

আবূ হুরায়রা, আনাস ইবন মালিক, আবূ যার আল-গিফারী (রা) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন।[১২]

হাদীছ গ্রহণে তাঁর সতর্কতা

হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি দারুণ সতর্ক ছিলেন। যতক্ষণ প্রথম মূল রাবীর (বর্ণনাকারী) মুখ দিয়ে না শুনতেন, ততক্ষণ মধ্যবর্তী রাবীর বর্ণনা গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন, বসরায় আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের বর্ণনা শুনতাম, কিন্তু ততক্ষণ তাঁর উপর নির্ভর করতাম না যতক্ষণ না নিজে মদীনায় গিয়ে বর্ণনাটির প্রথম সূত্রের মুখ থেকে শুনতাম।[১৩]

ছাত্র-শিষ্য

তাঁর থেকে যাঁরা জ্ঞানগত ফায়দা হাসিল করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন : খালিদ আল-হায্যা', দাউদ ইবন আবী হিন্দ, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, ইউসুফ ইবন 'আবদিল্লাহ, রুবায়' ইবন আনাস, বাকর আল-মুযানী, ছাবিত আন-নাবানী, হুমায়দ ইবন হিলাল, কাতাদা, মানসূর, 'আওফ আল-আ'রাবী, আবূ 'আমর ইবন আল-আলা' (রহ) ও আরো অনেকে।[১৪]

ফিক্হতেও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। বসরার ফকীহদের মধ্যে তাঁকেও গণ্য করা হতো। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ফকীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাঁর মর্যাদা

হযরত আবুল 'আলিয়া যদিও একজন দাস ছিলেন, তবে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও ব্যাপক মনীষার কারণে অনেক বড় বড় সাহাবী তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) এতখানি সম্মান করতেন যে, আবুল 'আলিয়া যখন তাঁর কাছে যেতেন তখন তিনি তাঁকে একটি উঁচু স্থানে নিয়ে বসাতেন। তখন কুরায়শ বংশের অতি সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাঁর নীচে বসা থাকতেন। সম্মানের সাথে উচ্চ আসনে বসানোর পর বলতেন, জ্ঞান এভাবে মর্যাদাবান ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয় এবং দাসকে সিংহাসনে বসায়।[১৬]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) যখন বসরার ওয়ালী তখন একবার আবুল 'আলিয়া তাঁর নিকট যান। ইবন 'আব্বাস তাঁর হাত ধরে নিজের পাশে বসান। তাঁর প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন দেখে তামীম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ধৈর্যহারা হয়ে বলে ওঠে : এতো একজন দাস।[১৭]

---

১২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/৩৮৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬১

১৩. আত-তাবাকাত-৭/৮২; তাবি'ঈন-৫৩৮

১৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/৩৮৪

১৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬১

১৬. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/২২২

১৭. আত-তাবাকাত-৭/৮২; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/২২২

'ইবাদত-বন্দেগী

হযরত আবুল 'আলিয়ার যে পরিমাণ জ্ঞান ছিল তাঁর মধ্যে সেই পরিমাণ 'আমলও ছিল। তিনি একজন 'আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। রাত জেগে 'ইবাদত-বন্দেগী ও কুরআন তিলাওয়াত করার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও রুচি। জীবনের একটি সময়ে তিনি সারা রাত নামায পড়তেন এবং এক রাতে কুরআন খতম করতেন। কিন্তু এত কঠোর 'ইবাদত সারা জীবন চালিয়ে যেতে পারেননি। তিনি নিজেই বলেন, আমরা কয়েকজন দাস ছিলাম। তাদের কয়েকজন তাদের উপর ধার্যকৃত ট্যাক্স আদায় করতো, আর কয়েকজন করতো মনিবের সেবা। তবে আমরা সকলে সারা রাত জেগে এক রাতে পুরো কুরআন খতম করতাম। কিন্তু একাজ যখন ভীষণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো তখন দু'রাতে খতম করতে লাগলাম। কিন্তু এটাও যখন সম্ভব হলো না তখন তিন রাতে করতে লাগলাম। কিন্তু তাও সম্ভব না হওয়ায় আমরা একে অপরকে দোষারোপ করতে আরম্ভ করলাম। অতঃপর আমরা হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাহাবীদের কাছে গেলাম। তাঁরা বললেন, এক সপ্তাহে খতম কর। তাঁদের দিক নির্দেশনার পর আমরা রাতে নামায পড়ার সাথে সাথে ঘুমাতেও লাগলাম। তখন এই ক্লান্তিকর বোঝা হালকা হতে থাকে।[১৮]

তিনি কুরআন হিফ্জ (মুখস্থ) করা সম্পর্কে বলতেন : তোমরা পাঁচটি করে আয়াত মুখস্থ করবে। তাতে তোমাদের মাথায় চাপ কম পড়বে এবং বুঝতেও সহজ হবে। জিবরীল (আ) নবীর (সা) নিকট পাঁচটি করে আয়াত নিয়ে আসতেন।[১৯]

বৈরাগ্যবাদ পরিহার

প্রচুর 'ইবাদত-বন্দেগী করতেন সত্য, তবে রুহ্বানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। এমনকি রাহিব তথা বৈরাগীদের লেবাস-পোশাক পর্যন্ত পছন্দ করতেন না। একবার আবূ উমাইয়্যা আবদুল কারীম মোটা পশমী কাপড়ের পোশাক পরে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তাঁকে দেখে আবুল 'আলিয়া বলেন, এতো রাহিব তথা বৈরাগীদের পোশাক ও পদ্ধতি। মুসলিমগণ যখন পরস্পর পরস্পরের সাথে সাক্ষাতের জন্য যায় তখন ভালো পোশাক পরে যায়। তারপর তিনি আবদুল করীমকে লক্ষ্য করে বলেন : তুমি নিজে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ কর এবং যে এমন কাজ করে তাকে ভালোবাস। আর পাপ কাজ থেকে দূরে থাক। আল্লাহ ইচ্ছা করলে পাপীকে শাস্তি দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে মাফও করতে পারেন।[২০]

রিয়া তথা আত্মপ্রদর্শনী ভাব থেকে দূরে থাকা

ভালো কাজের প্রকাশকে তিনি দারুণ খারাপ মনে করতেন, কেউ এমন করলে তাকে রিয়াকার বলতেন। আবূ মাখলাদ বলেন, আবুল 'আলিয়া বলতেন, যখন তোমরা কোন

---

১৮. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯৩

১৯. প্রাগুক্ত-৩৯৭; হিলয়াতুল আওলিয়া-২/২১৯

২০. আত-তাবাকাত-৭/৮৩; 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯৬

ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনবে যে, আমি আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করি, তখন তোমরা তার অনুসরণ করবে না।[২১] সুফইয়ান ইবন উয়ায়না বলেন, আবুল 'আলিয়ার নিকট চারজনের বেশি মানুষ সমবেত হলে তিনি তাদেরকে রেখে উঠে চলে যেতেন।[২২]

আল্লাহর পথে ব্যয় করা

আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে উদার ছিলেন। তিনি নিজের সকল সম্পদ অথবা তার বড় একটা অংশ ভালো কাজের জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। ইবন সা'দের একটি বর্ণনার একটি বাক্য এ রকম : فأوصى أبو العالية بماله كله

– 'আবুল 'আলিয়া তাঁর সকল সম্পদ (আল্লাহর রাস্তায় খরচের জন্য) অসীয়াত করে যান।'

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, আবুল 'আলিয়া বলেন, আমি সোনা-রূপো যা কিছু রেখে যাচ্ছি তার এক-তৃতীয়াংশ আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবার-পরিজনদের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান ফকীর-মিসকীনদের জন্য। অবশ্য এর মধ্য থেকে আমার বেগম সাহেবার অংশ তোমরা দেবে।[২৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ভালোবাসা

হযরত রাসূলে কারীম (সা) ছিলেন পৃথিবীর সবকিছু থেকে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। এই প্রিয়তম ব্যক্তির সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থাকার দুঃখ আজীবন বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন। রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিমাণ অনুমান করা যায় একটি ঘটনা দ্বারা। একদিন রাসূলে কারীমের (সা) খাদিম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) একটি আপেল হাতে নিয়ে আবুল 'আলিয়ার হাতে তুলে দেন। তিনি আপেলটি হাতে নিয়ে ক্রমাগত চুমু দিতে লাগলেন, আর বলতে থাকলেন : যে বরকতময় হাত রাসূলুল্লাহর (সা) হাত স্পর্শ করেছে, সেই হাত এই আপেলটি স্পর্শ করেছে; এই আপেল সেই হাত স্পর্শ করেছে যে হাত রাসূলুল্লাহর (সা) হাত স্পর্শ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।[২৪]

জিহাদ

জিহাদের ময়দানেও আবুল 'আলিয়াকে দেখা যায়। তাঁর একজন সঙ্গী বলেন :[২৫]

---

২১. আত-তাবাকাত-৭/৮১

২২. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/২২২

২৩. আত-তাবাকাত-৭/৮১

২৪. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯৮

২৫. প্রাগুক্ত

كان أبو العالية أول من أذّن وراء النهر، وحارب فى بلاد الفرس والروم، وكان أول من رفع الأذان فى تلك الديار.

'আবুল 'আলিয়া হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি 'মা ওয়ারা' আন-নাহ্‌র' অঞ্চলে আযান দেন। তিনি পারসিক ও রোমানদের ভূমিতে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং সেই সকল স্থানে সর্বপ্রথম আযান দেন।' উল্লেখ্য যে, মধ্য এশিয়ার জায়হূন ও সায়হূন নদীর অপর তীরের অঞ্চলসমূহকে 'মাওয়ারা' 'আন-নাহ্‌র' বলে।

শিক্ষাদানের বিনিময়ে কোন প্রতিদান গ্রহণ না করা

তিনি ছাত্রদের যে জ্ঞানদান করতেন তার বিনিময়ে কোন কিছু গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করতেন না। একবার একটি মজলিসে তিনি ছাত্রদেরকে হাদীছ ও উপদেশ শোনালেন। মজলিস শেষে একজন ছাত্র বিনিময়ে কিছু অর্থ দিতে চাইলেন। আবুল 'আলিয়া তাকে আল্লাহর এই বাণীটি শোনালেন :

وَلاَ تَشْتَرُوْا بِأَيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلاً. – 'এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না।'[২৬] তারপর ছাত্রটির দিকে তাঁকিয়ে বললেন : ছেলে! আমি তোমাকে যা কিছু শিখিয়েছি তার বিনিময়ে তুমি কোন কিছু কখনো গ্রহণ করবে না। কারণ, জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মানুষদের প্রতিদান তো আল্লাহর কাছে রয়েছে। তাওরাতে লিখিত আছে : ওহে আদমের সন্তান! যেভাবে তোমাকে মুফ্‌ত জ্ঞান দান করা হয়েছে সেভাবে তুমিও মানুষকে মুফ্‌ত জ্ঞান দান কর।

ছাত্রটি তার এমন প্রস্তাব ও শিক্ষকের এমন জবাবে ভীষণ লজ্জা পেল। লজ্জায় সে ঘেমে গেল এবং কপালের ঘাম মুছতে লাগলো। আবুল 'আলিয়া ছাত্রের এমন বিব্রতকর অবস্থা লক্ষ্য করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন : ছেলে! লাজুক ও অহঙ্কারী এই দু'শ্রেণীর মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে না।[২৭] আমাকে মুহাম্মাদ (সা) এর সাহাবীরা বলেছেন : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোন কিছু করবে না। তাহলে যার উদ্দেশ্যে তুমি কাজটি করলে তার কাছেই তোমাকে সোপর্দ করা হবে।[২৮]

তারপর তিনি বলেন, আমরা পঞ্চাশ বছর ধরে একথা বলছি যে, মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ নির্দেশ দেন : তোমরা আমার এই অসুস্থ বান্দার আমলনামায় সেসব কাজ লিখতে থাক যা সে সুস্থ অবস্থায় করতো, যতক্ষণ না আমি তার জান কবজ করি অথবা তার পথ ছেড়ে দিই। আমরা একথাও পঞ্চাশ বছর ধরে বলে আসছি যে, মানুষের সব কর্মই আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করা হয়। যেসব কর্ম কেবল আল্লাহর জন্য করা হয়, সেগুলো দেখে তিনি বলেন : এগুলো আমার এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। আর যেগুলো গায়রুল্লাহর জন্য করা হয়, সেগুলো দেখে বলেন : এগুলোর প্রতিদান তার কাছেই চাওয়ার জন্য তোমরা তা করেছো।[২৯]

---

২৬. সূরা আল-বাকারা-৪১

২৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া-২২০

২৮. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯৬

২৯. প্রাগুক্ত-৩৯৭; হিলইয়াতুল আওলিয়া-২/২১৯

তারপর অত্যন্ত আবেগভরা কণ্ঠে নিম্নের কথাগুলো বলে তিনি মজলিস শেষ করেন :

'তোমরা ইসলাম শেখ ও শেখার পর তা আর প্রত্যাখ্যান করো না। সরল-সোজা পথে চলো। আর সেই পথ হলো ইসলাম। এই সরল-সোজা পথ ছেড়ে ডানে-বাঁয়ে যেয়ো না। তোমরা তোমাদের নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে থাক এবং বিভিন্ন ধরনের মত-পথ থেকে দূরে থাক। বিভিন্ন ধরনের মত-পথ তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যে আমাকে ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন অথবা প্রবৃত্তির অনুসারী মত-পথ থেকে রক্ষা করেছেন– এ দু'টি অনুগ্রহের মধ্যে কোন্‌টি যে উত্তম তা আমার জানা নেই।[৩০]

দাসমুক্তি

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি দাসদের মুক্তি দিতেন। একবার একটি দাসকে তিনি মুক্তি দেন। তার সেই মুক্তির সনদে নিম্নের কথাটি লেখা ছিল : 'একজন মুসলিম একজন নওজোয়ান দাসকে মুক্ত-স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানো পশুর মত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্তি দিচ্ছে। তার থেকে ভালো কাজ করিয়ে নেয়া ছাড়া তার উপর কারো কোন অধিকার নেই।'[৩১]

যাকাত-সাদাকা

অত্যন্ত নিয়মানুবর্তিতার সাথে যাকাত আদায় করতেন এবং তা বন্টনের জন্য মদীনায় পাঠিয়ে দিতেন। আবূ খালদা বলেন, আবুল 'আলিয়া তাঁর সম্পদের যাকাত নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার জন্য মদীনায় আহলি-বায়ত তথা নবী-পরিবারের নিকট পাঠিয়ে দিতেন।[৩২]

গৃহ-যুদ্ধ থেকে দূরে অবস্থান

আবুল 'আলিয়া একজন বীর এবং যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই বীরত্ব মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত হয়নি। তাঁর সময়ে সিফ্‌ফীনসহ আরো কতগুলো গৃহ-যুদ্ধ হয় এবং তা থেকে খুব অল্পসংখ্যক মুসলমান নিজেদেরকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়। তিনিও খুব আবেগ-উদ্দীপনার সাথে ঘর থেকে বের হন, কিন্তু পরে রণক্ষেত্র থেকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফিরে আসেন। আবূ খালদা বলেন, আবুল 'আলিয়া বলতেন, 'আলী ও মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, আমি তখন যুবক। যুদ্ধ তো আমার কাছে উপাদেয় খাবারের চেয়েও বেশি প্রিয় ছিল। এ কারণে আমিও পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে রণাঙ্গনে উপস্থিত হই। এমন বিশাল বাহিনী দেখলাম যার প্রান্তসীমা কোথায় তা দেখা যাচ্ছিল না। একদল তাকবীর ধ্বনি দিলে অন্য দলও তাকবীর দিচ্ছিল। আমি মনে মনে

---

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. আত-তাবাকাত-৭/৮৪

৩২. প্রাগুক্ত

চিন্তা করলাম, কোন দলকে আমি মু'মিন বলবো এবং কোন দলকে বলবো কাফির এবং কোন দলের সঙ্গেই বা থাকবো। কেউ তো আমাকে যুদ্ধ করতে চাপ প্রয়োগ করেনি। এসব কথা চিন্তার পর সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই আমি ফিরে আসি।[৩৩]

সন্দেহ-সংশয় থেকে দূরে অবস্থান

সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ জিনিস থেকে এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, যাদের আয়-উপার্জনের মধ্যে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকতো তাদের দেয়া পানিও পান করতেন না। এ কারণে মুদ্রা ব্যবসায়ী এবং ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের 'উশর আদায়কারীর দেয়া কোন খাবার খাওয়া তো দূরের কথা তাদের পানিও পান করতেন না। আবূ খালদা বলেন, একবার আমি আবুল 'আলিয়ার নিকট গেলাম। তিনি খাবার আনলেন। কিছু সবজির তরকারিও ছিল। সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এ তেমন তরকারি নয় যাতে হারামের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে। এ তরকারি আমার ভাই আনাস ইবন মালিক (রা) তাঁর খামার থেকে পাঠিয়েছেন। বললাম, তরকারিতে এমন কি থাকে যে খাওয়া যায় না। বললেন, সবজি সব সময় নোংরা ও ময়লা আবর্জনার স্থানে ভালো জন্মায়, যেখানে পেশাব-পায়খানা করা হয়।[৩৪]

তিনি অত্যন্ত সরল-সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কোন লোক-লৌকিকতা ও আচার-অনুষ্ঠানের পরোয়া করতেন না। এ কারণে তাঁকে কেন্দ্র করে কোন রকম তোড়জোড় ও বিশেষ ব্যবস্থাপনা মোটেই পছন্দ করতেন না। কোথাও গেলে গৃহকর্তাকে আগেই বলে দিতেন, ঘরে যা কিছু আছে তাই খাওয়াবে, বাজার থেকে কোন কিছু কেনাকাটা যেন তার জন্য করা না হয়।[৩৫]

ওফাত

সঠিক বর্ণনা মতে হিজরী ৯৩ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। তবে ভিন্ন একটি বর্ণনা মতে হিজরী ৯০ সনের শাওয়াল মাসে মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু হয়।[৩৬] হিজরী ১০৬ ও ১১১ সনেও তাঁর মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে।[৩৭] তবে ইবন হিব্বান ও বুখারী হিজরী ৯৩ সনের উপর জোর দিয়েছেন।[৩৮] মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্ব থেকে তিনি প্রতি মাসে একবার করে নিজের জন্য প্রস্তুতকৃত কাফনের কাপড় পরে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সাথে সাক্ষাতের অনুশীলন করতেন।[৩৯]

---

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. শাযারাত আয-যাহাব-১/১০২; তাবি'ঈন-৫৪১

৩৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬২; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/২২৩

৩৮. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/২৪৭

৩৯. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯৮

আবূ ইদরীস আল-খাওলানী (রহ)

হযরত আবূ ইদরীসের (রহ) আসল নাম 'আয়িযুল্লাহ, আবূ ইদরীস তাঁর ডাকনাম এবং এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। পিতার নাম 'আবদুল্লাহ। তাঁর বংশধারা সম্পর্কে দু'রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি এ রকম : 'আয়িযুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আমর এবং অন্যটিতে নাম 'আবদুল্লাহ বলা হয়েছে। সেটা হলো : 'আবদুল্লাহ ইবন ইদরীস ইবন 'আয়িয ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন গায়লান আল-খাওলানী। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় হিজরী অষ্টম সনে হুনায়ন যুদ্ধের বছর তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি একজন 'ইল্ম ও 'আমলের অধিকারী তাবি'ঈ ছিলেন। শামের বিশিষ্ট 'আলিমদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :[২]

أبـو ادريـس الخولانـي الدمشـقي عـالم أهـل الشـام الفقيـه أحـد مـن جمـع بـين العلم والعمل.

"আবূ ইদরীস আল-খাওলানী আদ-দিমাশ্কী ছিলেন শামের একজন 'আলিম, ফকীহ এবং যাঁদের মধ্যে 'ইল্ম ও 'আমলের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁদের একজন।"

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবুদ দারদা' (রা) যিনি শামে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর আবূ ইদরীস (রহ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[৩] ইউসুফ আল-মিয্যী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :[৪]

كان من علماء أهل الشام وعُبَّادهم وقرائهم.

'তিনি ছিলেন শামের 'আলিম, 'আবিদ ও কারীদের একজন।'

হাদীছ

হযরত আবূ ইদরীস (রহ) উঁচু স্তরের বহু সাহাবীর (রা) নিকট থেকে হাদীছ শোনেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেন। যেমন : হযরত 'উমার, আবুদ দারদা', মু'আয ইবন জাবাল, আবূ যার আল-গিফারী, বিলাল, ছাওবান, হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান, 'উবাদা ইবন আস-সামিত, 'আওফ ইবন মালিক, মুগীরা ইবন শু'বা, মু'আবিয়া ইবন আবী

---

১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৭৫; আত-তাবাকাত-৭/১৫৮

২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৬

৩. প্রাগুক্ত-১/৫৭

৪. তাহ্যীব আল-কামাল-৯/৩৮৪

সুফইয়ান, আবূ হুরায়রা, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) ও আরো অনেকে। ইমাম যাহাবী (রহ) হাদীছের শ্রেষ্ঠ হাফিজদের জীবনীর মধ্যে তাঁর জীবনী সন্নিবেশ করেছেন।[৫]

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনাও করেছেন তাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এখানে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম উপস্থাপন করা হলো : ইমাম যুহ্‌রী, রাবী'আ ইবন ইয়াযীদ, বুস্‌র ইবন 'উবায়দিল্লাহ, 'আবদুল্লাহ ইবন রাবী'আ ইবন ইয়াযীদ, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, ওয়ালীদ ইবন 'আবদির রহমান, ইউনুস ইবন মায়সারা, আবূ 'আওন আল-আনসারী, ইউনুস ইবন সায়ফ, মাকহূল, শাহ্‌র ইবন হাওশাব, সালামা ইবন দীনার (রহ) ও আরো অনেকে।[৬]

তিনি ছিলেন শামের বিখ্যাত ফকীহ্। ইমাম যুহ্‌রী (রহ) বলেন :[৭]

كان أبو ادريس من فقهاء الشام.

– 'আবূ ইদরীস ছিলেন শামের ফকীহদের মধ্যে অন্যতম।' ইমাম আত-তাবারী (রহ) শামের ঐ সকল 'আলিমের সাথে আবূ ইদরীসের জীবনী আলোচনা করেছেন যাঁরা কিস্‌সা-কাহিনী ও হালাল-হারামের বিধান সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন।[৮]

কাজী ও উপদেশ দানের দায়িত্ব পালন

ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর যোগ্যতার বড় সনদ এই যে, খলীফা 'আবদুল মালিকের সময়ে তিনি দিমাশকের কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৯] বিচার-ফায়সালার পাশাপাশি মানুষকে ওয়াজ-নসীহতের মহান দায়িত্বও পালন করতেন। পরে 'আবদুল মালিক ওয়াজ-নসীহতের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেন। তবে কাজীর পদে বহাল রাখেন। বিচার কাজের চেয়ে ওয়াজ-নসীহতের কাজটি তাঁর বেশি প্রিয় ছিল। এ কারণে তিনি বলতেন :[১০]

عزلوني عن رغبتي وتركوني في رهبتي.

"তারা আমার প্রিয় কাজটি থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং যে কাজ করতে আমি ভয় করি সেই কাজে আমাকে বহাল রেখেছে।"

তাঁর সমকালীন 'আলিমগণ তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শামের সবচেয়ে বড় 'আলিম মাকহূল (রহ) বলতেন :[১১]

---

৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৭
৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/৮৫; তাহ্‌যীব আল-কামাল-৯/৩৮৩
৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৭
৮. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/৮৭
৯. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৯/৩৮৫
১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৭
১১. প্রাগুক্ত

ما علمت أعلم من أبـى ادريـس. – 'আমি আবূ ইদরীসের চেয়ে বড় 'আলিম আর কেউ আছে বলে জানিনে।' আবূ যুর'আ দিমাশকী তাঁকে শামের 'আলিম জুবায়র ইবন নুফাইরের উপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি বলতেন :

أحسن أهل الشام لقيا لأجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبير بن نفـير وأبو ادريس وكثير بن مرة.

'রাসূলুল্লাহর (সা) শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের সাথে সাক্ষাতের দিক দিয়ে শামবাসীদের মধ্যে উত্তম হলেন জুবায়র ইবন নুফাইর, আবূ ইদরীস ও কাছীর ইবন মুররা।' একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, এই তিনজনের মধ্যে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য কে? বললেন : আবূ ইদরীস আল-খাওলানী।[১২]

ইমাম আন-নাসাঈ তাঁকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[১৩] ইয়াহইয়া মা'ঈন, আল-কাসিম ইবন সাল্লাম ও খলীফা ইবন খায়্যাত বলেছেন : হিজরী ৮০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৪]

---

১২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৮৫; তাহ্যীব আল-কামাল-৯/৩৮৫

১৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৭

১৪. তাহ্যীব আল-কামাল-৯/৩৮৭

আবূ কিলাবা জারমী (রহ)

হযরত 'আবদুল্লাহর (রহ) ডাকনাম আবূ কিলাবা এবং এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বসরার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বংশধারা এ রকম : 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন 'উমার ইবন নাতিল ইবন মালিক ইবন 'উবায়দ ইবন 'আলকামা ইবন সা'দ আল-জারমী।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি বসরার বিশিষ্ট তাবি'ঈদের মধ্যে ছিলেন। ইবন হাজার ও ইমাম যাহাবী (রহ) উভয়ে তাঁকে শীর্ষস্থানীয় 'আলিমদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[২] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী তাঁকে ইমাম এবং 'ইল্‌ম ও 'আমলে নেতৃস্থানীয় 'আলিম বলেছেন।[৩] আল-মিয্‌যী তাঁকে শীর্ষস্থানীয় ইমামদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

হাদীছ

হাদীছ বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও রুচি ছিল। এ কারণে সব সময় তার অন্বেষণে সময় অতিবাহিত করতেন। মাত্র একটি হাদীছের জন্য কয়েক দিন একই স্থানে অবস্থান করতেন। একবার একটি হাদীছের যাঁচাই বাছাইয়ের জন্য তিন দিন পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। শুধু এ ব্যস্ততা ছাড়া তখন সেখানে আর কোন কাজ ছিল না।[৫] তাঁর এমন প্রবল আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসু মনোভাব তাঁকে হাদীছের একজন বিশিষ্ট হাফিজে পরিণত করে। ইবন সা'দ তাঁকে একজন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক বলেছেন।[৬] তিনি তাঁকে বসরাবাসী মুহাদ্দিছদের দ্বিতীয় তবকা বা স্তরে স্থান দিয়েছেন।[৭]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত ছাবিত ইবন দাহ্‌হাক আল-আনসারী, সামুরা ইবন জুনদুব, 'আমর ইবন সালামা জারমী, মালিক ইবন হুওয়ায়রিছ, আনাস ইবন মালিক আল-আনসারী, হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা, আনাস ইবন মালিক কা'বী, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, মু'আবিয়া, আবূ হুরায়রা, নু'মান ইবন বাশীর, আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা) প্রমুখের সূত্রে বর্ণিত তাঁর হাদীছ

---

১. তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১০/১৫৫

২. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/২২৪; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯৪

৩. শাজারাত আয-যাহাব-১/১২৬

৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১০/১৫৫

৫. আত-তাবাকাত-৭/১৩৪

৬. প্রাগুক্ত

৭. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১০/১৫৭

পাওয়া যায়। বহু বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ তাবি'ঈর নিকট থেকেও তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন।[৮]

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আইউব আস-সাখতিয়ানী, আবূ রাজা', ইয়াহইয়া ইবন আবী কাছীর, আশ'আছ ইবন 'আবদির রহমান জারমী (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৯]

হাদীছ বর্ণনায় সংযত

তাঁর মুখ থেকে হাদীছ শোনার জন্য অনেক বড় বড় 'আলিম আগ্রহ প্রকাশ করতেন। কিন্তু অত্যধিক সতর্কতার কারণে অতি অল্পই বর্ণনা করতেন। আবূ খালিদ বলেন, আমরা হাদীছ শোনার জন্য আবূ কিলাবার নিকট যেতাম। তিনি তিনটি হাদীছ শোনানোর পর বলতেন, যথেষ্ট হয়েছে, আর না। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) মত বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারীও তাঁকে অনুরোধ করে হাদীছ শুনতেন। 'উমার ইবন মায়মূন বলেন, একবার আবূ কিলাবা গেলেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) নিকট। তিনি কিছু হাদীছ শোনানোর জন্য অনুরোধ করলেন। জবাবে তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমি বেশি হাদীছ বলা এবং একেবারে চুপ থাকা, দু'টোকেই খারাপ মনে করি।[১০]

ফিক্হ শাস্ত্রেও তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। আইউব আস-সাখতিয়ানী বলেন, আল্লাহর কসম! আবূ কিলাবা ছিলেন প্রজ্ঞাবান ফকীহদের একজন।[১১]

বিচার ক্ষমতা

ফিক্হ বিষয়ে দক্ষতার কারণে তাঁর মধ্যে বিচার ক্ষমতাও ছিল। আইউব বলেন, আমি বসরায় আবূ কিলাবার চেয়ে বেশি বিচার ক্ষমতাসম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি। মুসলিম ইবন ইয়াসার বলতেন, আবূ কিলাবা অনারবদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করলে 'কাজী আল-কুজাত' বা প্রধান বিচারপতি হতেন।[১২]

কাজীর পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি

বিচারের যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাজীর পদ গ্রহণ করতে ভীষণ ভয় পেতেন। আইউব বলতেন, আমি তাঁকে বিচার বিষয়ে যত বড় 'আলিম পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি তার থেকে কঠোরভাবে পলায়ণকারীরূপে। তিনি এ কাজকে ভীষণ খারাপ মনে

---

৮. প্রাগুক্ত-১০/১৫৬; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/২২৫

৯. প্রাগুক্ত

১০. আত-তাবাকাত-৭/১৩৪

১১. প্রাগুক্ত-৭/১৩৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১০/১৫৭

১২. প্রাগুক্ত

করতেন। কাজীর পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়। কিন্তু তিনি ভয়ে শামে পালিয়ে যান। দীর্ঘ দিন পর যখন ফিরে আসেন তখন আমি তাঁকে বললাম, যদি আপনি কাজীর পদ গ্রহণ করতেন এবং মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতেন তাহলে তাতে ছাওয়াব পেতেন। তিনি জবাব দেন, আইউব! মানলাম, এক ব্যক্তি সাঁতার কাটতে পারে; কিন্তু যদি সে সাগরে পড়ে যায় তাহলে কতটুকু সাঁতরাতে পারবে![১৩]

গ্রন্থাগার

সেই যুগে গ্রন্থাগারের প্রচলন খুব কম ছিল, বরং ছিল না বলা চলে। তবে আবূ কিলাবা জ্ঞানের প্রতি তীব্র আগ্রহের কারণে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। অন্তিম রোগ শয্যায় সে সম্পর্কে অসীয়াত করে যান যে, সংগৃহীত গ্রন্থগুলো আইউব সাখতিয়ানীকে দিবে। তিনি জীবিত না থাকলে জ্বালিয়ে দিতে হবে।[১৪]

মালিক বলেন :[১৫]

مات ابن المسيب والقاسم ولم يترك كتبا، ومات أبو قلابة فبلغنى أنه ترك حمل بغل كتبا.

'সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব ও আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ মৃত্যু বরণের সময় কোন গ্রন্থ রেখে যাননি। তবে আমি জেনেছি, আবূ কিলাবা মৃত্যু বরণের সময় এক খচ্চরের বোঝা পরিমাণ গ্রন্থ রেখে যান।'

বিদ'আত তথা দীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রচলন করার প্রতি ঘৃণা

তিনি 'আকীদা ও 'আমল তথা বিশ্বাস ও কর্মে সালফে সালিহীন বা পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে আদর্শ মানতেন এবং এ ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে অসি উত্তোলন করাও বৈধ মনে করতেন। বলতেন, যে ব্যক্তি কোন নতুন কথা বা কাজ চালু করে সে অসি উত্তোলনকে বৈধ করে দেয়। এমন লোকদের সাথে মেলা-মেশা ও তর্ক-বিতর্ক করাও তাঁর পছন্দ ছিল না। তাই তিনি নিষেধ করতেন, কেউ যেন বিদ'আতীদের নিকট না বসে, তাদের সাথে বাহাছ-মুনাজিরা না করে। আমার ভয় হয়, না জানি তারা তোমাদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিয়ে যায় এবং যে জিনিসকে তোমরা পরিষ্কারভাবে জান তাতে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। তিনি মনে করতেন এর প্রতিবিধান শুধুমাত্র তরবারি। আইউব বলেন, আবূ কিলাবা বলতেন, প্রবৃত্তির অনুসরণকারীরা অর্থাৎ বিদ'আতীরা পথভ্রষ্ট। আমার মতে তাদের ঠিকানা নিশ্চিত জাহান্নাম। আমি তাদেরকে ভালো করে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করেছি, তাদের মধ্যে যারা নতুন মত অথবা নতুন কথা প্রকাশ ও প্রচার করে তারা তরবারি ছাড়া তা থেকে বিরত

---

১৩. তাহ্যীব আল-কামাল-১০/১৫৮

১৪. আত-তাবাকাত-৭/১৩৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৪

১৫. তাহ্যীব আল-কামাল-১০/১৫৭

হয় না। নিফাক তথা কপটতার অনেক প্রকার আছে, এটাও তার মধ্যে একটি। অতঃপর নিম্নের এ আয়াতগুলো পাঠ করেন :

١. مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ. ٢. وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ. ٣. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ.

১. তাদের মধ্যে সেই সকল লোকও আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছে।[১৬] ২. তাদের মধ্যে সেই সকল লোক আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয়।[১৭] ৩. এবং তাদের মধ্যে সেই সকল লোক আছে যারা সাদাকা বন্টনের ব্যাপারে আপনার প্রতি দোষারোপ করে।[১৮]

তারপর তিনি বলেন, যদিও তাদের কথা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, তবে সন্দেহ সৃষ্টি ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে সকলে ঐক্যবদ্ধ। এদের সকলে তরবারির উপযুক্ত এবং তাঁদের সকলের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।[১৯]

বিদ'আতীদেরকে তিনি নিজের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে নিশ্চিত না হয়ে তাঁকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিতেন না। গায়লান ইবন জারীর বলেন, একবার আমি তাঁর সাথে মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। এ জন্য তাঁর বাড়ীতে গিয়ে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, হারূরী (খারিজী) না হলে আসতে পার।[২০]

একটি মারাত্মক বিদ'আত

আজকাল ইসলাম চর্চার নামে একটা নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তা হলো কিছু লোক হাদীছের বিপরীতে সব সময় কুরআন উপস্থাপনের দাবী করে। মূলতঃ এ এক মারাত্মক বিদ'আত। হযরত আবূ কিলাবার যুগেও এ জাতীয় কিছু লোকের উদ্ভব হয়। তিনি তাদেরকে পথভ্রষ্ট মনে করতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমরা কারো নিকট কোন সুন্নাহ বর্ণনা করবে এবং সে তার জবাবে যদি বলে এটা বাদ দিয়ে আল্লাহর কিতাব উপস্থাপন কর তাহলে তাকে পথভ্রষ্ট বলে জানবে।[২১]

নিজেকে চেনা

নিজের প্রকৃতি ও রহস্যকে যে চেনে সে মুক্ত এবং যে নিজেকে ভুলে যায় সে ধ্বংসের উপযুক্ত বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তিকে অন্যরা তার চেয়ে বেশি

---

১৬. সূরা আত-তাওবা-৭৯

১৭. প্রাগুক্ত-৬১

১৮. প্রাগুক্ত-৫৮

১৯. আত-তাবাকাত-৭/১৩৫

২০. প্রাগুক্ত-৭/১৩৪

২১. প্রাগুক্ত

জানে সে ধ্বংস এবং সে অন্যদের চেয়ে নিজেকে বেশি জানে সে মুক্তি লাভের উপযুক্ত।[২২]

প্রকৃত বিত্তবান ও প্রকৃত 'আলিম

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দান-অনুগ্রহের উপর যে তুষ্ট থাকে সেই প্রকৃত বিত্তবান, আর যে অন্যের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় সেই প্রকৃত 'আলিম বলে তিনি মনে করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে, সবচেয়ে বেশি বিত্তবান কে? বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করে, সবচেয়ে বড় 'আলিম কে? বললেন, যে অন্যের জ্ঞান থেকে নিজের জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটায়।[২৩]

বিপদ-মুসীবতে ধৈর্যধারণ

ধৈর্যধারণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল অনেকে উঁচুতে। অনেক বড় বড় বিপদ-মুসীবতে তিনি মোটেও ধৈর্যহারা হননি। 'আবদুল মু'মিন খালিদ বলেন, শেষ জীবনে আবূ কিলাবার হাত, পা ও চোখ অকেজো হয়ে যায়। এমন মারাত্মক অবস্থায়ও আল্লাহর প্রশংসা ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশমূলক কথা ছাড়া অন্য কিছু তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হতো না।[২৪]

তাঁর ব্যক্তি সত্তাকে অন্যদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির উপায় ভাবা হতো। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) শামের অধিবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন : যতদিন তোমাদের মাঝে আবূ কিলাবা অথবা তাঁর মত মানুষ বিদ্যমান আছেন ততদিন তোমরা কল্যাণের মধ্যে থাকবে :[২৫]

لن تزالوا بخير يا أهل الشام، مادام فيكم هذا، أو مثل هذا.

ওফাত

তিনি যখন অন্তিম রোগ শয্যায় তখন একদিন হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁকে দেখতে আসেন এবং তাঁকে দৃঢ় ও অটল থাকার উপদেশ দেন। এ রোগেই তিনি হিজরী ১০৪, মতান্তরে ১০৫ সনে ইনতিকাল করেন। হিজরী ১০৬ অথবা ১০৭ সনের কথাও বর্ণিত হয়েছে।[২৬]

---

২২. প্রাগুক্ত-৭/১৩৩

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৪

২৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/২২৫; তাহ্যীব আল-কামাল-১০/১৫৮

২৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৪; তাহ্যীব আল-কামাল-১০/১৫৯; আত-তাবাকাত-৭/১৩৫

ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব (রহ)

হযরত ইয়াযীদের (রহ) ডাকনাম আবূ রাজা'। কুরায়শ গোত্রের বানূ 'আমির ইবন লুওয়াই শাখার দাস ছিলেন।[১] ইবন লাহী'আ বলেন, তাঁর পিতা আবূ হাবীব আসওয়াদ ছিলেন "নাওবী' সম্প্রদায়ের লোক। ইয়াযীদ বলতেন।[২]

كان أبى من أهل دمقلة ونشأت بمصروهم علوية يعنى شيعة فقلبتهم عثمانية.

"আমার পিতা ছিলেন "দামকালা"র অধিবাসী এবং আমি মিসরে বেড়ে উঠি। দামকালাবাসীরা 'আলাবী তথা শী'আ। আমি তাদেরকে 'উছমানিয়্যা বা 'উছমানের (রা) অনুসারীতে পরিবর্তন করি।"

একটি ভিন্ন মতে তাঁর পিতা ছিলেন বানূ হিসল-এর এক মহিলার দাস এবং মাও ছিলেন দাসী।[৩] ইয়াযীদ হিজরী ৫৩ সনে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান ও মনীষায় তিনি তাবি'ঈ ইমামদের মধ্যে ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে "আল-ইমাম আল-কাবীর" বা শ্রেষ্ঠ ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] মিসরে তাঁর মাধ্যমেই সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান চর্চা শুরু হয়। আবূ সা'ঈদ ইবন ইউনুস বলেন :[৬]

كان مفتى أهل مصر فى أيامه وكان حليما عاقلا وكـان أول مـن أظـهر العلـم بمصـر والكلام فى الحلال والحرام ومسائل وقيـل : إنـهم كـانوا قبـل ذلـك يتحدثـون فـى بالفتن والملاحم والترغيب فى الخير.

"তিনি ছিলেন মিসরবাসীদের মুফতী। অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম মিসরে জ্ঞান, বিভিন্ন মাসয়ালা ও হালাল-হারাম চর্চার সূচনা করেন। তাঁর পূর্বে মিসরবাসীদের জ্ঞান চর্চা মূলতঃ উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা বিষয়ে আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।"

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর রিজাল-২০/২৯৭
২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৯
৩. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/২৯৫
৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/২৭৯
৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৯
৬. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-কামাল-২০/২৯৭

হাদীছ

তিনি মিসরের একজন বিশিষ্ট হাফিজে হাদীছ ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে একজন নির্ভরযোগ্য ও বহু হাদীছের বর্ণনাকারী বলেছেন।[৭] ইমাম আয-যাহাবী (রহ) বলেন :[৮] كان حجة حافظا للحديث. – "তিনি ছিলেন হাদীছের হুজ্জাত (প্রমাণ) ও হাফিজ।"

তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিছ আয-যুবায়দী, আবুত তুফায়ল, আসলাম ইবন ইয়াযীদ, আবূ 'ইমরান, ইবরাহীম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন হুনায়ন, খায়র ইবন নু'আইম, হাদরামী, সুওয়াইদ ইবন কায়স, 'আবদুর রহমান ইবন শাম্মাসা মিহ্‌রী, 'আবদুল 'আযীয ইবন আবিস সা'বা, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, 'আরাক ইবন মালিক, ইমাম আয-যুহ্‌রী (রহ) এবং আরো বহু মনীষীর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন। আর তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শোনেন তাঁদের মধ্যে সুলায়মান আত-তায়মী, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, যায়দ ইবন আবী উনায়সা, 'আমর ইবন আল-হারিছ, 'আবদুল হামিদ ইবন জা'ফার, ইবন লাহী'আ, লায়ছ ইবন সা'দ (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৯]

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ বিষয়েও তিনি ভীষণ পারদর্শী ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে ফকীহ্‌ বলে উল্লেখ করেছেন। খলীফা হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) মিসরে যে তিন ব্যক্তিকে ইফতার পদে নিয়োগ দেন, তাঁদের একজন হলেন এই ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব।[১০] বলা চলে তাঁরই চেষ্টায় সেখানে ফিক্‌হ চর্চার সূচনা হয়।

সমকালীন 'আলিমদের মূল্যায়ন

লায়ছ ইবন সা'দ বলতেন :[১১] يزيد عالمنا وسيدنا.

"ইয়াযীদ আমাদের 'আলিম ও আমাদের নেতা।" তিনি আরো বলতেন, ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব ও 'আবদুল্লাহ ইবন আবী জা'ফার উভয়ে দেশের দু'টি রত্ন। জনৈক ব্যক্তি 'আমর ইবন আল-হারিছকে প্রশ্ন করে : ইয়াযীদ ও 'আবদুল্লাহ-এ দু'জনের মধ্যে উত্তম কে? জবাবে তিনি বলেন : যদি দু'জনকে দু'পাল্লায় বসানো হয় তাহলে কোন পাল্লাই ঝুঁকবে না।[১২]

---

৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৩০

৮. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২০/২৯৮

৯. প্রাগুক্ত-২০/২৯৫, ২৯৭; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/৩১৮

১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১২৯

১১. প্রাগুক্ত

১২. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/২৭৯; তাহ্‌যীব আল-কামাল-২০/২৯৮; টীকা-১

সাবধানতা

হাদীছ বর্ণনায় সতর্ক তাবি'ঈদের মত তিনিও সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যখন তাঁর নিকট প্রশ্নকারীদের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন তিনি গৃহ অভ্যন্তরে নির্জনতা অবলম্বন করেন।[১৩]

জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা

তাঁর মধ্যে জ্ঞানের প্রতি প্রবল সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। এ কারণে কোন শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তির নিকট যাওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না। কারো প্রয়োজন হলে তাঁকে নিজের কাছে ডেকে আনতেন। একবার যাব্বান ইবন 'আবদিল 'আযীয লোক মারফত তাঁকে বলে পাঠালেন যে, আপনি একটু আমার নিকট আসুন, আপনার নিকট কিছু বিষয় আমার জানার আছে। তিনি জবাবে বলে পাঠালেন, আপনিই আমার এখানে আসুন। আমার নিকট আসা আপনার জন্য শোভন হবে, পক্ষান্তরে আপনার নিকট আমার যাওয়া হবে আপনার জন্য অশোভন।[১৪]

স্পষ্টবাদিতা

সত্য উচ্চারণে ছিলেন নির্ভীক। যত ক্ষমতাশালীই হোন না কেন কাউকে পরোয়া করতেন না। মুখের উপর তাদের দোষ-ত্রুটি বলে দিতেন। একবার তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন। মিসরের তৎকালীন আমীর আল-হাওছারা ইবন সুহায়ল সাক্ষাৎ করতে আসলেন। তিনি ইয়াযীদের নিকট জানতে চাইলেন : যে কাপড়ে মশার রক্ত লেগেছে, সেই কাপড়ে নামায আদায় হবে কি? প্রশ্ন শুনে তিনি আল-হাওছারার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তাঁর সাথে কোন কথাই বললেন না। আল-হাওছারা উঠতে যাবেন তখন তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, প্রতিদিন মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছেন, আর আমার নিকট মশার রক্তের কথা জিজ্ঞেস করছেন?[১৫]

ওফাত

হিজরী ১২৮ সনে তিনি ইনতিকাল করেন, একথা ইবন সা'দ বলেছেন। ৭৫ বছরের অধিক জীবন লাভ করেন।[১৬]

---

১৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৯

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. প্রাগুক্ত-১/১৩০

১৬. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/২৯৭

আবূ ওয়াইল শাকীক ইবন সালামা (রহ)

হযরত শাকীকের (রহ) ডাকনাম আবূ ওয়াইল এবং এ নামেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধ। পিতার নাম সালামা। তিনি আরবের আসাদ ইবন খুযায়মা গোত্রের সন্তান।[১] ইবন হিব্বান তাঁকে কূফায় বসবাসকারী, তথাকার একজন 'আবিদ এবং হিজরী ০১ সনে তাঁর জন্ম বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

রিসালাত যুগে

হযরত আবূ ওয়াইল (রহ) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালের কিছু অংশ লাভ করেন। তবে খুবই অল্প বয়স্ক ছিলেন। 'উমার ইবন মারওয়ান বলেন, একবার আমি আবূ ওয়াইলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সময়কাল পেয়েছিলেন? বললেন, হাঁ, তাঁকে দেখেছিলাম। তবে তখন আমি একজন অল্প বয়স্ক বালক।[৩] সঠিক বর্ণনা মতে তিনি একজন তাবি'ঈ ছিলেন। রাসূলে কারীমের (সা) দর্শন ও সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি।[৪]

একটি বর্ণনায় এসেছে, আবূ ওয়াইল বলতেন, আমি জাহিলী যুগের দশ মতান্তরে সাত বছর পেয়েছি। রাসূল (সা) যখন নবুওয়াত লাভ করেন তখন আমি মরুদ্যানে আমার পরিবারের উট-ছাগল চরাতাম।[৫] ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে مُخَضْرَمٌ جَلِيْلٌ –অতি সম্মানিত মুখাদরাম ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] উল্লেখ্য যে, যাঁরা জাহিলী ও ইসলামী যুগ লাভ করেছেন তাঁদেরকে বলা হয় 'মুখাদরাম'। তবে এ বর্ণনা তেমন নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

ইসলাম গ্রহণ

একটি বর্ণনা মতে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন। মুগীরা বলেন, আবূ ওয়াইল বলতেন, আমাদের গোত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে যাকাত-সাদাকা আদায়কারী আসেন।[৭] তিনি আমাদের থেকে পঞ্চাশটি উটের একটি উট নিলেন। আমার একটি ভেড়া ছিল। আমি সেটা তাঁর সামনে উপস্থিত করে বললাম, এর সাদাকা নিন। তিনি বললেন, এতে সাদাকা নেই।[৮]

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৬০
২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–৪/৩১৮
৩. আত-তাবাকাত–৬/৬৪
৪. তাহ্যীব আল-কামাল–৮/৩৮৭
৫. প্রাগুক্ত–৮/৩৮৮
৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৬০
৭. প্রাগুক্ত
৮. তাহ্যীব আল-কামাল–৮/৩৮৮

হযরত আবূ বাকরের খিলাফতকালে

হযরত আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে আরবের যে সকল গোত্র যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল আবূ ওয়াইলের গোত্রও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবূ ওয়াইলও সেই দলে ছিলেন। সুলায়মান আল-আ'মাশ বলেন, শাকীক আমাকে বলতেন, আহা, যদি এমন হতো! তোমরা বুযাখার রণক্ষেত্রে আমাদেরকে খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং সেখান থেকে পালাতে দেখতে! সেদিন আমি উটের পিঠ থেকে ছিটকে পড়ি এবং আমার ঘাড় ভাংতে ভাংতে বেঁচে যায়। সেদিন যদি আমি মারা যেতাম তাহলে আমার জন্য জাহান্নাম নিশ্চিত ছিল। সে সময় আমি ছিলাম দশ বছরের বালক।[৯] উল্লেখ্য যে, বুযাখার এ যুদ্ধটি হয় হযরত আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে বানূ আসাদ ও খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদের মধ্যে। এ যুদ্ধের পর তাঁর গোত্র যাকাত আদায় করে আত্মসমর্পণ করে।

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে

খলীফা হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ভুলের পূর্ণ কাফ্ফারা আদায় করেন। ইরাক অভিযানে তিনি একজন মুজাহিদ হিসেবে যোগ দেন। কাদেসিয়ার সেই বিখ্যাত যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। শাম অভিযানেও তাঁর অংশ গ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর নিজের একটি বর্ণনা এ রকম ঃ আমি উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সাথে শাম অভিযানে অংশ গ্রহণ করি।[১০] সম্ভবতঃ এ দ্বারা তিনি হযরত 'উমারের (রা) শাম সফরের সময় তাঁর সঙ্গে থাকার কথা বলতে চেয়েছেন।

ইসলাম ও মুসলমানদের বড় রকমের সেবার কারণে হযরত 'উমার (রা) তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করতেন। তিনি বলেন, 'উমার (রা) নিজ হাতে আমাকে চারটি উপহার দান করেন এবং বলেন, একবার 'আল্লাহু আকবর' বলা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম।[১১]

সিফ্ফীন যুদ্ধ

এ ছিল মুসলমানদের একটি রক্তক্ষয়ী গৃহ-যুদ্ধ। হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতকালে আমীরুল মুমিনীন 'আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে সিফ্ফীনে এ যুদ্ধটি হয়। এ যুদ্ধে আবূ ওয়াইল হযরত 'আলীর (রা) পক্ষে যোগ দেন; কিন্তু পরে এ জন্য ভীষণ অনুতপ্ত হন। আ'মাশ বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবূ ওয়াইলকে জিজ্ঞেস করে, আপনি সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন? জবাব দেন, হাঁ, অংশ গ্রহণ করেছিলাম।[১২] 'আসিম ইবন বাহ্দালা বলেন, শাকীক বলতেন, 'আলীর চেয়ে 'উছমান আমার বেশি প্রিয়।[১৩]

---

৯. প্রাগুক্ত

১০. আত-তাবাকাত–৬/৬৫

১১. প্রাগুক্ত–৬/৬৪

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৬০; তাহ্যীব আল-কামাল–৮/৩৮৯

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ও আবূ ওয়াইল

উমাইয়্যা শাসনামলে আবূ ওয়াইল ছিলেন অতি সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী মানুষ। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ছিলেন তাঁর ভীষণ গুণমুগ্ধ ব্যক্তি। তিনি আবূ ওয়াইলের সামনে কয়েকটি বড় বড় পদ উপস্থাপন করে তা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেন, হাজ্জাজ যখন কূফা আসেন তখন আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার নাম কি? বললাম ঃ নাম আপনার জানাই আছে, নইলে আমাকে ডেকে পাঠালেন কিভাবে? জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ শহরে এসেছেন কবে? বললাম ঃ সেই সময় যখন এই শহরের সকল অধিবাসী এসেছে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার কতটুকু কুরআন মুখস্থ আছে? বললাম ঃ এতটুকু যে, যদি আমি তা অনুসরণ করি তাহলে তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। উপরোক্ত প্রশ্নগুলো করার পর বললেন, আপনাকে এ জন্য ডেকেছি যে, আমি আপনাকে একটি পদ দিতে চাই। জানতে চাইলাম ঃ কোন ধরনের পদ। বললেন ঃ সিলসিলা অর্থাৎ বেড়ী পরিয়ে শাস্তি দানের পদ। বললাম ঃ এ পদ তো সেই সকল লোকদের জন্য উপযুক্ত যারা অত্যন্ত দায়িত্ব ও দক্ষতার সাথে এ কাজ করতে পারবে। যদি আপনি আমার সাহায্য নিতে চান তাহলে সেটা হবে একজন নির্বোধ ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য নেয়া। এ কারণে, যদি আপনি আমাকে এ পদ গ্রহণ থেকে রেহাই দেন তাহলে তা আমার জন্য উত্তম হবে। আপনি চাপাচাপি করলে এই বিপজ্জনক পদটি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছি। তবে একথাও বলতে চাই যে, যখন আমি আপনার কর্মচারী নই তখন রাতের বেলা আপনার কথা স্মরণ করতে করতে ঘুম এসে যায়। তাহলে যখন আপনার কর্মচারী হবো তখন আমার অবস্থা কেমন হবে? মানুষ আপনার ভয়ে এত ভীত যে, অতীতের কোন আমীরের ভয়ে ততটা হয়নি। আমার এ বক্তব্য তাঁর পছন্দ হয় এবং তিনি বলেন, এর কারণ হলো, কোন ব্যক্তি রক্তপাতের ব্যাপারে আমার মত এত দুঃসাহসী নয়। আমি এতসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছি যার ধারে কাছে যেতেও মানুষ ভয় পায়। আমার এমন কঠোরতার কারণে আমার সকল সঙ্কট সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনি এখন যান। যদি অন্য কোন উপযুক্ত মানুষ পেয়ে যাই তাহলে আপনাকে কষ্ট দেব না। অন্যথায় আপনাকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে। এভাবে মুক্তি পাওয়ার পর আবূ ওয়াইল ফিরে আসেন এবং আর কখনো হাজ্জাজের ধারে কাছে যাননি।[১৪] উমাইয়্যা যুগের শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাঁর মোটেই সুধারণা ছিল না। একবার তিনি তাঁর ছাত্র আল-আ'মাশকে বলেন ঃ[১৫]

يا سليمان مافى أمرائنا هؤلاء واحدة من اثنتين، ما فيهم تقوى أهل الاسلام ولا عقول أهل الجاهلية.

---

১৪. আত-তাবাকাত–৬/৬৬

১৫. তাহ্যীব আল-কামাল–৮/৩৮৯

'সুলায়মান! আমাদের এ সময়ের আমীর-উমারাদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের একটিও নেই। তাদের না আছে ইসলামী যুগের মানুষের তাকওয়া, আর না আছে জাহিলী যুগের মানুষের বুদ্ধিমত্তা।'

তাহসীলদারের পদ

কিছু বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি উমাইয়্যা যুগে সাদাকা-যাকাতের তাহসীলদার পদে কাজ করেছেন। মুহাজির আবুল হাসান বলেন, একবার আমি আবূ বুরদা ও শাকীকের নিকট যাকাতের অর্থ নিয়ে যাই। তাঁরা তখন বায়তুল মালে কাজ করতেন। তাঁরা আমার সে অর্থ বায়তুল মালে ঢুকিয়ে নেন। এই বর্ণনার একজন রাবী সা'ঈদ বলেন, আমি দ্বিতীয়বার যাকাতের অর্থ নিয়ে গেলে শুধু আবূ ওয়াইলকে পাই। তিনি বলেন, এ অর্থ ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং নির্ধারিত খাতসমূহে তা ব্যয় কর। বললাম مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ (অন্তরসমূহকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্টকরণ)-এর অংশটির কি হবে? বললেন ঃ সেটি অন্যদেরকে দিয়ে দাও।[১৬]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের জগতে হযরত আবূ ওয়াইল (রহ) কূফার একজন বিশিষ্ট 'আলিম ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে কূফার শায়খ ও 'আলিম বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা এবং মহত্ত্বের ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য আছে।[১৮] ইবন সা'দ বলেছেন ঃ كان ثقة كثير الحديث 'তিনি ছিলেন অতিবিশ্বস্ত বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী।'[১৯]

কুরআন

তিনি কুরআনের হাফিজ ছিলেন। এত তীক্ষ্ণ মেধাবী ছিলেন যে, মাত্র দু'মাসে কুরআনের শিক্ষা শেষ করেন। তবে কুরআনের তাফসীর বর্ণনার ক্ষেত্রে দারুণ সতর্ক ছিলেন।[২০]

হাদীছ

ইল্‌মে হাদীছের ক্ষেত্রে ইবন সা'দ তাঁকে দৃঢ়পদ, বিশ্বস্ত ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক বলেছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ বাকর, 'উমার, 'উছমান, 'আলী, মু'আয ইবন জাবাল, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান, খাব্বাব ইবন আরাত, কা'ব ইবন 'আজরা, আবূ মাস'উদ আল-আনসারী, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, আবূ হুরায়রা, 'আয়িশা, উম্মু সালামা (রা) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ

---

১৬. আত-তাবাকাত-৬/৬৫
১৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬০
১৮. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/২৪৭
১৯. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৮/৩৮৯; আত-তাবাকাত-৬/৬৫
২০. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬০

ব্যক্তিবর্গের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২১] বিশেষতঃ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) হাদীছসমূহ তাঁর স্মৃতিতে বেশি সংরক্ষিত ছিল। কূফায় ইবন মাস'উদের হাদীছের তাঁর চেয়ে বড় কোন হাফিজ ছিলেন না।[২২] একবার আবূ 'উবায়দাকে জিজ্ঞেস করা হয়, কূফায় ইবন মাস'উদের হাদীছের সবচেয়ে বড় 'আলিম কে? তিনি জবাব দেন ঃ আবূ ওয়াইল।[২৩]

ছাত্রবৃন্দ

অনেক বড় বড় তাবি'ঈ তাঁর ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যেমন ঃ শা'বী, 'আসিম, আ'মাশ এবং সাধারণ মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মানসূর, যুবায়দ-আল ইয়ামামী, হাবীব ইবন আবী ছাবিত, 'আসিম ইবন বাহদালা, 'আবদুহু ইবন লুবাবা, 'আমর ইবন মুররা, জামি' ইবন রাশিদ, আল-হাকাম ইবন 'উতবা, হাম্মাদ ইবন আবী সুলায়মান, যুবায়র ইবন 'আদী, সা'ঈদ ইবন মাসরূক আছ-ছাওরী, 'আতা' ইবন আস-সায়িব, মুসলিম আল-বাতীন, মুহাজির আবুল হাসান (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৪]

'আলিমদের মধ্যে আবূ ওয়াইলের স্থান

সেই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ তাঁকে শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করতেন। আ'মাশ বলেন, ইবরাহীম আমাকে উপদেশ দেন যে, তুমি শাকীকের (আবূ ওয়াইল) নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন কর। 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) সাথী ও ছাত্ররা সকলে তাঁকে তাঁদের দলের সেরা বলে গণ্য করতেন।[২৫]

আল্লাহর ভয়

তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয় এত প্রবল ছিল যে, যখন তাঁর সামনে কোন উপদেশ দেয়া হতো অথবা ভীতিমূলক আলোচনা হতো তখন তার দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতো।[২৬] তিনি বসরার 'আবিদ তাবিঈদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। 'ইবাদত-বন্দেগী ছিল তাঁর একান্ত কাজ। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি দৃঢ়পদ বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন। কূফায় স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলেন এবং সেখানকার তাপস ও দুনিয়া বিরাগী মানুষের একজন ছিলেন।[২৭] তাঁর 'ইবাদত-বন্দেগীর বিশেষ সময় ছিল রাতের অন্ধকার। সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে অত্যন্ত বিনীতভাবে দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমাকে মাফ করে দিন। যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন তাহলে

---

২১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–৪/৩৬১; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৬০; তাহ্যীব আল-কামাল–৮/৩৮৭

২২. তাহ্যীব আল-আসমা'–১/২৪৭

২৩. তাহ্যীব আল-কামাল–৮/৩৮৮

২৪. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–৪/৩৬২

২৫. আত-তাবাকাত–৬/৬৭

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–৪/৩৬৩

ধারাবাহিক পাপসমূহকেও ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি শাস্তি দেন, তাহলে শাস্তি দানের ক্ষেত্রে আপনি জালিম হবেন না।[২৮]

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীনতা

দুনিয়ার সাথে নামকা ওয়াস্তে একটা সম্পর্ক ছিল। থাকার জন্য মামুলি ধরনের একটা খড়ের ঝুপড়ি ঘর ছিল, সেখানে তিনি জিহাদের সঙ্গী ঘোড়াটিসহ থাকতেন। যখন জিহাদে বের হতেন তখন ঝুপড়ি ঘরটি উঠিয়ে ফেলতেন। ফিরে এসে আবার বানিয়ে নিতেন।[২৯]

হালাল উপার্জন

হালাল উপার্জনের ব্যাপারে দারুণ সতর্ক ছিলেন। বিনাশ্রমে অঢেল সম্পদ প্রাপ্তির বিপরীতে হালাল উপায়ে অর্জিত একটি দিরহামকে বেশি পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, ব্যবসার এক দিরহাম আমার বেতনের দশ দিরহাম থেকে বেশি প্রিয়।[৩০]

তাঁর সত্তাটি ছিল শুভ ও কল্যাণের নিমিত্ত

তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কারণে মানুষ তাঁকে রহমত ও বরকতের (দয়া-অনুগ্রহ) উপলক্ষ্য মনে করতো। ইবরাহীম বলতেন, প্রত্যেক স্থানে এমন এক সত্তা অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন যার কল্যাণে সেই জনপদ বিভিন্ন ধরনের আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। আমার বিশ্বাস, শাকীকও সেই সকল লোকের মধ্যে অন্যতম।[৩১] সাহাবায়ে কিরামও তাঁর নৈতিক উৎকর্ষের কথা স্বীকার করতেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের উপর তাঁর নৈতিক প্রভাব এতখানি ছিল যে, তাঁকে দেখা মাত্র বলতেন, এ হলো তায়িব (তাওবাকারী)।[৩২]

ওফাত

হিজরী ৮২ সনে ইনতিকাল করেন। আল-ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতকালে তাঁর ইনতিকাল হয়। কিন্তু এ বর্ণনা সঠিক মনে হয় না। কারণ, সে হিসাবে তাঁর বয়স অনেক বেড়ে যায়।[৩৩]

---

২৮. আত-তাবাকাত–৬/৬৭

২৯. প্রাগুক্ত–৬/৬৮

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–১/২৪৭

৩২. আত-তাবাকাত–৬/৬৮

৩৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৬০; তাহ্যীব আল-কামাল–৮/৩৮৮

জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ আস-সাদিক (রহ)

তাঁর পূর্ণ নাম আবূ আবদিল্লাহ জা'ফার, আস-সাদিক তাঁর উপাধি। ইতিহাসে তিনি ইমাম জা'ফার আস-সাদিক নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকির (রহ), যিনি শী'য়াদের ইমামিয়া সম্প্রদায়ের ৫ম ইমাম। তাঁর বংশ তালিকা এমন ঃ জা'ফার ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন হুসায়ন ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা)। তাঁর মা ফারওয়া ছিলেন হযরত আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) প্রপৌত্র কাসিম ইবন মুহাম্মাদের কন্যা। তাঁর মাতৃকুলের বংশ তালিকা এমন ঃ ফারওয়া বিন্‌ত কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদির রহমান ইবন আবূ বাকর (রা)। এভাবে হযরত জা'ফার আস-সাদিক-এর শিরা-উপ-শিরায় সিদ্দীকী রক্ত বহমান হয়। হিজরী ৮০ (আশি) সনে তিনি মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি 'ইল্‌ম ও 'আমলের এমন এক খান্দানের বংশধর যাদের অতি নগণ্য একজন খাদিমও জ্ঞানের উচ্চ আসন অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁর মহান পিতা ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকির (রহ) এমন উঁচু পর্যায়ের আলিম ছিলেন যে, ইমাম আ'জাম আবূ হানীফার (রহ) মত উম্মাতের শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁর ছাত্র ছিলেন। এ কারণে জা'ফার আস-সাদিক উত্তরাধিকার সূত্রে জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান ও মনীষার দিক দিয়ে তিনি তাঁর সময়ের একজন ইমাম ছিলেন। ইমাম যাহাবী তাঁকে ইমাম ও শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা বলে উল্লেখ করেছেন।[২] আহলি বায়তের (নবী-বংশ) মধ্যে জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। ইবন হিব্বান বলেন, ফিক্‌হ শাস্ত্র, অন্যান্য জ্ঞান এবং কৃতিত্ব ও মর্যাদায় তিনি আহলি বায়তের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।[৩] ইমাম নাওবী লিখেছেন, তাঁর ইমামতি, জালালত ও সিয়াদাত তথা অগ্রগামিতা, মহত্ত্ব ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।[৪]

হাদীছ

হাদীছ তো হলো তাঁরই এক উর্ধ্বতন মহান পুরুষেরই কথা, কাজ ও সমর্থন। সুতরাং তাঁর চেয়ে আর কে এর অধিক হকদার হতে পারে? সুতরাং তিনি বিখ্যাত হাফিজে হাদীছের একজন ছিলেন। ইবন সা'দ লিখেছেন;[৫] كان كثير الحديث – তিনি ছিলেন

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ–১/১৬৬

২. প্রাগুক্ত

৩. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব–২/১০৪

৪. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত–১/১৫০

৫. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব–২/১০৪

বহু হাদীছের ধারক-বাহক। হাফিজ যাহাবী তাঁকে অন্যতম নেতা ও শীর্ষস্থানীয় হাফিজ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] হাদীছের জ্ঞান তিনি লাভ করেন তাঁর মহান পিতা হযরত ইমাম বাকির, মুহাম্মাদ ইবন মুনকাদির, 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবী রাফি', যুহরী (রহ) ও আরো অনেকের নিকট থেকে। তাঁর খ্যাতিমান ছাত্র শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ শু'বা, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, ইবন জুরায়জ, আবূ 'আসিম, ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা, ইয়াহইয়া আল-কাত্তাল, হাতিম-ইবন ইসমা'ঈল (রহ)সহ আরো অনেক ইমাম। তিনি তাঁর ছাত্রদের বলতেন, তোমরা আমার নিকট জিজ্ঞেস কর। কারণ, আমার পরে তোমাদেরকে আর কেউ আমার মত হাদীছ শোনাতে পারবে না।[৭]

হাদীছের প্রতি সম্মান

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাদীছের প্রতি এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল যে, সর্বদা পাক-পবিত্র অবস্থায় হাদীছ বয়ান করতেন।[৮] ফিক্‌হ শাস্ত্রে এতখানি দক্ষতা অর্জন করেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও ইমামুল আয়িম্মা হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বলতেন, আমি জা'ফার ইবন মুহাম্মাদের চেয়ে বড় ফকীহ আর দেখিনি।[৯] তিনি 'আলিমগণকে অত্যধিক সমীহ ও সম্মান করতেন। বলতেন, 'আলিমগণ হচ্ছেন নবীগণের আমানতদার, যতক্ষণ তাঁরা শাসকবর্গের তোষামোদকারী না হয়।

তাঁর কিছু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাণী

তাঁর মূল্যবান কথা ও বাণীসমূহ নীতি-নৈতিকতার ভিত্তি; জ্ঞান, মনন, চিন্তা এবং উপদেশ-অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার স্বরূপ। সুফইয়ান আছ-ছাওরীকে (রহ) একবার তিনি বলেন ঃ সুফইয়ান! আল্লাহ যখন তোমাকে কোন কিছু দান করেন এবং যদি তুমি তা সর্বদা বহাল রাখতে চাও তাহলে বেশি বেশি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর কিতাবে বলেছেন ঃ[১০]

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ.

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই আরো বেশি করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" যখন আল্লাহর কোন অনুগ্রহ অথবা কল্যাণ লাভ করবে তখন বেশি করে আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করবে। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন ঃ[১১]

---

৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ–১/১৬৬

৭. প্রাগুক্ত; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব–২/১০৩

৮. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব–২/১০৫

৯. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ–১/১৬৬

১০. সূরা ইবরাহীম–৭

১১. সূরা নূহ–১০-১২

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّه كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَّيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَّيَجْعَلْ لَكُمْ نَهَارًا.

"অতঃপর আমি বলেছি, 'তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।"

যখন তোমাদের নিকট শাসক অথবা কারো কোন আদেশ পৌঁছে তখন বেশি করে لا حول ولا قوة الا بالله – পাঠ করবে। তিনিই প্রশস্ততার চাবিকাঠি। যে ব্যক্তি নিজের ভাগ্যের অংশটুকুর উপর তুষ্ট থাকে সেই ঐশ্বর্যবান। আর যে অন্যের অর্থ সম্পদের দিকে তাকিয়ে থাকে সেই বিত্তহীন। যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্টনে খুশী হয় না, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর ফয়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। যে ব্যক্তি অন্যের গোপন কথা ফাঁস করে দেয়, আল্লাহ তার ঘরের গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দেন। যে বিদ্রোহের জন্য তরবারি কোষমুক্ত করে সে তাতেই নিহত হয়। যে নিজের ভাইয়ের জন্য গর্ত খোঁড়ে সে তাতেই পতিত হয়। যে নির্বোধদের সঙ্গে উঠাবসা করে সে হেয় ও তুচ্ছ হয়ে যায়। যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করে সে সম্মানিত হয়। যে খারাপ স্থানে যায় তার দুর্নাম হয়ে যায়। সর্বদা সত্যকথা বল, তা তোমার পক্ষে হোক বা বিপক্ষে। মানুষের মূল বস্তু হলো তাঁর বুদ্ধি, আর দীন হল তার আভিজাত্য। তার মহানুভবতা হল তার তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি)। আদমের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে সব মানুষ সমান। শান্তি ও নিরাপত্তা খুব দুর্লভ জিনিস, এমনকি তা তালাশ করার স্থানও গোপনীয়। যদি কোথাও পাওয়া যায় তাহলে সম্ভবতঃ তা নাম-নিশানাশূন্য বিজনতার এক কোণে পাওয়া যাবে। যদি তুমি সেখানে তালাশ কর এবং না পাও, তাহলে একাকীত্বের মধ্যে পাবে। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি একাকী নির্জনবাসের মধ্যে না পাও তা পাবে সালফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ মানুষদের কথার মধ্যে।

ইসতিগফার

তিনি বলতেন, তুমি কোন পাপ করে বসলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাগফিরাত কামনা করবে। মানুষের সৃষ্টির পূর্বেই তার ঘাড়ে ভুলের বেড়ী লেগে গেছে। পাপের উপর জেদ ধরা হলো ধ্বংস হওয়া। তিনি বলতেন, আল্লাহ দুনিয়ার প্রতি প্রত্যাদেশ (وحى) পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি আমার সেবা করবে তুমি তার সেবা কর, আর যে তোমার সেবা করবে, তুমি তাকে অক্ষম করে দেবে।

ভালো কাজের শর্তাবলী

তিনি বলতেন, তিনটি জিনিস ছাড়া কোন ভালো কাজ পূর্ণতা লাভ করে না। যখন তুমি কোন কাজ করবে তখন সে কাজকে নগণ্য মনে করবে, গোপনে করবে ও তাড়াতাড়ি

করবে। যখন তুমি তা নগণ্য মনে করবে তখন তার মর্যাদা বেড়ে যাবে। তুমি তা গোপন রাখলে তা পূর্ণতা পাবে। আর তা তাড়াতাড়ি করলে তুমি মাধুর্য অনুভব করবে।

সুধারণা

তিনি বলতেন, যখন তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে তোমার ব্যাপারে কোন অপ্রিয় কথা প্রকাশ পায় তখন তার যথার্থতার জন্য এক থেকে সত্তরটি ব্যাখ্যা তালাশ কর। যদি তাতেও যথার্থতা না পাও, তাহলে ধরে নেবে অবশ্যই কোন কারণ এবং কোন ব্যাখ্যা আছে যা তোমার জানা নেই। যদি তুমি কোন মুসলিমের মুখ থেকে কোন কথা শোন তাহলে তা থেকে ভালো থেকে আরো ভালো অর্থ বের করার চেষ্টা করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে নিজেকে তিরস্কার করবে।

শিষ্টাচার ও নৈতিকতা

তিনি বলতেন, চারটি জিনিসে কোন ভদ্রজনের লজ্জা করা উচিত নয়। ১. পিতার সম্মানে নিজ আসন থেকে উঠা, ২. অতিথির সেবা, ৩. নিজের গৃহে একশো চাকর-বাকর থাকলেও নিজে অতিথির বাহন পশুর দেখা-শুনা করা, ৪. নিজ শিক্ষকের সেবা করা।

একটি সূক্ষ্ম কথা

যখন দুনিয়া কারো অনুকূলে যায় তখন অন্যের ভালো কিছুও তাকে দিয়ে দেয়, আর যখন মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন তারই ভালো কিছু ছিনিয়ে নেয়।

নৈতিক উৎকর্ষতা

তাঁর ব্যক্তি সত্তাটি ছিল নৈতিক উৎকর্ষতার বাস্তব প্রতীক। তাঁকে এক নজর দেখাই তাঁর খান্দানী শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্যদানের জন্য যথেষ্ট ছিল। আমর ইবন আল-মিকদাম বলেন, যখন আমি জা'ফার ইবন মুহাম্মাদকে দেখতাম তখন তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়ামাত্র আমি জেনে যেতাম যে, তিনি নবী-খান্দানেরই মানুষ।[১২]

'ইবাদত-বন্দেগী

ইবাদত ছিল তাঁর রাত-দিনের বৃত্তি। তাঁর কোন দিন এবং কোন সময় 'ইবাদত থেকে শূন্য ছিল না। ইমাম মালিক বলেন, আমি একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতাম। সব সময় আমি তাঁকে পেয়েছি হয় নামাযে না হয় রোযা রাখা অবস্থায় অথবা কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে।[১৩]

আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয়

আল্লাহর রাস্তায় অর্থব্যয়, দানশীলতা এবং অন্যের দোষ উপেক্ষা করা– এ তিনটি

---

১২. তাহ্যীব আল-আসমা'–১/১৫০

১৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–২/১০৪

বিশেষগুণ আহলি বায়তের সকল সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তবে জা'ফার আস-সাদিক-এর সত্তা ছিল এই গুণগুলোর পরিপূর্ণ নমুনা। হায়্যাজ ইবন বুসতাম বলেন, জা'ফার আস-সাদিক (রহ) অনেক সময় বাড়ির সব খাবার অন্যদেরকে খাইয়ে দিতেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না।[১৪]

পোশাক-পরিচ্ছদ

প্রকাশ্যে তিনি দুনিয়াদার লোকদের পোশাকে থাকতেন। কিন্তু অভ্যন্তরে থাকতো দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ মানুষের পোশাক। সুফইয়ান ছাওরী (রহ) বলেন, আমি একবার জা'ফার ইবন মুহাম্মাদের নিকট গেলাম। তখন তাঁর গায়ে ছিল খুযের[১৫] জুব্বা এবং দাখানী খুযের চাদর। আমি বললাম, আপনার মহান পূর্ব-পুরুষের পোশাক তো এ ছিল না। বললেন, তাঁরা ছিলেন দরিদ্র ও অভাবের সময়ের মানুষ। আর এ যুগে সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। এ কথা বলে তিনি তাঁর দেহের উপরের কাপড় উঠিয়ে দেখান। তখন দেখা গেল খুযের জুব্বার নীচে রয়েছে পশমী মোটা জোব্বা। বললেন, ছাওরী, এটা আমরা পরেছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আর ওটা তোমাদের জন্য। যা আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরেছি তা নীচে গোপন রেখেছি। আর তোমাদের জন্য যা পরেছি তা উপরে রেখেছি।[১৬]

দীনী বিষয়ে মতপার্থক্য করা থেকে দূরে থাকার উপদেশ

দীনী বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য ও বিবাদ করা মোটেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, তোমরা দীনী বিষয়ে বিতণ্ডা করবে না। কারণ, তা অন্তরকে ব্যস্ত রাখে এবং তার মধ্যে নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি করে।[১৭]

তিনি অত্যন্ত সাহসী, নির্ভিক ও নিঃশঙ্কচিত্তের মানুষ ছিলেন। স্বৈরাচারী শাসকদের সামনেও দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, কোন রকম ভয়-ভীতি তাঁর মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারেনি। একবার প্রতাপশালী 'আব্বাসীয় খলীফা মানসূরের গায়ে একটি মাছি এসে বসে। তিনি তাড়িয়ে দেন, কিন্তু আবার এসে বসে। এভাবে তিনি বার বার তাড়াচ্ছেন, আর মাছিটিও বার বার উড়ে এসে বসছে। এর মধ্যে জা'ফার ইবন মুহাম্মাদ (রহ) এসে হাজির হলেন। মানসূর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আবূ 'আবদিল্লাহ! মাছি কি জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, স্বৈরাচারীদেরকে অপমান করার জন্য।[১৮]

---

১৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/১৬৬

১৫. 'খুয' হলো পশম ও রেশম সূতোর তৈরি কাপড়

১৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/১৬৭

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. সাফওয়াতুল সাফওয়া–১৩১

হযরত আবূ বাকর (রা) সম্পর্কে বিশ্বাস

যদিও সকল সত্যপন্থী আহলি বায়ত চার খলীফার প্রতি সমান সুধারণা পোষণ করতেন, তবে যেহেতু জা'ফার আস-সাদিকের (রহ) শিরা-উপশিরায় হযরত আবূ বাকরের (রা) রক্ত প্রবাহিত ছিল, এ কারণে তাঁর সাথে তিনি এক বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি নিজের ঊর্ধ্বতন পুরুষ 'আলীর (রা) মত তাঁর উপরও নিজের অধিকার আছে বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, আমার 'আলীর (রা) নিকট থেকে যে পরিমাণ শাফা'আতের আশা আছে, ঠিক ততটুকু আবূ বাকরের (রা) থেকেও আছে।[১৯] হিজরী ১৪৮ সনে তাঁর ওফাত হয়।[২০]

---

১৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-২/১০৪

২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৬৭

মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' আল-আয্দী (রহ)

মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' আল-আযদী (রহ) একজন মহান তাবি'ঈ। ডাকনাম আবূ বাকর, মতান্তরে আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মহান খাদিম ও সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক আল-আনসারীর (রা) ছাত্র। এ কারণে তিনি "যায়নুল ফুকাহা" (ফকীহ্দের শোভা) উপাধি লাভ করেন। তবে তিনি "আবিদুল বাসরা" বা বসরার তাপস উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[১]

বসরায় তাঁর জন্ম এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। মদীনায় জ্ঞান অর্জন করেন। বিশেষতঃ ফিক্হ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। জ্ঞানের জগতে সুউচ্চ আসনের অধিকারী হন। মালিক ইবন দীনার (রহ) তাঁর সম্পর্কে বলেন :

القرَّاء ثلاثة : فقارئى للرحمن، وقارئ للدينار، وقارئى للملكوك، ويــاهؤلاء، محمـد بن واسع الأزدى عندى من قراء الرحمن.

'কারী বা আল-কুরআনের পাঠক তিন প্রকার : দয়াময় (আল্লাহর) কারী, দীনার-দিরহামের কারী এবং রাজা-বাদশাদের কারী। ওহে তোমরা শুনে রাখ, আমার জানা মতে মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' আল-আযদী হলেন দয়াময় আল্লাহর কারী।[২]

যুহ্দ ও তাকওয়া

তিনি একজন অতি সম্মানীত 'আলিম ও একজন উঁচু পর্যায়ের উপদেশ দানকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মজলিস সব সময় আল্লাহ্ ভীতি (তাকওয়া) ও সত্যের আলোচনায় মুখর থাকতো। এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মজলিসে একদিন তিনি তাঁর এক ছাত্রকে বলেন :[৩] اذا اقبـل العبـد بقلبـه إلى الله أقبـل بقلـوب المؤمنـين اليـه 'বান্দা যখন সর্বান্তকরণে আল্লাহর দিকে এগিয়ে যায় তখন আল্লাহ্ মু'মিনদের অন্তকরণসহ তার দিকে এগিয়ে যান।'

একদিন বসরার মসজিদে ছাত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি বসে আছেন, এমন সময় একজন ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললো : আবূ 'আবদিল্লাহ, আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। বললেন : আমি তোমাকে উপদেশ দিই, তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের বাদশাহ্ হও।

বিস্ময়ের সাথে ছাত্র বললো : আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করুন। এটা আমার জন্য কেমন

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল–১৭/৩০১

২. আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া–২/৩৪৫; তাহ্যীব আল-কামাল–১৭/৩০২

৩. 'আসরুত তাবি'ঈন–৩৫৪

করে সম্ভব? বললেন : দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব পরিহার কর, তাহলে মানুষের কর্তৃত্বে যা কিছু আছে তার প্রতি অভাববোধ না করে এখানে বাদশাহ হতে পারবে। আর আখিরাতেও আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম প্রতিদান লাভের মাধ্যমে বাদশাহ হতে পারবে।[৪]

ছাত্র বললো : আবূ আবদিল্লাহ! আমি আপনাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসবো। তিনি বললেন : যে উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে ভালোবাসছো, আল্লাহ তোমার সে উদ্দেশ্য পূরণ করুন। তারপর বহু দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অস্ফুট স্বরে বললেন :

اللهم إنى أعوذبك أن أحبَّ فيك وأنت لى كاره.

'হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য মানুষ আমাকে ভালোবাসুক, আর তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক– এ থেকে আমি তোমার পানাহ্ চাই।'

একদিন এক ছাত্র ভরা মজলিসে উঠে দাঁড়ালো এবং তাঁর নীতি-নৈতিকতা ও আল্লাহ-ভীতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশংসামূলক বাক্য উচ্চারণ করলো। তিনি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে এমনটি আর কখনো না করার কথা সাফ জানিয়ে দিয়ে বললেন :

يا بنى، لو كان للذنوب رائحةً تفوح ما استطاع أحد منكم أن يدنو منى.

'ওরে বেটা, পাপের যদি ছড়িয়ে পড়ার মত কোন দুর্গন্ধ থাকতো, তাহলে তোমাদের কেউই আমার কাছে আসতে পারত না।' তিনি আরো বলেন : 'বেটা, আল-কুরআন হলো মু'মিনের উদ্যানস্বরূপ। এর যেখানেই সে অবতরণ করবে, তৃণভূমি পাবে।'[৫]

একবার তিনি তাঁর এক অতি স্থুলকায় ছাত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে নামাযে দাঁড়িয়ে; কিন্তু এমন শব্দ করছে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাকে লক্ষ্য করে বললেন : বেটা, যার আহার কমে গেছে সে নিজে বুঝেছে ও অপরকে বুঝাতে পেরেছে। তার অন্ত:করণ পরিশুদ্ধ ও কোমল হয়েছে। আর বেশি আহার মানুষের অনেক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে কঠিন করে দেয়।[৬]

একদিন এক ব্যক্তি একটু দেরীতে মজলিস ভেঙ্গে যাবার পর এসে সালাম করে জিজ্ঞেস করলো : আবূ আবদিল্লাহ, কেমন আছেন? তিনি জবাব দিলেন : আমি আমার মৃত্যুর কাছাকাছি, আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বহু দূরে এবং কর্মের খুব খারাপ অবস্থায় আছি। সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা যে প্রতিদিন আখিরাতের দিকে একটি পর্যায় অতিক্রম করে?[৭]

তিনি ছিলেন তাঁর ছাত্র-শিষ্য, সঙ্গী-সাথী ও ভক্ত-অনুসারীদের জন্য একটি উত্তম আদর্শ। তাঁর জনৈক সঙ্গী তাঁর সম্পর্কে বলেন : একবার আমি মক্কা থেকে বসরা পর্যন্ত মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি'র সফর সঙ্গী ছিলাম। তিনি সারা রাত নামায পড়তেন। বাহনের পিঠে মাথা

---

৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'–৬/১২০

৫. 'আসরুত তাবি'ঈন–৩৫৪

৬. প্রাগুক্ত–৩৫৫

৭. হিলয়াতুল আওলিয়া–২/৩৪৬

ঝুঁকিয়ে ইশারায় বসে বসে রুকু-সিজদা করতেন। পিছনে বসা চালককে উচ্চস্বরে উট চালাতে বলতেন। মাঝে মাঝে নামাযের মধ্যে তাঁর রাত কেটে যেত। প্রত্যুষে একজন একজন করে সঙ্গীদের জাগাতেন। তাদের কাছে গিয়ে বলতেন : আস-সালাত, আস-সালাত : নামায! নামায! তারা সবাই জেগে গেলে বলতেন : নিকটেই পানি আছে, তোমরা ওযু করে নাও। যদি পানি বেশি দূরে হয় এবং সঙ্গে থাকা পানি যদি অল্প হয় তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও। সঙ্গের পানিটুকু পান করার জন্য রেখে দাও।[৮]

বসরার ওয়ালী বিলাল ইবন আবূ বুরদা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন, তিনি মোটা পশমী কাপড়ের জুব্বা পরে আছেন। বিলাল তাঁকে বললেন : আবূ 'আবদিল্লাহ! আপনি এমন মোটা খস্খসে কাপড় পরেন কেন? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। বিলাল বললেন : আবূ 'আবদিল্লাহ! আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না কেন?

এবার তিনি বললেন : আমি এটাকে যুহ্দ তথা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি নির্লিপ্ততা বলতে চাই না। কারণ, তাতে নিজেকে পবিত্র মনে করা হবে। আবার অভাব ও দারিদ্র্যও বলতে চাই না। কারণ, তাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে। আমি এ দু'টোর কোনটাই বলতে চাই না।

বিলাল বললেন : আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি যা আমি পূরণ করতে পারি? মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' বললেন : মানুষের নিকট চাইতে হবে আমার নিজের তো এমন কোন প্রয়োজন নেই। তবে একজন মুসলিম ব্যক্তির একটি প্রয়োজনের কথা আপনাকে বলছি। বিলাল বললেন : বলুন, ইনশাআল্লাহ আমি পূরণ করবো।

সব শেষে বিলাল বললেন : আবূ 'আবদিল্লাহ! তাকদীর বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

জবাবে তিনি বললেন : ওহে আমীর! আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কিয়ামাতের দিন তাঁর বান্দাদেরকে তাকদীর বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন না। তিনি জানতে চাইবেন তাদের অবস্থা ও আমল সম্পর্কে।

এমন জবাব শুনে ওয়ালী চুপ হয়ে যান এবং ভীষণ লজ্জিত হন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে নীরবে মজলিস ত্যাগ করেন।[৯]

মালিক ইবন দীনার বলতেন : আমি মুহাম্মাদ ইবন সীরীনকে জান্নাতে দেখেছি এবং মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি'কেও জান্নাতে দেখেছি। আল-হারিছ ইবন ওয়াজীহ্ একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : হাসান আল-বাসরী কোথায়? বললেন : হাসান সিদরাতুল মুনতাহা'র নিকটে আছেন।[১০]

---

৮. 'আসরুত তাবি'ঈন–২/৩৪৬, ৩৫৫

৯. প্রাগুক্ত–৩৫৬

১০. তাহ্যীব আল-কামাল–১৭/৩০৩

মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' (রহ) মাত্র ১৫ (পনেরো)টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১১] তিনি একজন বিশ্বস্ত, সৎ ও তাপস ব্যক্তি ছিলেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ দারুকুতনী বলেন :

إن محمد بن الواسع الأزدى رجل ثقة بلى برواة ضعفاء.

'মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি' একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি যিনি দুর্বল রাবীদের দ্বারা পরীক্ষিত বা বিভ্রান্ত হয়েছেন।[১২]

তাঁর সমকালীন আরেকজন মনীষী দামরা ইবন শাওযাব বলেন : মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি' প্রকাশ্য ইবাদতে খুব বেশি নিমগ্ন থাকতেন না। ফাতওয়ার দায়িত্বও অন্যরা পালন করতেন। কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হতো : বসরার সর্বোত্তম ব্যক্তিটি কে? বলা হতো : মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি' আল-আযদী। আমি তাঁর চেয়ে বেশি বিনয়ী লোক কখনো কাউকে দেখিনি।[১৩] বসরার অধিবাসী অপর এক ব্যক্তি বলেন : আমি যখন আমার অন্তরে কিছুটা কঠোরতার ভাব উপলব্ধি করতাম তখন মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি'র নিকট গিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকতাম। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ তাবি'ঈ মালিক ইবন দীনার ছিলেন মুহাম্মাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহচর। একদিন মুহাম্মাদ তাঁর বাড়িতে অবস্থানকালে বসরার আমীর মালিকের নিকট কিছু অর্থ পাঠালেন এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন। শায়খুল বসরা মুহাম্মাদ তাঁকে বললেন : আপনি তাঁদের অনুদান গ্রহণ করলেন? মালিক বললেন : দু'দিন অপেক্ষা করুন এবং আমার সহচরদের নিকট জিজ্ঞেস করুন। তাঁর কথা মত তিনি তাঁর বন্ধুদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন : মালিক ইবন দীনার সেই অর্থ দিয়ে কিছু দাস ক্রয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের মুক্ত করে দেন। এ কথা শোনার পর মুহাম্মাদ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। অত:পর তিনি যখন মালিকের সাথে মিলিত হলেন তখন মালিক বললেন : আবূ 'আবদিল্লাহ, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জানতে চাচ্ছি, আপনি কি আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন? মুহাম্মাদ বললেন : আল্লাহর কসম! না। মালিক বললেন : আমি ভুল করে চলেছি। মুহাম্মাদ ইবন্ আল-ওয়াসি'র মত লোকেরাই আল্লাহর ইবাদত করে থাকে। মালিক তাঁর দিকে তাকিয়ে আরো বলেন : আমি অবশ্য এমন মানুষকে ঈর্ষা করি যার মধ্যে দীনদারী আছে এবং দুনিয়ার কোন কিছু নেই; অথচ তিনি সন্তুষ্ট।[১৪]

তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ। একবার জনৈক ব্যক্তির সাথে তার একটু ঝগড়া হয়। লোকটি ছেলের বিরুদ্ধে পিতার নিকট নালিশ করে। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ছেলেকে লক্ষ্য করে

---

১১. প্রাগুক্ত–১৭/৩০২; 'আসরুত তাবি'ঈন–৩৫৬

১২. তাহ্যীব আল-কামাল–১৭/৩০২

১৩. প্রাগুক্ত; 'আসরুত তাবি'ঈন–৩৫৬

১৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'–৬/১২০

বলেন : তুমি মানুষের সাথে বাড়াবাড়ি কর, অথচ আমি তোমার পিতা? আল্লাহ যেন মুসলিম সমাজে তোমার মত মানুষের সংখ্যা না বাড়ান।[১৫]

তিনি সত্য উচ্চারণে তিরস্কার ও অপমান-লাঞ্ছনাকে মোটেও পরোয়া করতেন না। বসরার শাসনকর্তা মালিক ইবন আল-মুনযির মুহাম্মাদকে বসরার কাজী নিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি এই নিয়োগ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন এই বলে : এই বিচারের সাথে আমার সম্পর্ক কি? মালিক দূত পাঠালেন এই নিয়োগ গ্রহণে তাঁকে রাজী করানোর জন্য। তিনিও একই কথা বলে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। মালিক যে ব্যক্তিকে পাঠালেন সে তাঁকে বললো : হয় আপনি কাজীর আসনে বসবেন নয়তো আমি আপনাকে তিন শো চাবুক মারবো। জবাবে তিনি দূতকে বললেন : তুমি মালিককে বল, যদি তিনি এমনটি করেন তাহলে তিনি হবেন একজন অত্যাচারী শাসক। আর দুনিয়ার লাঞ্ছনা আখিরাতের লাঞ্ছনার চেয়ে ভালো।[১৬]

সে যুগে বসরার নিয়ম ছিল, মানুষ কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঘিরে বসতো এবং তিনি তাদেরকে দীন, ফিক্হ ও মাগাযী তথা রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা শোনাতেন। একবার এমন একটি মজলিসে তিনিও বসা ছিলেন। তিনি উপদেশ দানকারী বক্তাকে বলতে শুনলেন : আমার উপদেশ শুনে কারো অন্তর নরম হচ্ছে না, চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে না এবং গায়ের চামড়া ভয়ে কাঁপছে না– আমি এমন দেখছি কেন?

তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন : ওহে, আমার মনে হয় আপনার জন্যই মানুষের এমন অবস্থা হয়েছে। কারণ, উপদেশাবলী যখন অন্তর থেকে বের হয় তখন তা অন্তরের উপরেই পড়ে।[১৭]

এরকম ঘটনা অন্য একজন আমীরের সাথে তাঁর ঘটে। সেই আমীরের নাম বিলাল ইবন আবী বুরদা। তিনি একবার মুহাম্মাদকে তাঁর গৃহে খাবারের দাওয়াত দিলেন। মুহাম্মাদ সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলেন। আমীর ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। মুহাম্মাদকে লক্ষ্য করে বললেন : আমি সব সময় দেখি, আপনি আমাদের খাবার ঘৃণা করছেন। মুহাম্মাদ বললেন : মহামান্য আমীর! আপনি এমন কথা বলবেন না। আল্লাহর কসম! আপনাদের মধ্যে যারা ভালো মানুষ তারা আমার সন্তানদের চাইতেও আমার বেশি প্রিয়।[১৮]

তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা

পারস্যে তখন মুসলিম বাহিনীর সাথে যে যুদ্ধ চলছিল মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি' তাতে অংশ গ্রহণের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। বিশেষত: জুরজান ও তাবারিস্তানের যুদ্ধে। এ বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন ইয়াযীদ ইবন আল-মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরা। তিনি তখন খুরাসানের ওয়ালী।

---

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. প্রাগুক্ত–৬/১২২; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–৯/৪৪২

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'–৬/১২২

১৮. প্রাগুক্ত; সুওয়ারুন মিনহায়াত আত-তাবি'ঈন–২৪৯

মুসলিম বাহিনী দাহিস্তান নামক একটি অঞ্চলে প্রবেশ করলো। যেখানে তুর্কী সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করতো। তারা ছিল দারুণ শক্তিশালী, দু:সাহসী এবং দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহের অধিকারী। তাদের এ অবস্থা দেখে মুসলিম বাহিনী অনেকটা ভীত হয়ে পড়লো। তারা মনে করলো তাদেরকে পরাভূত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

মুসলিম বাহিনীর এমন সংকটজনক পরিস্থিতিতে মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি' এমনি দু:সাহসিক ভূমিকা পালন করেন যা মুসলিম মুজাহিদদের ভগ্ন মনোবলকে আবারো চাঙ্গা ও সতেজ করে তোলে। তিনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আহ্বান জানান : ওহে আল্লাহর অশ্বারোহীগণ! তোমরা নিজ নিজ অশ্বের পিঠে আরোহণ কর!

এ আহ্বানের সাথে সাথে মুসলিম মুজাহিদগণ সমুদ্রের তরঙ্গের গতিতে এমনভাবে ধাবিত হতে থাকে যে, তাদের সামনে দাঁড়াতে কেউ দু:সাহস করেনি। তাদের হুঙ্কার ও আস্ফালন দেখে প্রতিপক্ষ বাহিনী ভীত-কম্পিত হয়ে পড়ে।

বসরার 'আবিদ-মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি' কেবল সৈনিকদের মনোবল চাঙ্গা করেই ক্ষান্ত হলেন না, বরং তরবারি কোষমুক্ত করে সজোরে এদিক ওদিক চালাতে থাকেন। এর মধ্যে শত্রুবাহিনীর মধ্য থেকে বিশাল দেহের অধিকারী শক্তিমান ও ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন একজন যোদ্ধা বেরিয়ে আসে এবং মুসলিম বুহ্যের মধ্যে ঢুকে যত্রতত্র আঘাত হানতে থাকে। তার প্রচণ্ড আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর যোদ্ধারা পিছু হটতে থাকে। তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। সে ঔদ্ধত্যের সাথে মুসলিম যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানায় : কে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে? কে আমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হবে?

মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে বসরার এই 'আবিদ চিৎকার করে বলে উঠলেন : আমিই এই বলদর্পী, অহংকারীর আহ্বানে সাড়া দিতে ইচ্ছুক?

মুসলিম বাহিনীর মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল, তারা সমস্বরে বলে উঠলো, না তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ, তাঁকে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় পাঠানো যাবে না। সবার অনুরোধে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। তবে এক তরুণ মুসলিম সৈনিকের তরবারির খাপ স্পর্শ করে তার সাফল্যের জন্য দু'আ করলেন। এই মহান তাবি'ঈর দু'আর বরকতে সৈনিকটি দু:সাহসী হয়ে ওঠেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সামনে এগিয়ে যান। তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের মাথায় তরবারির এমন আঘাত হানেন যে, তা দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। শত্রু-সৈনিকও তাঁর মাথা তাক করে আঘাত হানে, কিন্তু তাঁর লোহার বর্ম তা ঠেকিয়ে দেয়। বর্মটি দু'খণ্ড হয়ে গেলেও মাথা স্পর্শ করেনি। তিনি যখন ফিরে আসলেন তখন তাঁর তরবারি থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছিল।

এ দৃশ্য দেখে মুসলিম বাহিনী তাকবীর ধ্বনি দিয়ে দিক-দিগন্ত মুখরিত করে তোলে। তাঁরা এই মহান 'আবিদ-তাবি'ঈকে শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে দেখতে থাকে এবং তাঁর হাতে চুমু খাওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অতঃপর মুসলিম বাহিনী একযোগে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। তারা সন্ধি করে এবং জিযিয়া দানে সম্মত হয়। মুসলিম বাহিনী এ যুদ্ধে অগণিত ধন-সম্পদ গণিমত হিসেবে লাভ করে। তার মধ্যে ছিল

লক্ষ লক্ষ দিরহাম, অসংখ্য রূপোর পানপাত্র এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণের বহু মুকুট। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ইয়াযীদ ইবন আল মুহাল্লাব। তিনি সবচেয়ে বড় মুকুটটি হাতে নিয়ে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বললেন : আমার ধারণা, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, এটা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। সবাই বললো : হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। ইয়াযীদ বললেন : আজ আমি তোমাদেরকে দেখাবো, মুহাম্মাদ (সা)-এর উম্মাতের মধ্যে এখনো এমন ব্যক্তিও আছেন যিনি এটা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। তারপর তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি'কে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। বহু খোঁজাখুজির পর তাঁকে হাজির করা হলো। ইয়াযীদ সোনার মুকুটটি হাতে নিয়ে বললেন : ওহে আবূ 'আবদিল্লাহ, মুসলিম সৈনিকরা এই মুকুটটির দাবী ত্যাগ করেছে। এটি আমি আপনাকে দিলাম। মুহাম্মাদ সাথে সাথে বলে উঠলেন : মাননীয় আমীর! আমার এর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। ইয়াযীদ আল্লাহর কসম দিয়ে মুকুটটি গ্রহণের জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করলেন। অবশেষে তিনি হাত বাড়িয়ে মুকুটটি নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন। সৈনিকরা একটু বিদ্রূপের সুরে বললেন, এই কি ঈছার তথা আত্মত্যাগের নমুনা? তিনি তো মুকুটটি নিয়ে চলে গেলেন।

অধিনায়ক ইয়াযীদ একজন তরুণকে নির্দেশ দিলেন গোপনে তাঁকে অনুসরণ করে মুকুটটি তিনি কি করেন তা দেখার জন্য। ছেলেটি তাঁকে অনুসরণ করে পিছে পিছে গেল। বসরার এই 'আবিদ কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় পথ চলছেন। ভাবছেন, এই মুকুটটি তিনি কী করবেন? এমন সময় দেখা পেলেন ছেঁড়া-ময়লা পোশাক পরা উসকো-কুসকো চুল ও ধূলি-মলিন চেহারার একজন লোকের। লোকটি তাঁকে বললো : আল্লাহর মাল থেকে আমাকে কিছু দান করুন! তিনি তাঁকে সোনার মুকুটটি দান করলেন। তারপর এমন উৎফুল্ল অবস্থায় দ্রুত চলতে লাগলেন, যেন কোন মারাত্মক বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন। অনুসরণকারী সৈনিকটি ধূলি-মলিন লোকটিকে মুকুটসহ ধরে সেনা-কমাণ্ডার ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবের নিকট নিয়ে গেল। তিনি তাঁর বাহিনীর সদস্যদের সমবেত করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন : আমি কি তোমাদের বলেছিলাম না যে, এই উম্মাতের মধ্যে এখনো এমন একজন মানুষ আছেন যিনি এই সোনার মুকুট তুচ্ছ মনে করেন? মুকুটের প্রতি তাঁর কোন লোভ নেই?

যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হলো। বসরার এই 'আবিদ তাঁর উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব শেষ করে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সেনা-কমাণ্ডারের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন : আপনি আপনার খুশীমত যা ইচ্ছা করতে পারেন। বায়তুল্লাহ পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য আমি আপনাকে কিছু নগদ অর্থ দিচ্ছি। বসরার 'আবিদ বললেন : সমপরিমাণ অর্থ কি বাহিনীর সকল সৈনিককে দিচ্ছেন? কমাণ্ডার ইয়াযীদ বললেন : না, সকলকে দিচ্ছি না। বসরার 'আবিদ বললেন : যে অর্থ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হচ্ছে এমন অর্থের আমার প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি 'আস-সালামু 'আলাইকা, ইয়া-আমীরুল জায়শ' (সালাম, ওহে সেনা অধিনায়ক) বলে যাত্রা শুরু করেন।

ইয়াযীদের চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো। তিনি মুখে হাসি ফুঁটিয়ে জোরে বলে উঠলেন : ওয়া 'আলাইকাস সালাম! ওহে 'আবদুল্লাহ্, কা'বার চত্বরে বসে আমাদের জন্য দু'আ করবেন।[১৯]

দুনিয়ার সকল সুখ-সম্পদের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ নির্মোহ স্বভাবের ছিলেন। ভোগ-বিলাসিতা তাঁকে মোটেও আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই আল্লাহর পথে জিহাদের দায়িত্ব পালন শেষে আল্লাহর আরেকটি ইবাদত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন। সম্ভবত এটা তাঁর ৪র্থ অথবা ৫ম বারের হজ্জ ছিল।

ওফাত

হিজরী ১২৩ সনে তিনি অন্তিম রোগ শয্যায় আশ্রয় নেন।[২০] ভক্ত-অনুরাগীদের উপর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভর করে। দর্শনার্থীদের ভীড়ে বাড়ি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।[২১] তিনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ যে দু'আটি করেন তা নিম্নরূপ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَقَامٍ سُوْءٍ قُمْتُهُ، وَمِنْ كُلِّ مَقْعَدِ سُوْءٍ قَعَدْتُهُ، وَمِنْ كُلِّ مَدْخَلِ سُوْءٍ دَخَلْتُهُ، وَمِنْ كُلِّ مَخْرَجِ سُوْءٍ خَرَجْتُهُ، وَمِنْ كُلِّ عَمَلِ سُوْءٍ عَمِلْتُهُ، وَمِنْ كُلِّ قَوْلِ سُوْءٍ قُلْتُهُ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ فَاغْفِرْهُ لِيْ، وَأَتُوْبُ لَكَ مِنْهُ فَتُبْ عَلَيَّ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট মাগফিরাত কামনা করছি, এমন প্রতিটি খারাপ দাঁড়ানোর জায়গা থেকে যেখানে আমি দাঁড়িয়েছি, এমন প্রতিটি খারাপ বসার স্থান থেকে যেখানে আমি বসেছি, এমন প্রতিটি খারাপ প্রবেশ পথ থেকে যে পথে আমি প্রবেশ করেছি, এমন প্রতিটি বের হওয়ার খারাপ পথ থেকে যে পথে আমি বের হয়েছি, এমন প্রতিটি খারাপ কাজ থেকে যা আমি করেছি এবং এমন প্রতিটি খারাপ কথা থেকে যা আমি বলেছি। হে আল্লাহ! আমি এর সবকিছু থেকে তোমার মাগফিরাত কামনা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি সবকিছু থেকে তাওবা করছি, তুমি আমার তাওবা কবুল কর!"

তারপর তিনি পাশে বসা তাঁর এক বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন :[২২]

أخبرني بالله عليك ما يغني هؤلآء عني إذا أخذبنا صيتي وقدمي غدا وألقيت في النار؟

---

১৯. 'আসরুত তাবি'ঈন–৩৬০–৩৬১; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন–২৩১–২৩৮

২০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'–৬/১২৩

২১. 'আসরুত তাবি'ঈন–৩৬১

২২. প্রাগুক্ত–৩৬১

"আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, তুমি আমাকে বল আগামী কাল যখন আমাকে আমার মাথার সামনের দিকের চুল ও পায়ের গোঁড়ালী ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন উপস্থিত এসকল লোক কি আমার কোন কাজে আসবে?"

তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি অনুচ্চ কণ্ঠে পাঠ করতে করতে অনন্তের পথে যাত্রা করেন :[২৩]

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْأَقْدَامِ.

"অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ হতে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরে।"

জা'ফার ইবন সুলায়মান বলেন, এই হিজরী ১২৩ সনে ছাবিত, মালিক ইবন দীনার ও মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' মৃত্যুবরণ করেন।[২৪]

তিনি যে সকল মনীষীর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন এবং যাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইবন মালিক (রা) অন্যতম। তাছাড়া খ্যাতিমান তাবি'ঈদের মধ্যে হাসান আল-বাসরী, যাকওয়ান আবী সালিহ আস-সাম্মান, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, সুলায়মান আল-আ'মাশ,তাঊস ইবন কায়সান, 'আবদুল্লাহ ইবন আস-সামিত, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, মুহাম্মাদ ইবন আল মুনকাদির, মুতাররিফ ইবন 'আবদিল্লাহ আশ-শিখখীর, মু'আবিয়া ইবন কুররা আল-মুযানী, আবূ বুরদা ইবন আবী মূসা আল-আশ'আরী, আবূ সালিহ আল হানাফী, আবূ নাদরা আল-'আবদী (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এখানে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো : আযহার ইবন সি'নান আল-কুরাশী, ইসমা'ঈল ইবন মুসলিম আল-'আবদী, হাসান ইবন দীনার, হাম্মাদ ইবন যায়দ, 'উছমান ইবন 'আমর (রহ) ও আরো অনেকে।[২৫]

---

২৩. 'আসরুত তাবি'ঈন—৩৬২

২৪. তাহ্যীব আল-কামাল—১৭/৩০৩

২৫. প্রাগুক্ত—১৭/৩০১-৩০২

হিশাম ইবন 'উরওয়া (রহ)

হযরত আবূ 'আবদিল্লাহ হিশাম ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যুবায়র ইবন আল-'আওয়ামের (রা) পৌত্র। তাঁর পিতা হযরত 'উরওয়া (রহ) একজন অতি উঁচু স্তরের তাবি'ঈ এবং মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহর অন্যতম। তাঁর ডাকনাম ছিল আবূ 'আবদিল্লাহ, মতান্তরে আবূ আল-মুনযির।

'আবদুল্লাহ ইবন দাউদ আল-খুরায়বী বলেন : তালহা ইবন ইয়াহইয়া, আল-আ'মাশ, হিশাম ইবন 'উরওয়া ও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয– তাঁরা সকলে হুসাইন ইবন 'আলীর (রা) শাহাদাতের বছরে জন্মগ্রহণ করেন। আবূ হাফ্স বলেন : হুসাইন (রা) শহীদ হন হিজরী ৬১ সনে।[১]

হযরত হিশাম (রহ) শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে (রা) দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন, একবার আমার ভাই মুহাম্মাদ ও আমাকে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট পাঠানো হয়। তিনি আমাদেরকে কোলে বসিয়ে চুমু দিয়েছিলেন।[২] সম্ভবতঃ এই সাক্ষাতে অথবা অন্য কোন সাক্ষাতে ইবন 'উমার (রা) তাঁর মাথার উপর হাত বুলিয়ে দু'আ করেছিলেন।[৩] তাছাড়া তিনি আনাস ইবন মালিক, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ ও সাহ্ল ইবন সা'দের (রা) দর্শনও লাভ করেন[৪]

জ্ঞান ও মনীষা

হিশাম (রহ) যেমন একজন অতি উঁচু স্তরের তাবি'ঈর পুত্র, তেমনি একজন অতি উঁচু স্তরের মহান সাহাবীর পৌত্রও ছিলেন। এজন্য বলা চলে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর মধ্যে 'ইল্ম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁকে তাঁর সময়ের 'আলিম তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করা হতো। ইমাম নাওবী (রহ) লিখেছেন, তাঁর বিশ্বস্ততা, মহত্ত্ব ও ইমামত বা ইমাম হওয়ার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য আছে।[৫]

হাদীছ

হাদীছের একজন বিশিষ্ট হাফিজ ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে ثقة ثبت كثير الحديث - বলেছেন। অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ় ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক। তিনি হুজ্জাত (প্রমাণ)ও ছিলেন।[৬]

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৯/২৬৬, ২৭০

২. খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ-১৪/৩৮

৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৪৮

৪. তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/২৬৬

৫. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৩৮

৬. আত-তাবাকাত-৭/৬৭

ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম, হাফিজ ও হুজ্জাত বলেছেন। শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদগণ তাঁর ব্যাপক জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী তাঁকে হাদীছের ইমাম বলতেন এবং উহায়ব, হাসান আল-বসরী ও ইবন সীরীনের (রহ) সমমর্যাদা দান করতেন। 'উছমান আদ-দারিমী একবার ইবন মা'ঈনকে জিজ্ঞেস করেন : হিশাম আপনার বেশি প্রিয় না যুহ্‌রী? তিনি বলেন : তাঁরা দু'জনই আমার প্রিয়। তিনি কাউকে প্রাধান্য দেননি।[৭]

তাঁর শায়খ বা শিক্ষকগণ

সাহাবীদের মধ্যে তিনি কেবল স্বীয় চাচা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তাছাড়া তৎকালীন অন্য 'আলিমদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উরওয়া, 'আব্বাদ ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আমর ইবন খুযায়মা, 'আওফ ইবন হারিছ ইবন তুফায়ল, আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, ইবন মুনকাদির, ওয়াহাব ইবন কায়সান, সালিহ ইবন আবিস সালিহ আস-সাম্মান, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বাকর, 'আবদুর রহমান ইবন সা'দ, মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম (রহ) প্রমুখের নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন ও তাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেন।[৮]

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন : ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, আইউব আস-সাখতিয়ানী, মালিক ইবন আনাস, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার, ইবন জুরায়জ, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, লায়ছ ইবন সা'দ, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, ওয়াকী' ইবন আল-জাররাহ, আবান ইবন ইয়াযীদ আল-'আত্তার, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, ইউনুস ইবন বুকাইর (রহ) প্রমুখ।[৯]

তাঁর মুহতারাম পিতা হযরত 'উরওয়া (রহ) ছিলেন মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহ্‌র অন্যতম। পিতার এ শাস্ত্রের জ্ঞানের একটা বিরাট অংশ তিনি লাভ করেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ফকীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[১০]

তিনি যেমন ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী তেমনি ছিলেন 'আমল-আখলাকে উৎকর্ষমণ্ডিত। ইবন হিব্বান তাঁকে একজন বিদ্বান ও খোদাভীরু বলে উল্লেখ করেছেন।[১১]

তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্র মানুষ ছিলেন। মুখ থেকে কখনো কোন অহেতুক কথা বের হতো না। মুনযির ইবন 'আবদিল্লাহ বলেন, আমি হিশামের মুখ থেকে মাত্র একবার ছাড়া

---

৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৪৪
৮. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/৪৮; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৯/২৬৬
৯. প্রাগুক্ত
১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৪৪
১১. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/৪৯

আর কখনো কোন খারাপ কথা শুনিনি।[১২] অত্যন্ত উদার ও দানশীল ছিলেন। দানশীলতা এত সীমা ছেড়ে যায় যে, এক লাখ দিরহাম ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

বাগদাদ সফর

বিরাট অংকের ঋণ পরিশোধের দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন। তাই তিনি এর একটা উপায় বের করার জন্য বাগদাদে আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূরের নিকট যান। তিনি হৃষ্টচিত্তে স্বাগতম জানান। আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি তাঁর ঋণের বিষয়টি উত্থাপন করেন। খলীফা জানতে চান : ঋণের পরিমাণ কত? বললেন : এক লাখ দিরহাম। মানসূর বললেন, আপনি এত বড় বিদ্বান, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি হয়ে এত মোটা অংকের ঋণ গ্রহণ করেন কেন, যা পরিশোধ করা আপনার সাধ্যের বাইরে? তিনি বললেন : আমার বংশের অনেক ছেলে যুবক হয়েছে। শঙ্কিত হলাম এই ভেবে যে, যদি তাদের বিয়ে না দেয়া হয় তাহলে খারাপ পথে চলে যেতে পারে। তাই আমি আল্লাহ ও আমীরুল মু'মিনীনের উপর ভরসা করে তাদের বিয়ে দিলাম এবং তাদের পক্ষ থেকে ওলীমাও করলাম। এসব ঋণ সেই কারণে। আবূ জা'ফার মানসূর বিস্ময়ের সুরে দু'বার উচ্চারণ করেন : এক লাখ! এক লাখ! তারপর তিনি হিশামকে দশ হাজার দিরহাম দানের নির্দেশ দেন। হিশাম বললেন : আমীরুল মু'মিনীন যা কিছু দিচ্ছেন তা কি সন্তুষ্টচিত্তে নাকি একান্ত বাধ্য হয়ে? আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন : যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে যা কিছু দেয়, তাহলে তাতে দানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি হয়। আল-মানসূর বললেন : সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছি।[১৩]

ওফাত

হিজরী ১৪৬ অথবা ১৪৭ সনে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনাক্রমে সেই দিন 'আব্বাসীয় খলীফা আল-মানসূরের একজন অতি সম্মানিত ও খ্যাতিমান দাসের মৃত্যু হয়। এ কারণে দু'জনের জানাযা একই সাথে হয়। তবে মানূসর হিশামের মর্যাদার কারণে তাঁর জানাযার নামায প্রথমে পড়ান। তারপর সেই দাসের নামায পড়ান। হিশামের জানাযায় চার তাকবীর এবং দাসের জানাযায় পাঁচ তাকবীর উচ্চারণ করেন। তারপর বলেন, তাঁদের প্রত্যেকে তাকবীরের ব্যাপারে যে যে মত পোষণ করতেন সেই মত অনুযায়ী তাদের জানাযার নামায আদায় করেছি। খলীফা হারূন আর-রশীদের মা খায়যুবানের নামে প্রতিষ্ঠিত কবরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৪] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।[১৫] তবে ইমাম যাহাবী ৮০ বছরের কথা বলেছেন।

---

১২. তারীখু বাগদাদ-১৪/৩৮

১৩. প্রাগুক্ত-১৪/৩৯

১৪. প্রাগুক্ত-১৪/৪১; আত-তাবাকাত-৭/২৭; তাবি'ঈন-৫০৭-৫০৯

১৫. তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/২৭০

আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান (রা)

ডাকনাম আবূ বাকর– এ নামে তিনি এত প্রসিদ্ধি অর্জন করেন যে, আসল নামটি ঢেকে যায়। তাই অনেকে ধারণা করেছেন তাঁর আসল নাম আবূ বাকর। তবে তাঁর আসল নাম মুহাম্মাদ। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁর ডাকনামটি আসল নাম হওয়ার ব্যাপারে যে কথাটি আছে তাই সর্বাধিক সঠিক বলেছেন। তিনি কুরায়শ বংশের মাখযূমী শাখার সন্তান। তাঁর উর্ধ্বতন বংশধারা এ রকম : আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ ইবন হিশাম ইবন আল-মুগীরা আল-কুরাশী আল-মাখযূমী।[১] তাঁর মায়ের নাম ফাখ্তা। মাতৃকূলের উর্ধ্বতন বংশধারা নিম্নরূপ : ফাখ্তা বিন্ত 'উতবা ইবন সুহায়ল ইবন 'আমর ইবন 'আবদি শাম্স। হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন।[২] উটের যুদ্ধের সময় বয়স কম হওয়ায় তালহা ও যুবায়রের (রা) বাহিনী থেকে তাঁকে ও 'উরওয়াকে বাদ দেয়া হয়।[৩]

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। মদীনা ছিল তখন জ্ঞান চর্চা ও 'আলিম-'উলামার নগরী। তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের প্রতি দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। এ কারণে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধৈর্যের সাথে জ্ঞান অর্জন করেন এবং মদীনার বিখ্যাত 'আলিমগণের মধ্যে পরিগণিত হন। ইবন সা'দ বলেন :[৪]

كان ثقة فقيها كثير الحديث عالما عاقلا عاليا سخيا.

"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, ফকীহ্, বহু হাদীছের ধারক-বাহক 'আলিম, বুদ্ধিদীপ্ত, উঁচু মর্যাদার অধিকারী ও দানশীল মানুষ।"

ইবন খিরাশ তাঁকে 'আলিমদের ইমাম বলে গণ্য করতেন।[৫]

হাদীছ

তিনি হাদীছের একজন বড় হাফিজ ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :

كان ثقة حجة فقيها إماما كثير الرواية سخيا.

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৩

২. প্রাগুক্ত

৩. আত-তাবাকাত-৬/১৫৩

৪. প্রাগুক্ত

৫. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৯৫

"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, হুজ্জাত (প্রমাণ), ফকীহ্, ইমাম, বহু হাদীছ বর্ণনাকারী ও দানশীল ব্যক্তি।"

একথা আল-ওয়াকিদীও বলেছেন। সাহাবীদের মধ্যে তাঁর পিতা 'আবদুর রহ্মান, আবূ হুরায়রা, 'আম্মার ইবন ইয়াসির, আবূ মাস'উদ আল-বাদরী, 'আবদুর রহমান ইবন মুতী', উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা, 'উম্মু সালামা (রা) প্রমুখের নিকট থেকে হাদীছ শোনেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেন।[৬]

তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছের জ্ঞান লাভ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনাও করেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর পুত্রগণ যথা: 'আবদুল মালিক, 'উমার, আবদুল্লাহ্, সালাম; ভাতিজা আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ এবং অন্যদের মধ্যে ইমাম যুহ্রী, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, হাকাম ইবন 'উতবা, 'আবদুল ওয়াহিদ ইবন আয়মান (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৭]

ফিক্হ

ফিক্হ বিষয়েও তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। তিনি মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ্র মধ্যে ছিলেন।[৮] আবুয যানাদ বলতেন, মদীনার যে সকল ফকীহ্ ও 'আলিমের মতের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান দেয়া হতো তাঁরা ছিলেন ছয়জন। তাঁদের একজন আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান।[৯]

'ইবাদত-বন্দেগী

তাঁর মধ্যে তাকওয়া-পরহেযগারী এবং পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি একটা নির্লিপ্ত ভাব অত্যন্ত গভীরভাবে ছিল। মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আবিদ ব্যক্তিগণের অন্যতম ছিলেন। দুনিয়া বিরাগী মনোভাব এবং অতিরিক্ত সালাতে নিমগ্ন থাকার কারণে মানুষ তাঁকে "রাহিবু কুরায়শ" (কুরায়শ বংশের সাধু ব্যক্তি) উপাধি দেয়।[১০] ইমাম যাহাবী বলেন:[১১]

كان صالحًا عابدًا متألها. – "তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ, 'আবিদ ও আল্লাহ্ওয়ালা মানুষ।" তিনি একাধারে কয়েক দিন সাওম পালন করতেন। তাঁর ভাই 'আমর ইবন 'আবদির রহমান বলেন, তিনি সাওমের পর সাওম অর্থাৎ ক্রমাগত পালন করতেন। মাঝে রোযা ভাংতেন না।[১২]

---

৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৩

৭. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/৩০

৮. ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৪; তাবি'ঈন-৫২৮

৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/৩১

১০. আত-তাবাকাত-৬/১৫৩

১১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৪

১২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/৩১

বিশ্বস্ততা বা আমানতদারী

আমানতদারী ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ের প্রতি তিনি এত গুরুত্ব দিতেন যে, কেউ তাঁর নিকট কোন কিছু গচ্ছিত রাখলে এবং তাঁর কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেলে মালিক তা মাফ করে দিলেও তিনি ক্ষতিপূরণসহ পুরো আমানত ফেরত দিতেন। 'উছমান ইবন মুহাম্মাদ বলেন, হযরত 'উরওয়া (রহ) আবূ বাকরের নিকট কিছু সম্পদ আমানত রাখেন। সেই সম্পদের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়। 'উরওয়া বলে পাঠালেন, এ ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই, তুমি তো একজন আমানতদার মাত্র। আবূ বাকর জবাব দিলেন, আমি জানি যে, আমার উপর কোন ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নেই। তবে এ আমার মনোপুতঃ নয় যে কুরায়শদের মধ্যে তোমার মুখ থেকে একথা বের হোক যে, আমার আমানত নষ্ট হয়ে গেছে। মোটকথা 'উরওয়ার কথা তিনি মানেননি এবং নিজের সম্পদ বিক্রি করে তাঁর আমানত প্রত্যার্পণ করেন।[১৩]

তাঁর চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল দানশীলতা। অল্পতে তুষ্ট থাকতেন। ইবন সা'দ বলেন : وكان مكفوفا - ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ হলে তুষ্ট হয়ে যেতেন।[১৪]

বানূ উমাইয়্যাদের নিকট তাঁর স্থান ও মর্যাদা

বানূ উমাইয়্যা খলীফাগণ তাঁকে এত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন যে, তাঁর কারণে মদীনার অধিবাসীগণ উমাইয়্যাদের বাড়াবাড়ির হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। খলীফা 'আবদুল মালিক বিশেষভাবে তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি বলতেন, বানূ উমাইয়্যাদের সাথে মদীনাবাসীদের আচরণের কারণে তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার ইচ্ছা করি, কিন্তু যখন আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমানের কথা স্মরণ হয় তখন লজ্জিত হই এবং আমার ইচ্ছা ত্যাগ করি। 'আবদুল মালিক তাঁর উত্তরাধিকারী ওয়ালীদ ও সুলায়মানকেও আবূ বাকরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অসীয়াত করে যান।[১৫]

ওফাত

একদিন 'আসর নামায আদায়ের পর গোসলখানায় যান এবং সেখানে পড়ে যান। সাথে সাথে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় : 'আল্লাহর কসম! আমি আজ দিনের শুরুতে কোন নতুন কথা বলিনি।' সেই দিন সূর্যাস্তের পূর্বে ইনতিকাল করেন। ইবন সা'দ বলেন :

مات بالمدينة فى سنة الفقهاء وهى سنة أربع وتسعين.

"তিনি হিজরী ৯৪ সনে, যেটাকে ফকীহদের বছর বলা হয়, মদীনায় মারা যান।[১৬]

---

১৩. আত-তাবাকাত-৬/১৫৪

১৪. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৪

১৫. আত-তাবাকাত-৬/১৫৪

১৬. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৪

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল কারীম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

২. আল-ইমাম আয-যাহাবী

(ক) সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা' (বৈরূত : আল-মুওয়াস্ সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-৭, ১৯৯০)

(খ) তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ (বৈরূত : দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাছ আল-ইসলামী)

(গ) তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম (কায়রো : মাকতাবা আল-কুদসী, ১৩৬৭ হি.)

৩. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী, শাযারাত আয-যাহাব (বৈরূত : আল-মাকতাব আত-তিজারী)

৪. ইবনুল জাওযী, সিফাতুল সাফওয়া (হায়দ্রাবাদ : দারিয়াতুল মা'আরিফ, ১৩৫৭ হি.)

৫. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা (বৈরূত : দারু সাদির)

৬. ইবন 'আসাকির, আত-তারীখ আল-কাবীর, (শাম : মাতবা'আতুশ শাম, ১৩২৯ হি.)

৭. ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জাম আল-বুলদান (বৈরূত : দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী)

৮. ইবন হাযাম, জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব (মক্কা : দারু আল-মা'আরিফ, ১৯৬২)

৯. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান (মিসর : মাকতাবা আন-নাহদা আল-মিসরিয়্যা, ১৯৪৮)

১০. আল-বালাযুরী :

(ক) আনসাব আল-আশরাফ (মিসর : দার আল-মা'আরিফ)

(খ) ফুতূহ আল-বুলদান (মিসর : মাতবা'আ আল-মাওসূ'আত, ১৯০১)

১১. আয-যিরিক্লী, আল-আ'লাম (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, সংস্করণ-৪, ১৯৭৯)

১২. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা (বৈরূত)

১৩. ইবন সাল্লাম আল-জাহমী, তাবাকাত ফুহুল আশ-শু'আরা' (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮০)

১৪. ইবন কুতায়বা, আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৮১)

১৫. আল-জাহিজ :

(ক) আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন (বৈরূত : দারুল ফিক্র)

(খ) কিতাব আল-হায়ওয়ান

১৬. ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, আত-তুরুক আল-হিকামিয়্যা ফী আস-সিয়াসা (কায়রো : দারুল হাদীছ, সংস্করণ-১, ২০০৩)

১৭. ইমাম আন-নাওয়াবী, তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা)

১৮. ইবন হাজার, তাকরীব আত-তাহ্যীব (বৈরূত : দারুল মা'রিফা)

১৯. ইবন 'আবদি রাব্বিহি আল-আন্দালুসী, আল-'ইকদ আল-ফারীদ (কায়রো : মাতবা'আতু লুজনা আত-তা'লীফ ওয়াত তারজমা, সংস্করণ-৩, ১৯৬৯)

২০. আল-মাস'উদী, মুরূজ আয-যাহাব (বৈরূত : দারুল মা'রিফা)

২১. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ (বৈরূত : দারু সাদির, ১৯৮৬)

২২. ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরূত : মাকতাবাহ্ আল-মা'আরিফ; দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮৩)

২৩. জামাল উদ্দীন ইউসুফ আল-মিয্যী, তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৪)

২৪. ড. 'আবদুর রহমান আল-বাশা, সাওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন (কায়রো : দারুল আদাব আল-ইসলামী)

২৫. মুহাম্মাদ আল-খাদারী বেক, তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা (মিসর : আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা আল কুবরা, ১৯৬৯)

২৬. মু'ঈন উদ্দীন নাদবী, তাবি'ঈন (ভারত : মাতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৬৫)

২৭. 'আবদুল মুন'ইম আল-হাশিমী, 'আসরুত তাবি'ঈন (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, সংস্করণ-৩, ২০০০)

২৮. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৫)

২৯. আন-নাওবাখ্‌তী, আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান, কিতাবু ফিরাক আশ-শী'আ (ইস্তাম্বুল, ১৯৩১)

৩০. আল-বুখারী, আত-তারীখ আল-কাবীর (আল-মাকতাবা আশ-শামিলা)

৩১. ড. জাওয়াদ 'আলী, আল-মুফাস্‌সাল ফী তারীখ আল-'আরাব কাবলাল ইসলাম (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ান)

৩২. ইবন নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত (তাব'আ মিসর)

৩৩. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন, (কায়রো : দারুল হাদীছ, ২০০৪)

৩৪. আদ-দায়নাওয়ারী, আল-আখবার আত-তিওয়াল

৩৫. ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্‌ আন-নাবাবিয়্যাহ্‌ (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা

৩৬. ড. হাসান ইবরাহীম, তারীখ আল-ইসলাম (বৈরূত : দারুল আন্দালুস, সংস্করণ-৭, ১৯৬৪)

৩৭. শাহ্‌রাস্তানী, কিতাব আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১৩১৭ হি.)

৩৮. ইবন হাজার :

(ক) তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব (হায়দ্রাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩২৫ হি.)

(খ) মীযান আল-ই'তিদাল (হায়দ্রাবাদ : ১৩৩১ হি.)

৩৯. খতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ (বৈরূত)

৪০. জুরজী যায়দান, তারীখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, (বৈরূত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬৭)

৪১. ড. মাহমুদ আল-হাসান, আরবূঁ মেঁ তারীখ নিগারী কি নাশূ ও নামা (জার্নাল : ইসলাম আওর 'আসরে জাদীদ, খণ্ড-১, ১৯৬৯)

৪২. আবূ নু'আইম আল-ইসফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া (বৈরূত : দার আল-কিতাব আল-'আরাবী, সংস্করণ-২, ১৯৬৭)

৪৩. আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী (বৈরূত : 'আলাম আল-কুতুব)

৪৪. ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, তাবি'ঈদের জীবনকথা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সংস্করণ-১, খণ্ড-১, ২০০২)

৪৫. দায়িরা-ই মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়া (লাহোর)

৪৬. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৪৭. ইবন কাছীর, মুখতাসার তাফসীরু ইবন কাছীর (বৈরূত : দারুল কুরআন আল-কারীম, ১৯৮১)

৪৮. ইবন মানজূর, লিসান আল-'আরাব বৈরূত : দারু লিসান আল-'আরাব, ১৯৭০)